অগ্নিরথের সারথি

★

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২



প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শক্তি দত্ত

দি প্রিন্টিং হাউস

৭, শ্যাক্ স্ট্রীট,

কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মূল্য—চার টাকা

—উৎসর্গ—

স্বর্গত: সহোদর—

তারিনীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

১৪ই শ্রাবণ ১৩৫৬

এই লেখকের লেখা—

উপন্যাস—

স্বর্গ হইতে বিদায় (২য় সং)

কালোরাত

একাকিনী নায়িকা

কান্নাহাসির দোলায়

গল্প—

সেই মেয়েটি

নির্জন গৃহকোণে (২য় সং)

যথাপূর্বং (২য় সং)

অনুবাদ—

বিপ্লবী যৌবন (২য় সং)—

Ben. B. Lindsay' (Revolt of Modern Youth)

ওয়ান ওয়ার্ল্ড (২য় সং)—

Wendell L. Wilkie (One World)

মাদার রাশিয়া—Maurice Hindus (Mother Russia)

ক্ষুরস্য ধারা—W. Somerset Maugham (Razors Edge)

শীতের রাত ··পথ অন্ধকার। কাছের মানুষকেও চেনা যায় না, মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে, হিমাদ্রি সভয়ে দৌড়ে এসে ক্যাসুরিনা এ্যাভিন্যু ও হস্‌পিটাল রোডের মোড়ে থমকে দাঁড়াল—রেস কোর্স ও ভিকটোরিয়া মেমোরিআলের কাছাকাছি এই অংশটুকু কোলাহলময় বিরাট শহরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অঞ্চল। একখানি ছোট্ট মোটরকার চুরি করে হিমাদ্রি শহরের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, তারপর আগের মোড়ের পাহারওয়ালা যেন তাকে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করল,—হিমাদ্রি স্পীড্ আরো বাড়িয়ে দিয়ে ঝাউগাছের নিচে গাড়িখানি পার্ক করে এতখানি দৌড়ে এসে পিছন ফিরে তাকাল, দূরে আবছা আলো ও অন্ধকারের ভিতরও গাড়িটি দেখা যাচ্ছে, কালো প্রেতের মত অপহৃত ও পরিত্যক্ত গাড়িটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, হেডলাইটের কাঁচটায় মাঝে মাঝে আলো এসে পড়ায় চিক্‌চিক্ করে উঠছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, তার সারা দেহ মন যেন এই নিঃশ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, কম্পমান ঠোঁটের ভিতর দিয়ে যেন শুধু নিঃশ্বাস নয়, সারা জীবনটাও বেরিয়ে আসতে চাইছে। হিমাদ্রি সত্যই ভীত হয়েছে, সশংকিত উত্তেজনার ছাপ তার চোখে মুখে সুস্পষ্ট। হাতের চামড়ার দস্তানা খুলে সে নিজের শীর্ণ আঙুলগুলির দিকে একবার সস্নেহে তাকাল তারপর বর্ষাতির ভিতরকার পকেটে সিগারেটের সন্ধানে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে দিল।

সিগারেটটি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে সেই হাওয়ার ভিতরেও হিমাদ্রি কৌশল সহকারে দেশলাই জ্বালিয়ে মাথাটি নিচু করে ধরিয়ে নিল। আরাম সহকারে ধোঁয়া ছেড়ে ঈষৎ পরিতৃপ্ত হিমাদ্রি পুনরায় চারিদিকে সভয়ে তাকাল।

প্রখর পৌষের রাত্রি! যে জায়গাটিতে হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে সেখানটি ভীষণ অন্ধকার। পীচঢালা ভিজে রাস্তার ওপর মাঝে মাঝে গ্যাসের আলো পড়ে চকচক্ করছে। মাঠের ওপারে চৌরংগির বাতিগুলির উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের ভিতর শন্‌শন্‌ করে মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া বইছে, আর দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছে। হিমাদ্রির মুখে গলায় ও হাতে বৃষ্টির শীতল জল এসে পড়ায় বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, এতক্ষণে সে অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে। দূরে গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজল। হিমাদ্রি এইবার যেন সচেতন হয়ে উঠল। সাময়িক আতংকের ঘোর কাটিয়ে সে একটু এগিয়ে এসে গাড়িটির দিকে লক্ষ্য করল, গাড়িটি এখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, কিছুক্ষণ পূর্বে কি ভাবে আলিপুরের নিউ রোডের একটি বাড়ির সামনে থেকে গাড়িটি চুরি করে চালিয়ে আনা হয়েছে সেই কথা তার মনে পড়ল। হিমাদ্রির স্নায়ু শিরা আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। সে সতর্ক পদক্ষেপে গাড়িটির দিকে এগিয়ে গেল।

ছমাস আগেও হিমাদ্রির চাকরি ছিল। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর "অ্যালফ্রেড স্মিথ্ কোম্পানির" হিসাব বিভাগে ভালো ভাবে বেশ মন দিয়েই সে কাজ করছিল। সাহেবরা খুশি হয়ে সিনিয়ার গ্রেড প্রোমোশন দিয়েছিলেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য দীর্ঘ দিন স্থায়ী হল না। কি যে হল হঠাৎ একদিন বড় সাহেব তাঁর ঘরে হিমাদ্রিকে ডেকে পাঠিয়ে একমাসের অগ্রিম মাহিনা আর একখানি প্রশংসাপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। ব্যাপারটি প্রথমটায় ভালো বোধগম্য না হলেও পরে হিমাদ্রি

বুঝেছিল। পুলিসের যে ইনস্পেক্টরটি তার পিছনে ফেউএর মত লেগে থাকত, সেই একদিন একটি সিগারেটের বিনিময়ে খানিকটা সত্য বলে ফেলেছিল। হিমাদ্রি নাকি সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত. কাজেই বিলাতি সাহেব তাঁকে অফিসে রাখতে ভরসা পাননি।

১৯৩১-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, চারিদিকেই তখন চলেছে ছাঁটাই-এর হিড়িক। বহু লোক বেকার হয়ে আছে, আর এদিকে জেলেরও দরজা উন্মুক্ত, একটু কিছু ত্রুটি বুঝলেই তাকে আটকানো হচ্ছে। হিমাদ্রি সাহেব-প্রদত্ত সেই সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক অফিসের দরজায় ধর্ণা দিয়ে বেড়াল কিন্তু কোন জায়গায় সহৃদয়তার সন্ধান মিলল না, বার বার খোলা ও বন্ধ করায় সার্টিফিকেটখানি ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে গিছল। অবশেষে একদিন সে বুঝল তার আর চাকরি হবেনা। অপমান ঘৃণা লজ্জায় ব্যথিত হয়ে হিমাদ্রি তার টিনের স্যুটকেশে সেই জীর্ণ সার্টিফিকেটখানি তুলে রাখল। আর চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করল।

হিমাদ্রির বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ, দীর্ঘকায়, পাতলা অথচ সক্রিয় আকৃতি, মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে তবে ধূর্ত বলে মনে হয়। পোশাক পরিচ্ছদ ভালো হলেও অপরিচ্ছন্ন, জামায় বোতামের অভাব। পকেটের হয়ত সেলাই খুলে গেছে। জুতার মেরামত প্রয়োজন, খদ্দরের কাপড়টি স্থানে স্থানে তেল ধরে বিশ্রী দাগ হয়ে গেছে। এই তার স্বাভাবিক বেশবাস।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পোশাক পরিচ্ছদের এই দুর্দশার ফলে মাঝে মাঝে তার মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, মেজাজ স্থির থাকেনা। আত্ম-বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সাময়িকভাবে কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়, মুখে একটা বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির ভাব জেগে ওঠে, কয়েকঘণ্টা পরে আবার এমনই আকস্মিকভাবে সে ভাব অন্তর্হিত হয়।

যে-দুশ্চিন্তার ফলে এই মানসিক অবসাদ ও বৈকল্য ঘটে তার থেকে মুক্ত হবার জন্য হিমাদ্রি মাঝে মাঝে সচেষ্ট হয়। নিজের ভবিষ্যৎ

জীবনের সুযোগ ও সম্ভাব্য সুবিধার কথা ভাবে। নিজেকে সাধারণ মানুষের চাইতে একটু উঁচু করে দেখার অবশ্য কিছু কারণও ছিল—সাধারণ মানবের বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে তার বুদ্ধি ছিল প্রখর। একটা বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত সে অবলীলাক্রমে করতে পারত, স্বাধীন ভাবে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না—কিন্তু সবই অত্যন্ত সাময়িক ও স্বল্পস্থায়ী। বাকি সময়ে তার বুদ্ধিবৃত্তি যেন ঝিমিয়ে পড়ত, এই কারণেই তার ভাবভংগী সম্বন্ধে কিছুই স্থির ভাবে বলা সহজ ছিল না। যখন চাকরি করত, তখনও এই ধরনের ব্যাপার ঘটত। মাঝে মাঝে কর্মী হিসাবে হিমাদ্রির কাজের তুলনা চলত না, আর কখনও এমন অবস্থা হত যে তার কাছ থেকে কোনমতে কাজ আদায় করা যেত না। তার প্রকৃতির মতই তার মনও যেন অকারণ অনিশ্চয়তার ভিতর পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াত। হিমাদ্রির অসাফল্যের কারণ তার এই প্রকৃতিগত দৌর্বল্য।

স্কুল-কলেজে পড়ার সময় সহপাঠীদের সংস্পর্শে এসে একদা সে রাজনীতির নেশায় আকৃষ্ট হয়েছিল ও একটি দলে ভিড়ে গিছল। এদেশে রাজনীতির কাজে ফাঁকি চলে না, চাই স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ আর কৃচ্ছ্রসাধন. সবচেয়ে বড় কথা দায়িত্ববোধ। হিমাদ্রি কিছু কাজ খুব ভালোভাবেই করেছিল, তারপর মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসেছে, যে কারণে দল থেকে তাকে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় না। যে সব কাজে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন সে সব দায়িত্ব সে সর্বদা ভালোভাবে পালন করতে পারত না. অথচ হয়ত সামান্য সচেষ্ট হলে তার চাইতে ভালোভাবে আর কারো পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হত না। কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল, বাউণ্ডুলে ভাব। কি ভাবে কি করতে হয় তা না জানার জন্যই যে তার অসাফল্য তা নয়, তার সর্বপ্রধান চারিত্রিক ত্রুটি হল সে জুয়াড়ি। এত সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে

এই বিশ্রী অভ্যাসের নেশা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই সেই প্রলোভনের নাগপাশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না!

যা কিছু পেত সবই তার জুয়ায় খরচ হত, শুধু মাসিক মাহিনা নয়, জীবনের দুর্গম যাত্রাপথের পাথেয় হিসাবে যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সে অধিকারী হয়েছিল, তাও এই জুয়া খেলার কুৎসিত নেশায় যেন নিঃশেষিত হয়ে যেতে বসেছিল। কোনো একটা নূতন ভাবধারা বা মতবাদ মনের ভিতর ফুটে ওঠার পূর্বেই তা জুয়া খেলার গোপন হিসাব নিকাশের গবেষণার ভিতর বিলীন হয়ে যেত।

দীর্ঘকাল এই ভাবেই কাটছে, ভাবপ্রবণ, হঠকারী হিমাদ্রি চিরদিনই বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হ'ল সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকট, আর রাজনৈতিক চাপ, তার ফলেই হিমাদ্রির চাকরিটি গেল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়াতেই চাকরিটা গিয়েছিল, এখন পৌষ। হাতে পয়সা কোনদিনই ছিল না। সঞ্চয়ের চাইতে অপচয় যার বেশি, দুর্দিনের সম্বল তার কিছুই থাকে না। হিমাদ্রি গলার বোতাম বেচে, এর-তার কাছে ধার করে কোন মতে এতদিন চালিয়ে আসছে। ওয়াটগঞ্জের ভিতর একটা অতি সাধারণ মেসে সে থাকে আর ফাঁক পেলে যে কোন ছোটখাটো কাজ করতে তার সম্মানে বাধে না। হিমাদ্রির ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে কিন্তু যে ভাবে ও যে-গতিতে তা ঘটছে তা বোঝার শক্তি ওর নেই। হিমাদ্রি জানে ব্যক্তি হিসাবে তার প্রকৃত জীবনের এই প্রথম পরিচ্ছেদ, এতদিন ভূমিকায় কেটেছে। হিমাদ্রির বড় বোনের অবস্থা ভালো। চিরদিন অবশ্য ভালো ছিল না, স্বামী কাটা-কাপড়ের ব্যবসা করে হঠাৎ বড় হয়েছেন সেই সংগে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। হিমাদ্রি মাঝে মাঝে দিদির কাছে গেলে দিদি বিব্রত হয়ে উঠেন, মলিন জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে বলেন:

—হিমু জামাগুলোয় সাবানও ত' একটু দিতে পারিস। আজ এখানে থেকে যা, জামাগুলো কাচিয়ে দিই। হিমাদ্রি নাটকীয় ভংগীতে বুকে হাত দিয়ে বলে—জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ো না, আসল জিনিস এইখানে, হৃদয় আর মন ময়লা না হলেই হল।

হিমাদ্রির অবস্থা বুঝে দিদি নানা ভাবে সাহায্য করতে চান, নিজের কাছে থেকে যেতে বলেন, কিন্তু হিমাদ্রির আত্মসম্মানে বাধে, সে বলে—কিছু না দিদি, এবার তুমি দেখো হিমাদ্রি কোথায় উঠে দাঁড়ায়—দু চার পয়সায় মানুষের দুঃখ ঘোচাতে কেউ পারেনি, তুমিও পারবে না।

দিদি বলেন, 'যে ভাবে ঐ লালঝাণ্ডার ঝাঁকড়াচুলো ব্যোমকেশটার সংগে ঘুরে বেড়াস, আমারই লজ্জা করে অন্য লোকের ত কথাই নেই। রায় বাহাদুর যোগেশ চৌধুরীর তুই দৌহিত্র, বাবাও কম লোক ছিলেন না। আর তুই কি না ওই নিষ্কর্মা ব্যোমকেশটার সংগে দিনরাত ঘুরে বেড়াস। আমি যে আর লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।'

হিমাদ্রি বিরক্ত হলেও দিদির মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা পায় না। দিদি কটু কথা বললেও নেহাৎ শুধু হাতে ফিরতে হয় না। তবু হিমাদ্রি বলে, 'লোকেদের ত আর কাজ নেই কেবল পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন ব্যোমকেশ ত লোক খারাপ নয়—'

হিমাদ্রি মনে মনে ব্যোমকেশের কথা ভাবে। ব্যোমকেশ ডক-শ্রমিক, সেইখানকার শ্রমিক য়ুনিয়নের সেক্রেটারি হয়েছে। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছে, আকৃতিতে অবশ্য তা মনে হয় না, সাধারণ কুলি মজুর আর ব্যোমকেশে কোন প্রভেদ নেই। দীর্ঘ আকৃতি, অনেকটা পশ্চিমার মত শরীরের গড়ন, মাথায় রুক্ষ অযত্নবর্ধিত চুলগুলিতে আকৃতির ভয়ংকরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সরল, অনাড়ম্বর লোকটির ওপরই মাসি ও দিদির ঘৃণার সীমা নেই। হিমাদ্রি আর ব্যোমকেশ এক ঘরেই

থাকে। পাশাপাশি থাকার ফলে হিমাদ্রি ক্রমশই তার পুরাতন রাজনৈতিক দল ছেড়ে ব্যোমকেশের মতাবলম্বী হয়ে উঠছে।

ব্যোমকেশ ঠিক সাম্যবাদী কম্যুনিস্ট না হলেও সমাজতন্ত্রবাদী। রাশিয়ার গুণগানে পঞ্চমুখ, তখনও মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার জের মেটেনি, কম্যুনিজ্‌মের সেই আদি যুগে বড় চুল আর লাল খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা লোকমাত্রেই সাধারণের কাছে দুদান্ত "বলসেবী" বা বল্‌শেভিক বিবেচিত হতেন। আর যাঁরা নিজেদের সর্বহারা কম্যুনিস্ট মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন তাঁদের রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা বা মার্কসীয় দর্শনের জ্ঞান খুব গভীর ছিল না। ভাববাদী ব্যোমকেশ এই নূতন আবহাওয়ার ভিতব নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিল, শ্রমিকদের ভিতর কাজ করত তাই নিজের আকৃতিতে শ্রমিকদের সংগে কোনো পার্থক্যই সে রাখেনি—তারপর নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজেব ভিতর মানুষ হওয়ায় অভিমানশূন্যতা তার চবিত্রেব সর্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল।

ব্যোমকেশ আব হিমাদ্রি বন্ধু হিসাবে দিন কাটালেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ছিল অনেকখানি—অনেক সময় ব্যোমকেশের সান্নিধ্য হিমাদ্রির অস্বস্তিকব বোধ হত, বিশেষতঃ সে যখন উত্তেজিত ভংগীতে বিপ্লবের কথা শোনাত। ব্যোমকেশেব শ্রমিক মহলে বেশ প্রতিপত্তি ছিল, হিমাদ্রি সেই কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠত। কিন্তু অন্তরে পীডিত বোধ করলেও ব্যোমকেশকে ছেড়েও তার চলত না। ব্যোমকেশের সংগে দিনগুলি বেশ বোমাঞ্চকর আবহাওয়ার ভিতর কেটে যায় সেই কারণে দিদির অভিযোগেব প্রতীকার করার সাধ্য তার নেই। কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই নূতন জামা কাপড না কিনে ব্যোমকেশকে খুঁজে বার করে উভয় মিলে ওয়াটগঞ্জের হংকং রেস্তোরাঁয় বিয়র আর র‍্যাম্‌ খেয়ে দুদিনেই সব টাকাটা উড়িয়ে দিত।

এই মদ্যপানের ভিতরই হিমাদ্রি আনন্দ পায়, সাময়িক ঘোরে

আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পরদিন কিন্তু প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সেই অবসাদভরা মুহূর্তে জীবনটাকে নূতন ছাঁদে গড়ে তোলার জন্য মনে মনে সংকল্প করে।

এই সংকল্পটুকু কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। গতির নেশায় পেয়েছিল হিমাদ্রিকে। পথে ঘাটে কে কোথায় তার গাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় চাবি না দিয়ে রাখছে সেদিকে নজর রাখত আর সুবিধে বুঝলেই গাড়িখানি নিয়ে পালাত। শহরের চারিধারে বা সুদূর শহরপ্রান্তে কিছুক্ষণ উন্মত্তের মত উদ্দাম গতিতে ঘুরে বেড়িয়ে গাড়িখানি যে কোনো রাস্তার একপাশে ফেলে রেখে সরে পড়ত।

আজও সন্ধ্যায় সেই কার্যই করেছে, চমৎকার টু-সিটার কার, সযত্নরক্ষিত গাড়িখানির আভ্যন্তরিন যন্ত্রাবলী বেশ সরল ও সুন্দর। হিমাদ্রি পরমানন্দে গাড়িখানি চৌরংগির ওপর দিয়ে চালিয়ে এসেছে, গাড়িটি নিয়ে ডকের কিনারা পর্যন্ত যাবার বাসনা ছিল, কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ইশারায় সে শংকিত হয়ে উঠেছে, তাব সমস্ত প্ল্যান মাটি হযে গেছে।

সেই শংকার ঘোর এখন কিঞ্চিৎ কেটেছে, তাই এই নির্জন প্রান্তরে গাড়িখানির নিঃশব্দ উপস্থিতি মনে মনে আবার লোভ জাগায়, হিমাদ্রি ধীরে ধীরে গাড়িখানির কাছে তাই এগিযে এল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আবার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। বর্ষাতিটা আগেই খুলে ফেলা হয়েছিল.তাই এ কাঁপুনি শৈত্য বা শংকাজনিত তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। হিমাদ্রি বর্ষাতিটা বুকের ওপর জড় করে চলতে শুরু করল। এখন কিন্তু ঠিক গতির নেশায় গাড়িটি যে টানছিল তা নয, হিমাদ্রির মনে ছিল ওর পাশের শূন্য আসনটিতে একটি সুন্দর ছোট্ট হাতব্যাগ পড়েছিল—আকর্ষণটা তারই।

গাড়িটির কাছে গিয়ে হিমাদ্রি বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল, যেন

ইতিপূর্বে আর সেটি কখনও দেখেনি। রাস্তায় চারিপাশেও ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, যদি কেউ এসে পড়ে। হিমাদ্রি এখন একটু পুলকিত হয়েছে বটে তবু তার দৌর্বল্যের ঘোর কাটেনি, তাই এই অতি-সতর্কতা। · কয়েকটি মুহূর্ত চিন্তা করেই সে কয়েক পা এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। অতি বিশ্রী ভাবে তার সারা অঙ্গ কাঁপছিল, অতি কষ্টে হিমাদ্রি হাতব্যাগটি তুলে নিল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সংগে হাতব্যাগটি খুলতে, তার ভিতর একখানি বিলাতি ব্যাঙ্কের চেক বই, ছোট্ট একটি অ্যাস্পিরিনের শিশি আর মৃদু ও মধুর গন্ধে ভরা একটি রঙিন্ লেডিজ রুমাল পাওয়া গেল। সেই দিককার অংশটি বন্ধ করে হাতব্যাগের অপর থাকটি খুলতেই একটি নোটকেশ পাওয়া গেল, হিমাদ্রি সেটি হাতে রেখে তাড়াতাড়ি হাতব্যাগটি সিটে ফেলে রাখল।

বিদেশী সেণ্টের মনোরম গন্ধ তাকে আকুল করে তুলেছে। সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এই প্রাণ মাতানো মৃদু অথচ মর্মভেদী সুগন্ধির আকর্ষণে। হিমাদ্রি স্বপ্নবিলাসীর মত গাড়ির মালিকের কথা চিন্তা করতে লাগল, গাড়িটি যে মহিলার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলো-আঁধারের আবছায়ায় গাড়ির কাঁচে যেন এক সুশ্রী তরুণীর ভ্রুকুটি ভেসে উঠল, গাড়িখানি চুরি করে আনার জন্য গঞ্জনা ও তিরস্কার শুনতে হবে। লজ্জায় ও ঘৃণায় কিছুকাল স্থির হয়ে বসে রইল হিমাদ্রি—তারপর হাতের নোটকেশটি খুলে দেখল অনেকগুলি নূতন দশ টাকার নোটে সেই ছোট কেশটি বোঝাই। হিমাদ্রি সব নোটগুলি নিজের পাঞ্জাবির পকেটে রেখে ব্যাগটি ফেলে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াতেই এই চৌর্যবৃত্তির গ্লানি হিমাদ্রিকে অভিভূত করে ফেলল। যতই মন থেকে এই চিন্তা দূর করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ততই এক উৎকট উত্তেজনায় সারা দেহ আকুল হয়ে উঠল। সহসা সে পকেট থেকে সমস্ত নোটগুলি বার করে

গাড়ি থেকে সেই ছোট্ট নোটকেশটি তুলে ভর্তি করে রাখল—কিন্তু ঐ কাজটুকু করার পরই মনে এমন একটা হতাশা ও ক্ষতির ভাব জাগল যে ঐভাবে টাকাটা ফেলে রাখার দুঃখ অসহনীয় হয়ে উঠল। অবশেষে হিমাদ্রি পুনরায় নোটকেশটি তুলে গুনে গুনে পাঁচখানি নোট নিয়ে বাকী সমস্ত নোটগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়ে দ্রুত ভংগীতে ট্রাম রাস্তার দিকে অগ্রসর হল।

এতক্ষণে হিমাদ্রির মুখে হাসি ফুটল। সে যে একটা গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ করেছে একথাটা যথার্থ ভাবে সে উপলব্ধি করতে পারেনি—যেন সে একটা রসিকতা করেছে, তাই গাড়ির অধিকারিণী যখন ফিরে এসে গাড়িখানি দেখতে পাবেন না তখন যে তাঁর মনের ও মুখের কি অবস্থা হবে এই ভেবেই হিমাদ্রি হেসে উঠল। তিনি ভাববেন যে গাড়িটি চুরি হয়ে গেছে, অথচ শান্ত ঘোড়ার মত হস্‌পিটাল রোডের ওপর গাড়িখানি দাঁড়িয়ে আছে, আর ঐ নোটের অন্তর্ধান তিনি অনুভব করতেই পারবেন না। তাই হিমাদ্রি হাসছিল। ইতিমধ্যে অদূরে লাল আর বেগুনে আলোওলা ট্রাম দেখা গেল—খিদিরপুরের ট্রাম, হিমাদ্রি হাত দেখিয়ে ট্রামটি বাঁধার ইঙ্গিত করল কিন্তু বাঁধার পূর্বেই চলন্ত ট্রামটিতে লাফিয়ে উঠল। অন্ধকার, ঝড়ের রাত্রি তায় শীতকাল, তাই গাড়িটি এক রকম জনহীন। কন্‌ডাকটর ভাড়া চাইতে আসাতে হিমাদ্রি রসিকতা করে বলে উঠল—আজকের দিনে চড়েছি এই ঢের, আবার ভাড়া দিতে হবে? নাও বাবা চার পয়সা ঋণ আছে নিয়ে নাও।

কন্‌ডাকটর এই ধরনের রসিকতায় অভ্যস্ত, একগাল হেসে বল্লে—আপনার কি কাজ ছিল বেরোবার, হামি লোক ত' জরুর টিকিট কাটব।

হিমাদ্রিকে এ লাইনের কন্‌ডাকটররা সবাই প্রায় চেনে, কারণ নিয়মতভাবেই সে লাস্টকারের যাত্রী।

খিদিরপুরের ট্রামডিপো থেকে কিছুক্ষণ হেঁটে গেলেই পাওয়া যাবে পোর্ট কমিশনারের ব্রিজ, ডকের মুখ, রেলের ইয়ার্ড। ডকের মজুর ও জাহাজী লোকের ভিড়ে জায়গাটি কণ্টকাকীর্ণ, নামও কাঁটাপুকুর। শহরের খুবই কাছে অথচ এক বিচিত্র জগৎ। দিন রাতে সমান কলরব, সমান ভীড়। তবে এই জনতার ভিতরও নির্জন কোণ আছে, দু নম্বর ব্রিজের শেষ প্রান্তে এ সময়টা লোকজন চলে কম। আর একটু দূরে কয়লা সড়ক ছাড়িয়ে গেলেই কুলি-বস্তি ও নির্জন প্রান্তর—এক জাহাজের আওয়াজ ভিন্ন আর কোন শব্দ নেই। এই জায়গাটি বড় ভাল লাগে ব্যোমকেশের। এইখান থেকে রেললাইন ধরে হেঁটে গল্প করতে করতে কোন দিন চলে যায় ব্রেস ব্রিজ, কোনো দিন বা মাঝেরহাট।

হিমাদ্রি ট্রাম থেকে নেমেই দু নম্বর ব্রিজের রাস্তা ধরে। হাওয়ার জোর বেড়েছে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসছে কনকনে হাওয়া, আর দূরে ফেলে আসা শহরের আলোকমালা দেওয়ালীর প্রদীপের মত দেখা যাচ্ছে। বর্ষাতিটা পুনরায় গায়ে এঁটে হিমাদ্রি সমুখ পানে এগিয়ে চলল। অদূরে একটি গ্যাসের আলোর বাতি খারাপ হয়ে গেছে মাঝে মাঝে ম্লান হয়ে আবার দপ করে জ্বলে উঠছে, সেই আলোর কাছাকাছি একটি দীর্ঘাকৃতি মূর্তির অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে, পাশ দিয়ে অসংখ্য রেল লাইন শিরা উপশিরার মত পরস্পরের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। হিমাদ্রির দেরি হয়ে গেছে, এইখানে অন্ততঃ দশ বারোজন অপেক্ষা করার কথা, আজ একটা মিটিং আছে। কিন্তু আর একটু যেতেই দেখা গেল শুধু একজনই সেই দুর্যোগের রাতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। হিমাদ্রির সমস্ত উৎসাহ এক মুহূর্তে নিভে এল। গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে সেই বিরাট ছায়ামূর্তিটিকে সে দেখতে লাগল—ওর ধারণা যে ব্রিজের ঐ লোকটি ওকে দেখতে পায়নি। লোকটি কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছে, ওর জন্যই সে অপেক্ষা করছিল, হিমাদ্রির দিকে

হাত দেখিয়ে ইংগিত করতেই হিমাদ্রি দৌড়ে এগিয়ে গেল। মনে মনে যে বিতৃষ্ণার ও বিরক্তির ভাব ছিল তা যেন মুহূর্তে অন্তহিত হয়ে গেল। আগেও এই রকম হয়েছে বারবার—কিন্তু এমনই অপূর্ব শক্তি এই লোকটির যে, ওর সংস্পর্শে এলেই হিমাদ্রি যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত স্নেহ ও সৌহার্দ্যের বসে অন্তর আপ্লুত হয়ে পড়ে।

"—কি হিমু—কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ ?"

ব্যোমকেশ হিমাদ্রির পিঠে সস্নেহ ভংগীতে চাপড় মেরে প্রশ্ন করে। উভয়েই অন্তরংগ বন্ধু, একই ঘটনা পরিস্থিতির অংশ ভোগী, উভয়েই সমান দারিদ্র্যের অংশীদার আর একত্রে অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জল মধুর দিনের স্বপ্ন দেখে। দিনরাত্রির অনেকটা সময় উভয়ের একত্রে কাটে, কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে উভয়ের মধ্যে যে কি মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তা বোঝা যায় না, তবে একথা বোঝে যে নিরন্তর পারস্পরিক মতান্তরের ভিতর দিন কাটালেও উভযের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে বিভিন্নমুখী চরিত্র, মনোভংগী ও মতবাদের জন্য বন্ধু অপেক্ষা শত্রুতার ভাবই ওদের আলাপ আলোচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অন্তরের ব্যবধানটিকে চাপা দেওয়ার জন্যই যেন অন্তরংগ আন্তরিকতার এই বহিরাংগ প্রকাশ। এ যেন বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। মত বৈষম্য দূর করার জন্যই যেন এই পারস্পরিক সংযোগ।

এই কারণেই উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘুরে বেড়ায়—মনে মনে ধারণা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে। তবু যেন কিছুতেই সুর লাগে না। ব্যোমকেশ হিমাদ্রিকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা করে, আর হিমাদ্রি এই বিরাট লোকটিকে ভয় করে, তার দৈহিক শক্তি ও কঠিন মুখভংগীতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঝোড়ো হাওয়ায় মাথার শুখনো চুলগুলো যেন সাপের মত ফুলছে—ব্যোমকেশ পুনরায় প্রশ্ন করল—

—কি রে, কোথায় ছিলি বল্লি না তো? খবর কি?

—খবর আর কি ভাই, নতুন খবর কিছুই নেই। হিমাদ্রি সংক্ষেপে জবাব দেয়, আর কথা বলার সময় পকেটের অভ্যন্তরে নোট ক'খানি একবার অনুভব করে। উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল যে কোনরকম টাকা হাতে এলে উভয়েব মধ্যে তা সমান ভাগ হবে, তবু হিমাদ্রি টাকার কথা উল্লেখ করল না।

একটু অশোভন ব্যস্ততার সংগেই সে সহসা প্রশ্ন করল, কই আর কেউ আসেনি?

বিরক্তিভবা কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলল—কই, দেখচি না তো। বাবুদের হয ত শীত লেগেছে, একটু শীত পড়েছে আর সবাই ঘরে বসে রইল, এই ত সব লোক, না আছে আশা না আছে উদ্যম, সাধে কি আর ক্যাপিটালিস্টরা পায়ে করে খেঁৎলায়।

এই ভাবে আব কিছুকাল চলল ব্যোমকেশেব বক্তৃতা, যে সব লম্বা চওড়া স্লোগান, বড বড কথা দু চারজন শ্রমিক নেতার কাছে শোনা গেছে, দু একখানি বই যা কখন হাতে এসেছে, বা সংবাদপত্রে পঠিত বৈদেশিক সংবাদেব ওপব ভিত্তি করেই ব্যোমকেশের এই সব গুরুগম্ভীর বাণী রচিত। নিজের উদ্দাম প্রকৃতিব সমর্থনেই এই ধরণের উত্তেজক বাণীর সমন্বযে ব্যোমকেশের বক্তব্য গড়ে ওঠে। তার সারা দেহ মন আসন্ন বিপ্লবেব আশায় উন্মুখ। সেই ভয়ংকর দিনটিকে সার্থক করে তোলার জন্যই তাব এই প্রস্তুতি, শহরের সস্তা হোটেলে হিমাদ্রির সংগে বিযব খেয়ে বা রেসের মাঠে আড্ডা দিযে ব্যোমকেশ দিন কাটাতে পারে। কিন্তু তাব জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য 'বি প্ল ব', যে-বিপ্লব সকল প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের উচ্ছেদ করবে, একটা বিরাট ভূমিকম্পের মত ওলোট পালোট করে দিয়ে গড়ে তুলবে নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যে রাষ্ট্রে ব্যোমকেশ আর তার সহকর্মী বন্ধুরা অনন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়ে দিতে পারবে।

বর্তমানে, কি ভাবে, কি উপায়ে এই বিপ্লব আনা সম্ভব হবে, কি পন্থায় তার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করা চলবে, সেই অন্দোলনকে কে প্রাণবান করে তুলবে, কার নির্দেশে পরিচালিত হবে সেই চূড়ান্ত অভিযান এই সব বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয় শান্ত সুস্থির মুহূর্তে বসে ব্যোমকেশ ভাবে, তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। হিমাদ্রিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনা চলে। হিমাদ্রির সচেতন মন, তাই সে নানাবিধ সম্ভাব্য প্রশ্ন তোলে আর ব্যোমকেশ আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। হিমাদ্রির বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে ব্যোমকেশ আরো বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঠে। বিদ্বেষের প্রকাশ পায় ব্যোমকেশের সামর্থে ও দুঃসাহসিক উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিতে। ব্যোমকেশের ধারণা বুদ্ধিজীবি হিমাদ্রির জ্ঞানগর্ভ কথার এই হোল পালটা জবাব। ব্যোমকেশ পাহারওলা ঠেঙিয়ে পার্কে রাজদ্রোহাত্মক গরম বক্তৃতা দিয়ে স্বল্পকালস্থায়ী কারাদণ্ড ভোগ করে। কি দুর্দমনীয় উদগ্র উৎসাহ ব্যোমকেশের।

ব্যোমকেশ প্রকৃতই চাষীর ছেলে, তার বাপ মজঃফরপুর থেকে এসে কলকাতার শহরে রিকসা চালাতেন, দেশের ক্ষেতাবাদীর আয় থেকে ছমাস চলত, বাকী ছমাসের খরচ চলত রিকসা চালিয়ে—এর ভিতরই তিনি ব্যোমকেশের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন। ব্যোমকেশ ছেলেবেলা থেকে এদেশে থেকে বাঙালী হয়ে গেছে, বাঙ্‌লা লিখতে পারে অনেক বাঙালীর চাইতেও ভালো আবার হিন্দী বক্তৃতায় তার জুড়ী মেলা ভার। ব্যোমকেশের মা ছিলেন দক্ষিণ বাংলার সোনারপুর অঞ্চলের সদ্‌গোপের ঘরের মেয়ে, তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা। ব্যোমকেশ মার প্রকৃতি আর বাপের বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিল—তাই গ্রন্থিল সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। কলেজে পড়ার সময় হিমাদ্রির সংগে পরিচয় আর সেই পরিচয় তার জীবনের গতি পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

এই বিরাট পুরুষ, যাকে দেখলেই বিদেশী বলে মনে হয়, প্রথম দর্শনেই রোমান্স বিলাসী হিমাদ্রির মনকে আন্দোলিত করেছে। এই ছেলেটিকে নিয়ে জীবনের যাত্রাপথে পাড়ি দিতে হবে এই কথাই কৈশোরের সেই স্বপ্নময় দিনে মনে হয়েছিল, তারপর বন্ধুত্ব অবশ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দুটি পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের এই সমন্বয় কোনোদিনই নিবিড় হয়ে উঠল না। উভয়ে উভয়কে ঈর্ষা করলেও ছেড়েও থাকতে পারতনা কেউ কাউকে, শহরের পথে পথে নানা বিষয়ের আলোচনা করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল সব চেয়ে বড় বিলাস। ব্যোমকেশের উত্তেজনা যত বাড়ে, হিমাদ্রি ততই আনন্দ পায়, নিজের উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তির দম্ভে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যতক্ষণ না হিমাদ্রি কোনো পথ খুঁজে না পায়, সমস্যার সমাধান করতে পারেনা ততক্ষণ সে ব্যোমকেশের উদ্ভট খেয়ালে সায় দেয়। হিমাদ্রি চায় ব্যোমকেশ কানায় কানায় ভেসে উঠুক, তারপর যখন উপছিয়ে পড়বে তখন সামলাবো, নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় দেব। তাই ব্যোমকেশ যখন বকে চলেছে, আসন্ন বিপ্লবের কথায় যখন সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে, তখন হিমাদ্রি ধীরে ধীরে পকেট থেকে এক টুকরো খড়ি বার করলো। ব্রিজের এই পাথরের দেয়ালে বহুবিধ বাণী আর অশ্লীল কথা লেখা আছে, পুলিসের নাগালের বাইরে এই অঞ্চলটি বিভিন্ন ধরনের লোকজনের মিলনক্ষেত্র, তাই যার যা মনে এসেছে দেয়ালে লিখেছে—

মহাত্মা গান্ধী কি জয়।
ছারপোকার মহৌষধ!
ইন্‌কিলাব্‌ জিন্দাবাদ!
We want potatoes

রৌদ্র ও জলে, গরম ও হাওয়ায় অনেক লেখা মুছে এসেছে। দেওয়ালটি যেন একটি সমাধিস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ণ হাতে দেয়ালের

কিছু অংশ মুছে দিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বড় বড মোটা অক্ষরে খড়িটি ছোট না হওয়া পর্যন্ত হিমাদ্রি লিখে চলল—

"বল ভাই মা ভৈঃ, মা ভৈঃ, নব যুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত যুগান্তর বে—"

তারপর ব্যোমকেশের পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে দেয়ালটি দেখার জন্য ইঙ্গিত করল।

ব্যোমকেশ পিছন ফিরে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এল হিমু কি লিখেছে দেখবার জন্য—ব্যোমকেশ সুর কবে চেঁচিযে কবিতার লাইন কটি আবৃত্তি কবে, ওর কণ্ঠে আবৃত্তি ভালো শোনায- হিমু তাই চুপ করে ব্যোমকেশের আবৃত্তি শোনে। নিজের লেখাটি নিজেই আবার পড়ে, বোঝায কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নাকি ওব ভিতব রয়েছে, সুগভীর অর্থে ভরা এই কটি কথা।

ব্যোমকেশের মাথাতেও এব একটা অর্থ প্রবেশ করেছে, বেশ নূতন ও উত্তেজনাময বাণী, ব্যোমকেশের মনে বিস্ময় জাগে। নিজস্ব বুদ্ধিতে এই কবিতার একটা মনগড়া অর্থ কবে ব্যোমকেশ স্বীয উদ্দাম প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নেয়, তাব বিপ্লব বুভুক্ষিত মনের একটা খোবাক হয়। 'বক্ত যুগান্তর' যে কি সে বিষযে হিমুকে কোন প্রশ্ন কবে না ব্যোমকেশ, অথচ জানবার বাসনা হয। হিমুকে প্রশ্ন করলে নিজেব অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, তার কাছে ছোট হতে হয,—তা ছাড়া সব কথা জানারও খুব প্রযোজন নেই, "রক্ত" ও "যুগান্তর" কথাটির একত্র সমাবেশই ত' সব কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তেজিত ব্যোমকেশ পায়েচারি কবে এই কটি লাইনই বাব বাব আবৃত্তি করল—তাবপর অট্টহাস্য করে আকাশেব দিকে ঘুঁসি উঠিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ,'—আর হিমাদ্রির গলা জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল—

—'নব যুগ সত্যি শুরু হয়েছে, কি বলিস হিমু! দেশ জেগেছে এবার—!'

ভাবাবেগের ক্ষণিক স্পর্শে বোমকেশের মন থেকে সব গ্লানি মুছে গেছে, মুছে গেছে পারস্পরিক সংঘাতের ক্ষুদ্র মনোভাব—তাই ব্যোমকেশ উভয়ের অন্তর্নিহিত অনুচ্চারিত দ্বন্দের ঘোর কাটিয়ে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করে—হিমাদ্রির পীঠে সস্নেহভঙ্গীতে চাপড় মেরে বলে—

—তুই আর আমি হিমু, দুজনে আবার নতুন করে শুরু করব—নতুন করে দল গড়ব, বিপ্লব একটা আসবেই, তুই দেখে নিস্।

হিমাদ্রির সংগে এক হয়ে একই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাবে তার সমর্থন ভিক্ষা করে ব্যোমকেশ।

ধীরে ধীরে হিমাদ্রির মুখে হাসি ফুটল, শীর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মুখে মৃদু হাসির রেখা—ব্যোমকেশের প্রশস্ত বুক ও গোলাকার মুখের দিকে তাকিয়েই তার হাসির বেগ বেড়ে ওঠে—ব্যোমকেশের বলিষ্ঠ বাহু সজোরে জড়িয়ে ধরে হিমাদ্রি তার কঠিন মাংসপেশী অনুভব করে—তারপর যেন একটা সংক্রামক ভাবাবেগে হিমাদ্রির অন্তরেও নূতন প্রেরণা, নূতন উৎসাহ জাগে। মন থেকে সংশয় ভয় মুছে গিয়ে দুই বন্ধুর সখ্যতা যেন নূতন পথ নেয়।

নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতার গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়েছে হিমাদ্রি। অনুতপ্ত হিমাদ্রির মনে হয় এতদিন ব্যোমকেশের ওপর ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে,—এই হিমালয় সদৃশ বিরাট অথচ শিশুর মত সরল প্রাণীটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা অনুচিত হয়েছে।

হিমাদ্রি তাই বলে ওঠে 'বেশ তাই হোক, তুই আর আমি দুজনে নতুন দল গড়ে তুলবো, দেখে নিস তুই—আমরা দুজনে কাজে লাগলে কেউ আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না—'

এর জবাবে ব্যোমকেশ শুধু সেই শূন্য প্রান্তর সচকিত করে একটা

বিকট আওয়াজ করে উঠল—বাতাসে ব্যোমকেশের কণ্ঠনিসৃত আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল—পৃথিবীর প্রতি যেন একটা হুঁশিয়ারি উচ্চারিত করা হল। হিমাদ্রিও চমকে উঠল কিন্তু সে ঘোর সাময়িক—আর তার দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, সংশয় নেই। একান্তভাবে এই দৈত্যের মত মানুষটির কাছে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে।

ব্যোমকেশ বলে চলে—'আমি আর তুই, বুঝলি হিমু। তোর মাথা আছে, স্কীম্ আছে, ফন্দী আঁটতে তোর জুড়ি নেই। আমরা দুজনেই যদি লাগি তাহলে কাউকেই ভয় করি না—তোর বুদ্ধি আর আমার শক্তি—' এই কথায় হিমাদ্রির মন খুশিতে ভরে ওঠে, আত্মতৃপ্তির অবসর পায়। তবু এত দিনে ব্যোমকেশ তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, মেনে নিযেছে হিমাদ্রির উন্নততর প্রতিভা। বল ও বুদ্ধি—উভয়বিধ বস্তুর মধ্যে কোনটি যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয় হিমাদ্রির জ্ঞান অস্পষ্ট নয়। হিমাদ্রি চুপ রে বইল।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের ঘোর কাটবার পর ব্যোমকেশ গলার স্বর নামিয়ে গুঞ্জন করে ওর বক্তব্য বলে চলে আর হিমাদ্রি মাথা নেড়ে নীরবে সেই সব কথা শোনে। ব্যোমকেশ নিজস্ব ধারণা ও বুদ্ধি অনুযায়ী বিপ্লব সম্বন্ধে বহুবার উচ্চারিত পরিকল্পনাটি আউড়িয়ে যায়। এই স্কীমটি তার নিজস্ব, দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল।

ব্যোমকেশ বলে—'এইভাবেই শুরু করতে হবে আমাদের, প্রথম আন্দোলনেই সাড়া পড়ে যাবে। চাই আওয়াজ। তুমি যা বলতে চাও তা শোনবার লোক জড়ো করতে হবে,—সমস্ত বড় বড় শহরগুলি একদিনে একযোগে যদি আমরা আক্রমণ করি তাহলে কি হয়? অতর্কিত আক্রমণের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই আমাদের ঝাণ্ডা শহরের বড় বড় বাড়িতে উড়বে। আগে অধিকার, তারপর কি রকম গভর্নমেণ্ট হবে, কি নীতিতে শাসন করা চলবে সে সব কথা ভাবা

যাবে। আমি চাই পাওয়ার—সাধারণের হাতে ক্ষমতাই যদি না এল, তবে ?

এই কথা কটি বলে পচ করে খানিকটা পানের পীচ্ ফেলে বাঁ হাতে মুখটা মুছে নেবার জন্য একটু চুপ করে ব্যোমকেশ, তারপর আবার বলে,

—'বুঝলি ? আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছিস হিমু ' একটা আকস্মিক আক্রমণে থানা পুলিস সব হাত করে নেব, তারপর মিলিটারি লেলিয়ে দিলে তখন লড়ব, দেশের লোক ত' আমাদের হাতে—'

হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে থামিয়ে দিয়ে বলে—'থাম বাপু—'

—'কিন্তু, আমি যা বলছি—'

—'দাঁড়ানা, আমার কথাটাই শোন না আগে, অনেক কিছু ভাবার আছে সেগুলো মোটেই ভেবে দেখিসনি,—মনে কর প্রথম ধাক্কায় আমরা জিতে গেলাম,—তারপর। জনসাধারণের ওপর ভরসা, তারা কি আমাদের সাহায্য করবে ভেবেছিস ? হিন্দু আছে, মুসলমান সরকারি কেরানি থেকে ওপরওলা আছে, ওরা একটা আলাদা জাত—তারা আমাদের দলে আসবে ? তারপর সাধারণের জীবনযাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমন ধর ব্যবসা, বাজার হাট, খাবার দাবার, আর গ্যাস, ইলেকট্রিক, খাবার জল এসবের ব্যবস্থাও ঠিক রাখতে হবে। পাবলিকের কোন অসুবিধা হতে দেওয়া চলবে না—কারণ তাহলেই তাদের সহানুভূতি পাবেনা—ক্ষমতা হাতে পেয়ে আমরাও যে চালাতে পারি একথা বোঝাতে হলে যথেষ্ট শক্তির দরকার।'

—'কেন ক্ষমতা ত আমাদেরই হাতে থাকবে, কেন চালাতে পারবো না ?

—'দু চারজন লোককে তুমি ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারো, পুলিসও না হয় তোমার হাতে এল—কিন্তু অনেক বড় বড় ব্যাপার আছে যেগুলি কন্ট্রোল করা তোমার আমার সাধ্য নয়—অশেষ ক্ষমতা

ও অজস্র অর্থ থাকলে তবেই এই নতুন ধারা চালাতে পারা যাবে—নইলে শুধু শক্তি ও সামর্থ নিয়ে কি করবে, টাকা চাই, টাকা না থাকলে কিছুই হবে না—'

—'টাকার এত দরকার হবে ? কত টাকা লাগবে ?'

'—প্রচুর টাকা চাই, লাখ লাখ, কোটি কোটি।

—'বেশ তাই হবে, যত টাকার দরকার হবে শুরু করার আগেই তা' সংগ্রহ করতে হবে।'

এই অবাস্তব উক্তিতে বিরক্ত হযে হিমাদ্রি ভ্রুকুটি করে বলল—'সংগ্রহ ত' করবে, সেটা আসবে কোথা থেকে ? আবোল তাবোল বকিস নি !'

ব্যোমকেশ চটে যায়, হিমাদ্রির বোকামিতেই চটে, এই সাধারণ সহজ কথা হিমাদ্রির মাথায ঢোকে না।

—'টাকা আর কোথা থেকে আসবে, চাইলে কেউ দেবে ? শহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলো রয়েছে কি করতে ?'

—'ডাকাতি !' হিমাদ্রি ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করে। এই কথাতেই যেন ওর সকল উৎসাহ, সকল উত্তেজনা নিভে যায়, সেই সংগে ব্যোমকেশের ওপর শ্রদ্ধাও হ্রাস পায়। এর চেয়ে বেশি আর কি ভাবতে পারে ব্যোমকেশ, তবু স্বীকার করবে না যে ওর স্কীমটা বাজে, সাফল্য ও সম্ভাবনাহীন। তবু হিমাদ্রি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে প্রতিবাদ করে না। হিমাদ্রি পুনরায় প্রশ্ন করে—'ডাকাতি ?'

এবার ওর গলার স্বর অনেক নরম, অনেক শান্ত। পৃথিবীটা যেন আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন নয়, বরং ব্যোমকেশের উত্তেজনা বৃদ্ধি করার একটা ইংগিত।

ব্যোমকেশ পুনরায় বলে—'সেই ভালো হিমু, আমার একটা মতলব মাথায় এসেছে, এখন দরকার শুধু একটা গাড়ির।'

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। অসংলগ্ন ও অবাস্তব কথা, তাতে জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানের ভাবই বেশি। যুক্তি বা বিচারের কোন ধার ধারে না ব্যোমকেশ। পাগলের মতো অনর্গল বকে যায়—হিমাদ্রি এই কথায় অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে—ব্যোমকেশের এই পরিকল্পনার স্বপ্ন কল্পনা-নেত্রে দেখে হিমাদ্রি আতংকিত হয়ে ওঠে, যে সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা রয়েছে ব্যোমকেশের এই বাতুলতার ভিতর, তা সর্বনাশ ডেকে আনবে এবং সেই সর্বনাশের জালে উভয়েই জড়িয়ে পড়তে পারে। তবু হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে তার মনোভাব জানতে দেয় না—প্রচ্ছন্ন রাখে নিজের ধারণা, ব্যোমকেশকে তাই সংযত না করে তার নির্বোধ উক্তিতে উৎসাহিত করে। এতক্ষণে ব্রিজ থেকে নিচে নামাব ইশারা করে হিমাদ্রি।

চাবিদিকে বিরাট প্রান্তর—উত্তরের হাওয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত জোবে বয়ে এসে হাডের ভিতর পর্যন্ত কাঁপন তুলছে—সেই শান্ত নিস্তব্ধ প্রান্তরে নীববতা ভেঙে থেকে থেকে ডকের জাহাজের ক্রেনের আওয়াজ বা পোর্ট ট্রাস্টের মন্দগতি গুড্‌স্‌ ট্রেন চলেছে—ইয়ার্ডের চারপাশের প্রচুর বৈদ্যুতিক আলোও রাত্রির অন্ধকারকে পরাজিত করতে পারেনি—এই অঞ্চলটি যেন আঁধার রাতের সম্পূর্ণ অধিকারে। অদূরে মালগাড়ির সান্‌টিং করা হচ্ছে—দুটি গাড়িতে ধাক্কা লেগে থেকে থেকে একটা ভীযণ আওয়াজ হচ্ছে। অনেক দূরে ফেলে আসা শহরের আলো দিগন্তে সূর্যোদয়ের মতো দেখাচ্ছে—সিনেমার আলো, পথের আলো, দোকানের আলো,—সব আলোর একত্র সমাবেশে উর্ধ্ব আকাশ উদ্ভাসিত হযে উঠেছে।

ব্যোমকেশ চেঁচিয়ে বলে 'অন্ধকারের ভেতর ওদিকটা কেমন দেখাচ্ছে দেখ—! যেন ভোর হচ্ছে—'

এই দৃশ্যের অধিকতর স্পষ্ট ছবি দেখার জন্য ব্রিজের একটা অংশে উঠে দাঁড়ায় ব্যোমকেশ। তার বিপ্লবী মন এই আলো ও বর্ণ সমারোহে যেন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—শহরের মোহ যেন ওকে হাতছানি দেয়। ব্যোমকেশের মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর দেখায়।

হিমাদ্রি ওর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে, লোকটিকে অত্যন্ত নির্বোধ ও বাজে বলে মনে হয় হিমাদ্রির—বুদ্ধিহীন দৈত্য-সদৃশ লোকটি সব কিছুর ভিতরই বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। ব্যোমকেশের চোখ দুটি উত্তেজনার আধিক্যে যেন বাঘের চোখের মত জ্বলছে, যুক্তি ও বিচারহীন ভাবাবেগে উদ্দাম কল্পনার স্রোতে সে গা ঢেলে দিয়েছে। ব্যোমকেশের কণ্ঠোচ্চারিত কথার অধিকাংশ হাওয়ায় ভেসে যায় বা ট্রেনের আওয়াজে মিশিয়ে যায়, তখন মনে হয় এই বিরাট পুরুষটি যেন চিউয়িং গাম্ চিবোচ্ছে।

হিমাদ্রির হাসি পায়, প্রায় হেসে ফেলেছিল সে। এই হল ব্যোমকেশের নিজস্ব ধারা, কোন কিছু একটা নূতন ভাব, নূতন কল্পনা মাথায় এলে তার উত্তেজনার আর সীমা থাকে না—কি নির্বোধ। হিমাদ্রি ভাবে, দেখা যাক কতদূর এইভাবে ও যায়।

হিমাদ্রি বলল—'এই, বেশ শীত করছে, চল নিচে নেমে দাঁড়াই—'

উভয়ে ব্রিজের পাদদেশে এসে দাঁড়াল, আশা ছিল দলের আরো দু চারজন এসে পড়বে—কিন্তু কেউই এসে পৌছাল না। হাওয়ার গতি বেড়েই চলেছে—সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে ঝড, জল, উপেক্ষা করে তবু তখনো আলো জ্বলছে—

অবশেষে হিমাদ্রি ব্যোমকেশের হাত ধরে বলে উঠল—'ব্যোমকেশ কেউ আর আসবে না রাত অনেক হয়েছে, চল ফিরে যাই—'

ব্যোমকেশ তখনো বকে চলেছে, মাঝে মাঝে গলার স্বর অত্যন্ত

চড়্ছে আবার নেমে আস্ছে, হিমাদ্রি বিনাবাক্যব্যয়ে ওর পাশাপাশি চলতে লাগল।

ব্যোমকেশ সহসা বলে ওঠে—'আমি কি বলছি বুঝতে পারছিস!' ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই হিমাদ্রি গুম্ হয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না!

ব্যোমকেশ থেমে ওকে ধরে বলে—'কি রে চুপ করে আছিস যে?'

হিমাদ্রি ভ্রূভঙ্গী করে বলে—'সবই শুন্ছি ত' ··

—'কিন্তু আমি বলছিলুম কি—'

—'সব জানি রে বাপু, জানি, এই হাওয়ার মুখ থেকে আগে নেমে চল, তারপর সব শুনবো।'—হিমাদ্রি চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

ব্যোমকেশ কিন্তু অদম্য উৎসাহে সেইভাবই কথা বলে চলেছে, আশে পাশের লোকেব দিকে বা স্থান, কাল, পাত্রেব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই—আপন মনে বকে চলেছে। পথ-চল্তি দু একজনের কানে ওব উচ্ছ্বাসের কিছু অংশ ভেসে যাচ্ছে, তারা মাতাল মনে করে হাসছে। ব্যোমকেশের সে সব দিকে লক্ষ্য না থাকলেও, হিমাদ্রির আছে—সে বিরক্ত হয়, ওব মনে হয এই বক্তার লোকটির জন্য ও নিজেও সাধারণের চোখে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছে।

সহসা হিমাদ্রি চেঁচিয়ে ওঠে—'থাম্ ব্যোমকেশ, থাম্।'

ব্যোমকেশের কানে এ কথা পৌছায না। ওর অন্তবে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড উঠেছে, সেই ঝড়ের উদ্দাম বেগে ও আত্মহারা হয়ে উঠেছে —এই রকম পূর্বেও হয়েছে বহুবার, ব্যোমকেশেব প্রকৃতিতে এই অবস্থা নূতন নয়—আকস্মিক উত্তেজনায় চিরদিনই সে এই বকম অশান্ত হয়ে ওঠে, আর মদ একটু পেটে পড়তে না পড়তেই ওর বক্তৃতা শুরু হয়, তখন থামানো শক্ত। পরদিন প্রভাতে কোথায থাকে ওর বিপ্লব,

কোথায় থাকে স্কীম্—পূর্ব রাত্রির উত্তেজনা স্বপ্নের মত ক্ষীণ রেশটুকু নিয়ে স্মৃতিপটে জেগে থাকে।

হিমাদ্রি বলে—'থাম্ ভাই, পায়ে ধরছি থাম্। অনেক বলেছিস—'

একটা খোলা বড় মাঠের ওপর তাঁবু খাটিয়ে—'গ্রাণ্ড কার্নিভাল' শুরু হয়েছে! ডে-লাইটের আলোয় চারিদিক আলো ঝলমল—লাল শালুর ওপর অসমান হস্তাক্ষরে তুলো দিয়ে লেখা আছে 'WELCOME'—একটি লোক প্রাণপণে ড্রাম পেটাচ্ছে আর একজন মাঝে মাঝে একটা কর্নেট বাজাচ্ছে।

কয়েকজন শ্রমিক শ্রেণীর রাতচরা জীব আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অস্থায়ী ভাবে তৈরি রেস্তর্াঁর কলাই করা গামলায় সাজানো জাফরাণী রঙ্ করা ডিমের তরকারির দিকে লোলুপ নেত্রে তাকিয়ে আছে অনেকে, কিনছেও দু একজন।

হিমাদ্রি থমকে দাঁড়াল।

ব্যোমকেশ কয়েক পা এগিয়ে গিছল, পিছন ফিরে হিমাদ্রির অনুপস্থিতি অনুভব করে ফিরে এসে অসহিষ্ণুভাবে বলল—'কি রে থামলি যে, চল, এর পর 'হং কং'-এ'র দরজা বন্ধ হয়ে যাবে যে—'

রাগে হিমাদ্রির সর্বশরীর জ্বলছে, ব্যোমকেশের সশব্দ উপস্থিতি ও দীর্ঘ পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, রুক্ষ গলায় বলে—'যাবে ত' যাও, আমি ত' আর ধরে রাখিনি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীর গলায় হিমাদ্রিকে বলে ওঠে, 'এখানে ঢুকবি নাকি? সেটি হচ্ছেনা চাঁদ, চলে এস আমার সংগে লক্ষ্মী ছেলের মত।'

ব্যোমকেশ হিমাদ্রিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, হিমাদ্রির ঝোঁক চেপেছে কার্নিভাল দেখার, ব্যোমকেশের এই টানাটানিতে তার বিরক্তি বেড়ে ওঠে, তবু প্রবল বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও হিমাদ্রি নিজেকে সংযত

করে রাখে, ব্যোমকেশের সংগে বিরোধ না বাড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বলে—

'চল না দুজনেই যাই, ব্যাপারটা কি দেখে আসি।'

ব্যোমকেশ অশেষ ঘৃণাভরে হিমাদ্রির আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে চলে গেল, হিমাদ্রি নীরবে ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে কার্নিভালের কাপড়ের ত,ডালে ঢুকে পড়ল।

ভিতরে ঢুকতেই একটা বিশ্রী কটুগন্ধে নাকটা ঝাঁঝিয়ে দিল—সস্তার মদ, সিগারেট, আর পেঁয়াজ, রুসুন ও ময়লা পরিচ্ছদের উৎকট গন্ধের সংমিশ্রণে ভীড়ের ভিতর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষ ত' দূরের কথা ভূতেও পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সামনেই একটা বড় অংশে 'বালা খেলা' ও চাকা ঘুরিয়ে জুয়া খেলা চলেছে। মুহুর্মুহু চীৎকারে সেই অঞ্চলটি সরগরম—সমাগত দর্শকদের জুয়া খেলায় প্ররোচিত করার জন্য জুয়ার অবাঙালী মালিক ভাঙা বাংলায় বক্তৃতার ভংগীতে বলছে—'ধর্মের খেল—ধর্মীকা খেল, জুয়াচুরি না আছে, আপনার আঁখকে ত' বিস্ওয়াস্ আছে, নিজের চোখে দেখে খেলুন, চার আনা, আট আনা, একটাকা—এক টাকায় দুটাকা লাভ—'

খেলা আরম্ভ হতেই চাকাটা সশব্দে ঘুরছে তারপর—যে যত নম্বর বলে টাকা দিয়েছে সেই অংকে গিয়ে চাকা থামলে সে জিতছে, হাতে হাতে টাকা পাচ্ছে—সবাই-এর কপাল ঠিক ভালো নয় তাই দুচার জনের অদৃষ্টেই এই ঠিক মত বাজী উঠছে, জুয়া ওলা "ধর্মী খেল্" বলে চীৎকার করে বাজী মাত করছে।

হিমাদ্রি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে, সমাগত জনতার মুখভংগী লক্ষ্য করে, তারপর মৃদু পদক্ষেপে নিকটস্থ মেশিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়

—পারিপার্শিক অবস্থা হিমাদ্রির মনে উৎসাহ জাগায় না, তেমন ফুর্তি হয় না। একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক মেশিনের ওপর টাকা রাখছে, মেশিনের হাতল ঘোরাচ্ছে—সেই যেন এতগুলি প্রাণীর ভাগ্য বিধাত্রী।

হিমাদ্রি এই জায়গাটি ত্যাগ করে আগে এগিয়ে চলে। কিছুদূরেই পুরু পর্দা ঢাকা একটি আলোকজ্জ্বল কেবিনের ভিতর থেকে মৃদু গুঞ্জন ও উত্তেজিত কলরব শোনা যাচ্ছিল—যে লোকটি এই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, বা পুলিসের উপস্থিতি সম্পর্কে ভিতরের লোকজনকে সতর্ক করে, এই সময়টিতে সে স্বস্থানে না থাকায়, হিমাদ্রি বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারল না। পর্দার একাংশ সরিয়ে ভিতরের অবস্থা একটু দেখেই সে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তাঁবুর ভিতরে একটি জোরালো পেট্রোমাক্স আলো খুব নিচু করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে আর জন পঁচিশেক লোক গভীর মনোযোগ সহকারে খেলা দেখছে। একটি টেবিলের ওপর একটি অয়েলক্লথে আঁকা ছক্ পাতা আছে, তাতে ছটি বিভিন্ন রঙের ঘর আঁকা আছে। একজন শীর্ণ গম্ভীর ব্যক্তি খেলার পরিচালক, তার সহকারী বেশ মোটা সোটা গুণ্ডা প্রকৃতির একটি লোক, সেই খেলাচ্ছে অর্থাৎ চাকা ঘোরাচ্ছে, পয়সা নিচ্ছে, পয়সা দিচ্ছে, জয়-পরাজয় ঘোষণা করছে। যে চিহ্ন লক্ষ্য করে বালা ফেলা হচ্ছে, সেই চিহ্ন ও সেই রঙে যদি বালা পড়ে তাহলেই জিৎ।

সম্পূর্ণ দৃশ্যটি প্রথমে ঢুকেই হিমাদ্রি উপভোগ করল এবং বুঝল—তারপর কুনুইএর ধাক্কায় ভিড়ের ভিতরে পথ করে নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে ভালো করে ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে নূতন দান থেকে বাজী ধরতে শুরু করল। অত্যন্ত অবহেলার ভংগীতে একটি নীল রঙের খোপে একখানি দশ টাকার নোট ফেলে হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে রইল, সমগ্র

জনতা ওর মুখের দিকে তাকাল, বিবর্ণ ও ফুল্ল, উত্তেজিত বা ভাবাবেগ-হীন শূন্য এবং নির্বোধ—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মুখ আর মুখোশ। হিমাদ্রিকে উৎসাহিত করার জন্য সহকারী পরিচালক সস্মিত ভংগীতে হেসে সমবেত জনগণকে প্রলুব্ধ করে বলে—'আপনারাও ফেলুন, সাহস করে টাকা ছাড়ুন, দশ টাকার বদলে বিশ টাকা নিয়ে বাড়ি যান, জুয়াচুরি নেই, গণ্ডগোল নেই, সাফ খেলা, ধর্মের খেলা—ফেলুন, টাকা ফেলুন—'

ঠিক এই সময়টিতে দুটি স্ত্রীলোক চটুল ভংগীতে এগিয়ে এসে হিমাদ্রির পাশে ঘেঁষে দাঁড়াল, একাগ্রচিত্তে জুয়ার বিচিত্রবর্ণ ছকে ছড়ানো টাকা আর নোটের দিকে তাকিয়েছিল হিমাদ্রি, এদিকে তার কোনও লক্ষ্য নেই।

চাকা ঘুরেছে, সেই ঘূর্ণ্যমান ভাগ্যচক্রের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে অসীম আগ্রহে, চাকার কাঁটা শেষে নীল আর হলুদ রঙে থামলো—জুয়াওলা হিমাদ্রির নোটের পাশে আর একখানি দশটাকার নোট রাখলো, হিমাদ্রি জিতেছে, খেলার গতি যেন সেই মুহূর্তে নূতন ধারায় প্রবাহিত হল—

জুয়াওয়ালা চীৎকার করে সবাইকে খেলতে অনুরোধ জানায়,"—টাকা ফেলো, টাকা ওঠাও, মজার খেল্—" হিমাদ্রি টাকাটা তুলে নেবার চেষ্টা করে না, জনতার ভিতর থেকে একজন ইঙ্গিতে টাকাটা হিমাদ্রির হাতে তুলে দিতে বলে—হিমাদ্রি নিষেধ করে, লোকটি বাধা পেয়ে থেমে গেল, আবার চাকা ঘোরে। এবারে চাকা এসে লাল আর নীলে থামে। জুয়াওলা মুখ গম্ভীর করে দুখানি নোটের ওপর আরো দুখানি নোট চাপিয়ে বেশ সমারোহ সহকারে হিমাদ্রির হাতে তুলে দেয়, ভংগীটা এমন করেছে যেন এইভাবে জেতা ত খুবই সহজ ও স্বাভাবিক, সকলেই এইভাবে হিমাদ্রির মত লাভ করতে পারে। চারিদিকে একটা চাপা

গুঞ্জন শোনা গেল। লোকটি কিন্তু পাকা অভিনেতা নয়, তার কণ্ঠে হতাশা ও ক্ষোভ পরিস্ফুট। এই অপরিচ্ছন্ন ও বদ্ধ ঘরের ভিতর শক্তিশালী আলোর তেজে তার মুখে স্বভাবতই বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছিল, এখন সে মুখ ঘর্মপ্লাবিত। কপাল ও ঠোঁট বেয়ে ঘাম পড়ছে। লোকটির হাত কাঁপছে, কণ্ঠস্বর কম্পিত।

দূরে বসে পরিচালক সমস্তই দেখছে—টাকাটা চলে যাচ্ছে কিন্তু তার জন্য যেন তার কোন দুঃখ নেই, হিমাদ্রির লাভ হলে যেন ওর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ভালই ত এও একটা ব্যতিক্রম, তবু লোকে উৎসাহিত হয়ে উঠবে! সুতরাং সে-ও চীৎকাব করে বলতে লাগল—"দেখুন! লক্ষ্মীবাবু আছে! রাজাবাবু! —ভরসা কবে পয়সা ছাড়ুন—"

হিমাদ্রি চারখানি দশটাকার নোটই লাল ছকে রাখল, এবার কিন্তু বেশী টাকা পড়ল নীল ছকে, হিমাদ্রিব পয়মন্ত ছক। মালিকের মনটা খুশিতে ভরে উঠল, লোকসান এইবার হয়ত উঠে যাবে, চাকাটা এইবার ঘোবাতে একটু দেরি করে জুযাওয়ালা, টাকাও পড়েছে তখন খুব, যার যা সম্বল সবাই ভবসা করে ছাড়ছে। একটু পবেই আবার চাকা ঘুরলো এবাব চাকা থামলো গিয়ে লালে আর হলদে।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ক্ষণিক স্তব্ধতা অতিক্রান্ত হবাব পব জনতার কলরব ও আনন্দধ্বনি প্রখর হযে উঠল। সবাযেব দৃষ্টি হিমাদ্রির মুখে, লোকটি কি জাদু জানে। হিমাদ্রি সস্মিতভংগীতে একটু হাসে, জনতার উদ্দেশেই হাসে, যেন সে এই জনসভার সভাপতি। তাবপব আবো উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওয়াটারপ্রুফটা খুলে কাঁধে ফেলে দিয়েছে হিমাদ্রি, কপালেব চূলগুলি সাপের ফনাব মত উদ্যত। মুখ-ভংগী যেন উন্মাদের মত, পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল হিমাদ্রি, তারপর বোকার মত একটু হেসে চুপ করে গেল, ওর সারাদেহ উত্তেজনায় কাঁপছে। জনতার দিকে তাকিয়ে আবার সেই জুয়ার টেবিলে লোলুপ

নেত্রে চেয়ে রইল হিমাদ্রি। সমবেত জনতা নিঃশব্দ বিস্ময়ে ওর সকল হাবভাব লক্ষ্য করছে।

হিমাদ্রির আকস্মিক হাসিতে সকলেই বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু বিস্মিত হয়নি শুধু সেই স্ত্রীলোক দুটি। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে হিমাদ্রির গায়ের ওপর পড়েছে তারা, হিমাদ্রির অঙ্গে ওদের নিঃশ্বাস এসে লাগছে, কোমল স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে। হিমাদ্রি উ-য়ের মুখের প্রতি পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে ভদ্রতার ভংগীতে হাস্য বিনিময় করল, যেন সে এই মুহূর্তেই ওদের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে। জনতা ওর প্রতি যে অন্তরঙ্গতার ভাব প্রদর্শন করছে ওরা যেন তার চাইতেও অন্তরঙ্গতর সেইটুকু বোঝানোর জন্য ফিস্ ফিস্ করে দু একটা পরামর্শও দিচ্ছে, যেন হিমাদ্রির ওপর ওদের একটা অধিকার জন্মেছে।

জুয়াওয়ালা হেঁকে বলে—"কি মশায়! বন্ধ হয়ে গেল নাকি! টাকা ফেলুন! রঙ পসন্দ্ করুন!—ধম্মি খেল—" হিমাদ্রি কি করে, কোথায় বাজী ধরে দেখার জন্য জনতা প্রতীক্ষা করে, হিমাদ্রি সামান্য ইতস্ততঃ করে একটু অসতর্কভাবেই আটখানি দশটাকার নোট হল্‌দে ছকে ফেলে দেয়।

একটি স্ত্রীলোক বলে ওঠে "এ কি করেছেন! এবার লালে ধরুন, লাল জিতবে এবার দেখে নেবেন—"

সবাই সেই কথার প্রতিধ্বনি করে, অনুরোধ জানায়। হিমাদ্রির বাহুসংলগ্ন স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে কলহের সূত্রপাত হল, প্রথমাকে দ্বিতীয়া বিশ্রীভাবে গাল দিতে থাকে, জনতা নূতন খোরাক পেয়ে আমোদ অনুভব করে তারাও হাসে, জুয়া খেলার একঘেয়েত্ব ঘুচিয়ে স্ত্রীলোক দুটি হিমাদ্রির হিতৈষিণীত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে, তাঁবুর আভ্যন্তরীন দুর্গন্ধ ও ধোঁয়ার কুৎসিৎ আবহাওয়ার ভিতর এ এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীলোক দুটির দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। জুয়াওলা চীৎকার করে উঠে—

—"এই হল্লা থামাও, চিল্লা-চিল্লী করনেকা জায়গা নেই, খেল্‌কা জায়গা—খেলুন বাবু ধম্মী খেল !"

স্ত্রীলোক দুটি আত্মস্থ হয়ে চুপ করল। আবার প্রচুর টাকা ছকে এসে পড়ে, তারপর যখন চাকা থামে দেখা যায় হল্‌দে আর লালে এসে কাঁটা থেমেছে—জনতা চেঁচিয়ে ওঠে, হিমাদ্রির আশীটাকা ডবল হয়ে গেছে, সে ক্ষিপ্রহস্তে টাকাগুলি উঠিয়ে নেবার জন্য টেবিলে হাত বাড়ায়, স্ত্রীলোকদুটি ভাবে হিমাদ্রি এবারে পালাবে, তাই তাদের বাহুবন্ধন কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু হিমাদ্রি যায় না। কালো ছকে কুড়িটাকা ফেলে দেয়। হিমাদ্রির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদুটিও নড়ে চড়ে, বাঁধন শিথিল করতে চায় না।

কালো আর লালে এবার কাঁটা থামল, হিমাদ্রি পুনরায় কালোতেই চল্লিশ টাকা ফেল্‌ল, এবার জেতে কালো আর হল্‌দে—হিমাদ্রি টাকা তুলে নেয়, সব জড়িয়ে প্রচুর টাকা জিত হয়েছে তার।

"এইবার লালে ফেলুন !"

"কালোয় আবার দিন। স্যার।"

"সব টাকা লালে ফেলুন।"

বিভিন্ন কোণ থেকে বিচিত্র অনুরোধ। এ সব কথায় কান দেয় না হিমাদ্রি। শান্ত কণ্ঠে জুয়াওলাকে প্রশ্ন করে "একটা ঘরে কত টাকা পর্যন্ত দেওয়া যায় ?"

একশো টাকা পর্যন্ত মাত্রা ঠিক করা ছিল, কিন্তু জুয়াওলার জীবনে একশো টাকা কেউ ছকে ফেলেনি। তবু হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে জুয়াওলা ভাবে হিমাদ্রি হয়ত সর্বোচ্চ সীমায় পৌছতে পারে। হিমাদ্রির হাতে সব শুদ্ধ কত টাকা আছে জুয়াওলা জানে। এইবার খেলে ওর হার হোক এই তার বাসনা। এতক্ষণে ওর দশা খারাপ পড়েছে নিশ্চয়ই, পাঁচবার ক্রমান্বয়ে জিতেছে এইবার ওর পরাজয়, ওঠা নামা আছেই, ছ'বারের বার বাছাধন কাত হবেই।

গম্ভীর গলায় জুয়াওলা বলে—"আড়াইশো টাকা"—! হিমাদ্রি এতটুকু ইতস্তত: করে না, কিন্তু জুয়াওলা ও জনসাধারণকে বিস্মিত করে হিমাদ্রি কৃপণের মত বুড়ো আঙুল কামড়ে একখানি মলিন পাঁচ টাকার নোট কালো ছকে ফেলে দেয়।

জনতা হেসে ওঠে। হিমাদ্রির ভাগ্যদেবতা যদি বিরূপ হয়ে থাকেন তাহলেও ও বেশি হারবে না। বাজীর টাকাও তেমন বেশি পড়ল না এবার। কাঁটা এবার লালে এসে থামল—হিমাদ্রির টাকাটা লোকসান হল।

জনতা গুঞ্জন করতে লাগল। হিমাদ্রি আবার কালো ছকে পাঁচ টাকা ধরল। যতক্ষণ চাকা ঘুরতে লাগল ততক্ষণ গুঞ্জন চলতে লাগল। চাকা থামতে দেখা গেল কাঁটা এসে সবুজে থেমেছে। এবার জনতা সজোরে হেসে উঠল।

কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—"ওর বারোটা বেজে গেছে বাবা! আর চালাকি নয়—"।

একটি স্ত্রীলোক হিমাদ্রিকে অনুনয়ের ভংগীতে কানে কানে বলে—"চলুন আর নয—আপনার দান কেটে গেছে। অনেক ত জিতেছেন, এবার পালান"।

অপর স্ত্রীলোকটি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—"থাম্ থাম্। তুই চলে যা। ওঁর যা খুশি উনি তাই করবেন, তোর কি? ভারি আমার টসি রে!"—হিমাদ্রির ওপব বাঁধন দৃঢ় কবে তোষামোদ করে বলে—"ওর কথায় কান দেবেন না. এখনও আপনার পয় আছে, আর এক দান খেলুন না"—

প্রথম স্ত্রীলোকটি রাগে জলছে, অশ্লীল বাক্যের তুবড়ি ছুটছে তার মুখে, জনতাও পরমানন্দে উপভোগ করছে এই কৌতুক।

একজন বলল—"কালীর দিব্বি আপনি কালোর ঘরে টাকা দিন এবার—"

সবুজ ঘরে টাকা রেখে গম্ভীর গলায় হিমাদ্রি বলে ওঠে, "এই যে চল্লিশ টাকা"—জুয়াওলা পরিচালকেব মুখের দিকে অর্থসূচক ভংগীতে তাকাল। ইচ্ছা করেই যেন কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা হতে লাগল খেলা শুরু করতে, সব কটি ছকে টাকা পড়ল তারপর চাকা ঘোরানো হল।

হিমাদ্রির বাঁ পাশে যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়েছিল সে আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—"আঃ পোড়া কপাল, এইবার হেরে মরবে দেখছি, সব টাকাটাই জলাঞ্জলি যাবে—"

স্ত্রীলোকটির এই চীৎকার কিন্তু সেই মুহূর্তেই উল্লাসে পরিণত হল—হিমাদ্রি পুনরায় বিজয়ী হয়েছে।

সব টাকাটা ক্ষিপ্রহস্তে সংগ্রহ ক'রে নিল হিমাদ্রি—সে এখন হাঁপাচ্ছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে, অতঃপর কি ঘটবে সেই দৃশ্য দেখবার জন্য উৎসাহ ও উত্তেজনায় আকুল হয়ে রইল।

হিমাদ্রিব যেন সমাধি হয়েছে, এমনই ধ্যানমগ্ন ভঙ্গী তার। টেবিলের দিকে সে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জুয়াওলার ডাকেও তাব ঘোর ভাঙে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছকে টাকা এসে পড়েছে—

—'কই খেলুন, থামলেন যে'—একজন বলে ওঠে। স্ত্রীলোকটি হিমাদ্রিব হয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে—'একটু ভাবতেও দে'ব না দেখছি, ভাল-জ্বালাতন, —'।

জনতা শ্লেষভরে হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে নীল ছক আবার জয়যুক্ত হল।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন বলে উঠল—'আহা-হা।'

কেউ বলে—'মন্তর-টন্তর আওড়াচ্ছে বোধ হয়।' আর একজন বলে, 'গায়ে একটা আলপিন ফুটিয়ে দেখ, বেঁচে আছে কি না।'

বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন উক্তি ও টিটকিরি শুরু হল। কিন্তু বিস্ময়েব ওপর বিস্ময়—এইবারকাব দানে হিমাদ্রি দুটি ছকে আশী টাকা করে বাজী ধরল সবুজ আর কালো—

ভীষণ কলবর শোনা গেল, জুয়াওলারা কি বলাবলি করতে লাগল সে কথা কারো কানে গেল না। চীৎকারে ও গণ্ডগোলে কানে তালা লাগবার যোগাড়। সেই মুহূর্তেই জুয়ার মালিক কি যেন ইশারা করল—তারপর আরো কেউ বাজী ধরতে না ধরতেই চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

এইবার জুয়ার স্থূলাকৃতি পরিচালক একটু মজা করে বসল—এতক্ষণ যে ভাবে ও যেদিকে চাকা ঘুরছিল, এবার তার বিপরীত দিকে চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া হল। এ রীতিমত অন্যায়! এর ফলে হিমাদ্রির শোচনীয় পরাজয় ঘটতে পারে। জনমণ্ডলী হৈ-চৈ করে উঠল। একি অন্যায় কাণ্ড! কিন্তু হিমাদ্রির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি ভাবে চাকা ঘোরান হল সে দিকে ওর কোনো লক্ষ্যই নেই। চাকা থামতেই সমবেত জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"কালো-সবুজ! কালো-সবুজ!"

সবাই খুশি হয়েছে, জুয়াওলা অত্যন্ত করুণ মুখভংগী করে হিমাদ্রির হাতে টাকা তুলে দিল। হিমাদ্রির সৌভাগ্য দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। লোকটি সত্যই জাদু জানে, না—ছদ্মবেশী দেবতা। দরিদ্র, আশাহীন, পেশাদার জুয়াড়ি সবাই ওর কপাল দেখে বিস্মিত। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান কিছুই যেন মনে নেই। সবাই এখন হিমাদ্রিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কেউ বলছে—'এইবার সাদায় ট্রাই দিন।' চীৎকার বেড়ে চলে—

সেই স্ত্রীলোকটি কিন্তু অদম্য, সে আবার চীৎকার করে—'তোমরা থামনা বাপু!'

জনতা স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকটি একজনকে মারবার জন্য হাত ওঠায়। এই কুৎসিৎ আবহাওয়ার ভিতরেও তার নোঙরা হাতখানি তবু ভালো দেখায়।

লোকটি কিন্তু হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে আসে। কাছে এসে উত্তেজিত

ভংগীতে কি যেন বলতে চায়। দ্রুতগতিতে নোয়াখালির টানে কি যে বলে বোঝাও শক্ত।

স্ত্রীলোকটি এদিকে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দুজনের গালাগালির পালা শুরু হয়। সংযত থাকতে না পেরে স্ত্রীলোকটি সহসা লোকটিকে একটি চড মেরে বসল। খিমচেও দিয়েছিল বোধকবি। কিংবা হাতের কাঁচের চুড়ি ভেঙে গিয়েছে, তৎক্ষণাৎ লোকটির কপাল বেয়ে রক্ত গডাতে শুরু হল, লোকটি শুধু স্ত্রীলোকটির হাত দুটি ধরে চীৎকার করতে থাকে। এতেই স্ত্রীলোকটি হাঁউ-মাউ কান্না আরম্ভ করল। হয়ত সে ভেবেছিল সবাই মিলে হিমাদ্রিকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র করেছে। ও যদি বাধা না দেয় তাহলে শেষটায় হয়ত লোকটি সর্বস্বান্ত হবে, আর ওদের কপালে একটা কানাকড়িও জুটবে না।

প্রচণ্ড হট্টগোল—কোন কিছুই শোনা যায় না। সবাই কিছু না কিছু বলছে। দু একবার 'পুলিস—পুলিস' করে—একজন যেন হেঁকে উঠল। তাকে থামাবার জন্য আরো দুজন চীৎকাব করে। শেষকালে পুলিস এলে সবায়ের হাতেই যে দডি পডতে পারে।

—'অনেক টাকা জিতেছেন মশায়, বাড়ি যান।'

—'খেলতে দাওনা, কেন গণ্ডগোল করছ, যতসব—'

—'এইবার সাদায় ধরুন দাদা।'

—'সাদার নিকুচি কবেছে, সাদা একটা রঙ নাকি।'

'কেন উনি কি বিধবা!' রসিকতা করে একজন মাতাল বলে ওঠে।

আর একজন টেক্কা দিয়ে বলে—'কোন শালা সাদাব নিন্দা করে? বাপের বেটা হয়ত এগিয়ে আসুক, দুটো প্যাঁচে কাত কবব।'

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে আবার গুছিয়ে নিয়ে সেই লোকটির চুলের মুঠি বাগিয়ে ধরেছে, তারপর একটি ধাক্কায় তাকে ভীডেব ভিতর ঠেলে দেয়। এই আকস্মিক ধাক্কায় একসংগে কযেকজন পরপব পডে গেল।

তারা গালাগালি করতে থাকে, আর যারা পড়েনি তারা হল্লা করে হাসে। এই ধাক্কাধাক্কিতে স্ত্রীলোকটির আঁচল খসে মাটিতে পড়েছে, ঘর্মসিক্ত ব্লাউজের একাংশ ছিঁড়ে দক্ষিণ স্তনের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই গোলোযোগে সেদিকে কারো লক্ষ্য করার অবকাশ নেই, কারণ হিমাদ্রি আবার বাজী ধরেছে, স্ত্রীলোকটি সংবৃত হয়ে হিমাদ্রির সংগেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল—হিমাদ্রি আবার সবটাকারই বাজী ধরছে।

গোলোযোগ কমল, সবাই ঝুঁকে দেখছে। এক মুহূর্তে সেই কোলাহল-মুখর তাঁবুর ভিতর গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করে। জুয়াওলারা ভয় পেয়েছে, ভয় সব দিক থেকেই। একটা দাংগা বাধতে পারে। খুন জখম, থানা পুলিস সবই ঘটতে পারে। এইরকম কিছু ঘটবার পূর্বেই খেলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ওরা সহসা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু টাকা পড়েছে, একবার ভাবলে হিমাদ্রিকে বলে এতটাকা একসংগে ফেলার নিয়ম নেই। কিন্তু আবার ভাবে লোকটা যদি সব টাকাই হেরে যায় তাহলেই ভালো, দরকার কি কিছু বলে।

হিমাদ্রি বাজী ধরে থরথর করে কাঁপে, উত্তেজনাতেই কাঁপে, উত্তেজনা-জনিত দৌর্বল্য। তারপর সহসা সব টাকা তুলে নিয়ে বলে 'একটি রঙেই সব টাকা দেব।'

এইবার জুয়াওলারা হৈ হৈ করে—'টাকা একবার ফেলে ওঠানো চলে না—ও আর ছোঁয়াই চলে না—'

জনতাও সায় দেয়—'ঠিকই ত', এই ত' আইন।' আবার হাওয়া গরম হয়ে ওঠে, এইবারেই শেষ! টাকা থেকে হাত তুলে নিয়ে হিমাদ্রি বিশ্রীভাবে কাঁপতে থাকে। যেন এইবারেই ওর শেষ।

—'কই খেলুন! খেলা শুরু হচ্ছে।'

হিমাদ্রির তেমনই অচল অবস্থা! আবার সবাই চীৎকার করে—'খেলুন না মশাই, বালা ফেলুন—'

জুয়াওলার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো হিমাদ্রি, তারপর বালাটি নিয়ে যেন দূরাবস্থিত শত্রুর প্রতি আঘাতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ছুঁড়ছে এইভাবে বালাটি ছুঁড়ে দিল।

সবাই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে কি হয়। চাকা অবশেষে থামে, বন্য চীৎকারে তাঁবু সরগরম। এবারও হিমাদ্রির জিত হয়েছে।

জুয়ার মালিক ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠে 'সাদা আর নীল।' তার মুখ বিবর্ণ। যেন সে এখনই অচৈতন্য হয়ে পড়বে কিংবা হিমাদ্রির এই বিজয় অস্বীকার করবে—এমনই তার ভংগী।

জনতা কিন্তু চেঁচায়। যেন আক্রোশভরে চেঁচিয়ে ওঠে—'দাও বাবা টাকাটা ফেলে দাও, সুড় সুড় করে লক্ষী ছেলের মত দিয়ে দাও।'

হিমাদ্রি জুয়াওলার দিকে হাত বাড়ায়, বাঁ হাতে সে বাজীর টাকা ধরে আছে,—জুয়াওলা সভয়ে ফতুয়ার ভিতরকার পকেট থেকে একটি মলিন থলি বের করে টাকা গুণতে থাকে,—আর সেই জনমণ্ডলী উত্তেজিত ভংগিতে চীৎকার শুরু করে, জয়টা যেন তাদেরই হয়েছে। সকলে সমস্বরে টাকা গোণে—'বার, তের, চোদ্দ, প নে-র, ষোলো, ' টাকার অঙ্ক যত বাড়ে গলার স্বরও সেই তালে উচ্চগ্রামে ওঠে—যেন এই টাকাতে তাদেরও একটা অংশ আছে।

তাঁবুর বাইরেও এখানকার এই হট্টগোলের কথা পৌঁচেছে, সেখান থেকে তারা ভীড় করে এসে এই তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করতে চায়। চারজন ষণ্ডা প্রকৃতির লোক তাদের বাধা দিচ্ছে—এদিকে নোট গণনা চলছে—

'আটত্রিশ, উনচল্লিশ,—চ—ল্লিশ।' শেষের কথাটি যেন বিস্ফোরণের মত শোনায়! সকলেই পরস্পরকে কাটিয়ে হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, হিমাদ্রি ওদের আপন জন। তাকে ওরা স্পর্শ করতে চায়। একটু হাস্য বিনিময় করতে চায়। হিমাদ্রি ওদিকে

জুয়াওলার চাপে আটকে আছে। জুয়াওলা হাঁপাচ্ছে, চীৎকার করে কি বলছে কিন্তু কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না—জুয়ার টেবিল উল্টে গেছে, হিমাদ্রি পুরো টাকা পেয়েছে, দুশো কুড়ি টাকা, জনতা টেবিলটাকে ভাঙছে, সবাই হিমাদ্রিকে চায়। একটি স্ত্রীলোক আবার হিমাদ্রির কাছে এসে পড়েছে শীকার হাতছাড়া করতে চায়না সে। তার ব্লাউজ আরও ছিঁড়ে গেছে, একটা জায়গা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেছে—বাহু আর বক্ষ প্রায় উন্মুক্ত, সেদিকে কিন্তু কারো নজর নেই, স্ত্রীলোকটির মুখেও বিজয়িনীর ভংগীমা। সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে-ও চীৎকার করছে, হিমাদ্রিকে বাহুর বাঁধনে দৃঢ় করে বাঁধছে, আর সকলের মত সে-ও মাঝে মাঝে হিমাদ্রির মুখের পানে তাকাচ্ছে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে।

হিমাদ্রি তখনও হাঁপাচ্ছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপাল ও মুখের ঘাম মুছচে, আর একমুঠো নোটের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। জনতার অভিনন্দনের বিনিময়ে মৃদু হাস্য-বিতরণ করছে।

কর্ণ-বিদারী কলরব। দরজার বাধা কাটিয়ে প্লাবনের গতিতে লোক এসে ঢুকছে এই তাঁবুর ভিতরে, এদিকে ভিতরে এতটুকু জায়গা নেই—ঠাসাঠাসি আর ঘেঁষাঘেঁষি। একটি স্ত্রীলোক ত' অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে মাড়িয়ে চলেছে অনেকে, কেউ আবার মাড়িয়ে ফেলে সচেতন হয়ে বিশ্রী গালাগালি দিচ্ছে। একটি বামনাকৃতি লোক, বস্তুটা যে কি তা না দেখেই তার উপর দাঁড়িয়ে হিমাদ্রিকে দেখার চেষ্টা করে, এই অপূর্ব পাদপীঠে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রির শরীরের কিছু অংশ দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করে, এমন উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর দৃশ্য যেন সে জীবনে দেখেনি। সে-ও হাত তুলে গলা মিলিয়ে চীৎকার করে ওঠে, তারপর সহসা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, যেন সীতার পাতাল-প্রবেশ হল। সেই অচৈতন্য স্ত্রীলোকটির পাশে নিজেকে আবিষ্কার করে লোকটির বিস্ময়ের

সীমা থাকে না, কি বস্তুটির ওপর এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি তাকে ভীড়ের ভিতর থেকে এক পাশে সরাবার চেষ্টা করে।

এই সব প্রাণীগুলির বৈচিত্র্যহীন জীবনে হিমাদ্রির এই সাফল্য একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ যেন তাদের ব্যক্তিগত বিজয়, ওরা যেন তার এই জয়লাভের সংগ্রামে সহায়তা করেছে, তাই হিমাদ্রির এই সৌভাগ্যের ওরাও ত' অংশভাগী। তাকে ঘিরে ধরে তাকে স্পর্শ করার জন্য, কথা বলার জন্য, তাই আকুলতা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ওদের ভেতর থেকে যাতে হিমাদ্রি না পালায় তাই এই অবরোধকারী ব্যূহ রচনা। একটা ইন্দ্রজাল যখন ঘটেছে তখন আরো ঘটতে পারে, হয়ত লোকটা বাজীর টাকাটা ওদের সঙ্গে ভাগ করেও নিতে পারে।

হিমাদ্রি সত্যই তাই শুরু করল, এই কটুগন্ধময় অন্ধকূপে আর বেশিক্ষণ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল, নোটগুলি সামলে নিয়ে কনুইয়ের ধাক্কায় ভীড় সরিয়ে পথ করে নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে হিমাদ্রি। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে একখানি দশটাকার নোট মুড়ে তাল পাকিয়ে যে স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ তার বাহুলগ্না হয়েছিল তার হাতে গুঁজে দেয়। এই দৃশ্য দেখে জনতা চীৎকার করে আনন্দধ্বনি করে ওঠে। সব কটি হাত এক সংগে ওর দিকে এগিয়ে আসে—প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত ছাড়িয়ে যে যার নিজের হাত উঁচু করে বাড়াবার চেষ্টা করে।

—'আমাকে দিন, এদিকে দিন!'

এই সব আবেদনে 'জী হুজুর, দাদা আর স্যারে'র ছড়াছড়ি।

এই হট্টগোলে হিমাদ্রি ভীত হয়ে ওঠে, একটা গোলযোগের যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সজোরে ভীড় কাটিয়ে সবেগে বেরিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে হিমাদ্রি। তারপর পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে এসে ভিড়ের পরিমাণ দেখে হিমাদ্রি শংকিত হয়ে পড়ে। অসংখ্য লোকের ভিড়, সবাই এদিকে এগিয়ে আসছে, তাদের কানে হিমাদ্রির অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা পৌঁছেচে। মাথার অবিন্যস্ত চুল হাওয়ায় উড়ছে, পরিশ্রান্ত মুখাকৃতি, চোখ দুটি যেন জ্বলছে, ভিড়ের ভিতর সে-ই যেন মাথা উঁচু করে একটা বিজয়স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে। সৌভাগ্যেব ও সাফল্যের প্রতীক।

জনতা ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর সেই প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে, হিমাদ্রি অপেক্ষা করতে সাহস পায়না, সেই ভীড় ঠেলে একেবারে বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। জনতা অতঃপর কি ঘটতে পারে দেখার জন্যই বোধকরি নিঃশব্দে ওর গতিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হিমাদ্রি তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিযে আসতেই সেই সমবেত কণ্ঠের হল্লা ও হুল্লোড় সহসা থেমে গেল। আবহাওয়ার অভাবনীয় পরিবর্তন —লোকেব আর ফুর্তি নেই, হাসি, ঠাট্টা সব উড়ে গিয়ে তার পরিবর্তে এল ঈর্ষা, ঘৃণা আব লোভ। সুখের সপ্তম স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি যে লোকটিব ভিতর, তার এই ভাবে পলায়ন করার অধিকার নেই। পরম প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি করে আবার সেই শোচনীয় দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েই ত লোকটি পালাচ্ছে। হিমাদ্রির পিছু পিছু তারাও পর্দা ছিঁড়ে, তাঁবু ভেঙে বেরিয়ে আসছে, দল বেঁধে ভীড় করে।

হিমাদ্রি ফুটপাত ধরে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে—কোনোক্রমে হংকং রেস্তরাঁ পর্যন্ত পৌছতে পারলে হয়। ভিতরের নোংরা বিশ্রী আবহাওয়ার পর উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে বেশ ভালো লাগছিল হিমাদ্রির।

ওয়াটারপ্রুফটা এতক্ষণ গায়ে জড়ানো ছিল, ভিতরকার জামা ঘামে ভিজে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি তাই বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে একটি

সিগারেট ধরায় হিমাদ্রি। এই মুক্ত, পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁবুর আভ্যন্তরীণ নরকের কাছে স্বর্গের মত মনে হয়। নোটগুলি এক মুহূর্তও সে হাতছাড়া করেনি, সমানে সযত্নে আঁকড়ে ধরে আছে। এখন ও জনতা থেকে দূরে সরে এসেছে। ওখানকার কলরবের প্রচণ্ডতার পর বাইরের এই রাজপথ নির্জন ও শান্ত ঠেকছে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে হিমাদ্রি, এই গণ্ডী পার হওয়ার জন্যও বটে আর হংকং-এর দরজা বন্ধ হওয়ার ভয়েও বটে—সহসা পিছনে কার যেন জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। সভয়ে সেদিকে তাকায় হিমাদ্রি। কিন্তু পালাবার সুযোগ গ্রহণ করার পূর্বেই তিনজন অপরিচিত লোক ওকে যেন ঘিরে ফেলল, দুজন দুপাশে, একজন সামনে—তাদের কনুই এসে ওর গায়ে ঠেকছে, যেন ওকে আঁকড়ে ধরতে চায়, লোকগুলি একটু মিষ্টি করেই কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু সে কথায় যেন বিষ ঝরে পড়ে—

—"এই যে মশাই, খুব জিতেছেন আজ, বরাত মশাই বরাত, খুব কপাল, আমি ত শেষটায় বললুম সাদা ধরুন—আমাদেরও অদৃষ্ট, যাক অনেক টাকা জিতেছেন।"

সবাই একই সুরে, এক সঙ্গে কথা বলে। যে লোকটিকে দলপতি বলে মনে হয় সে ত একেবারে ওর গায়ের উপর এসে দাঁড়িয়েছে।

হিমাদ্রি গম্ভীর হয়ে থাকে, সে অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছে, তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগিল, এই সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডাদলের হাতে ওর এত কষ্টে অর্জিত সমগ্র অর্থ কি এই মুহূর্তে উড়ে যাবে। গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেয় হিমাদ্রি, তার ফলে অনুগামীদেরও সেই সঙ্গে প্রায় দৌড়তে হয়, হিমাদ্রির ভয় আরো বেড়ে যায়, সে অট্টহাস্য করে ওঠে—সেই নির্জন রাজপথে এই অট্টহাস্য প্রতিধ্বনিত হল।

এই আকস্মিক চীৎকারে লোকগুলি বিস্মিত হয়ে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল—হিমাদ্রি সুযোগ বুঝে দৌড়তে শুরু করে, পথের বাঁকে

একটি সরকারী প্রসাবখানার ভিতব ঢুকে পড়ে হিমাদ্রি হাঁপাতে থাকে, উঁকি মেরে দেখে পিছনের লোকগুলি আসছে কিনা। কিছুক্ষণ আর আওয়াজ নেই, লোকগুলি তাকে খুঁজে না পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিজেকে নিবাপদ বলে মনে হয় হিমাদ্রির। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে আবাব পথে বেরিয়ে পড়ে।

তৎক্ষণাৎ ওর পিছনে কাব েন চাপা কাশি শোনা যায়, সচকিত হিমাদ্রি মুখ ফিবিয়ে দেখে ওদেরই একজন, এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল, এইবাব সুযোগ বুঝে ওকে হয়ত আক্রমণ কববে।

সে প্রতীক্ষায় ছিল, কোন পথে হিমাদ্রি বেবোয দেখার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। হিমাদ্রিকে বেবোতে দেখে মুখেব ভিতব আঙুল পুরে দিয়ে বিশ্রী ভাবে শীষ দেয়, তাবপব গুঁড়ি মেবে হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে আসে, যেন শীকারেব ওপব ঝাঁপিয়ে পড়তে চায।

ভীত সন্ত্রস্ত হিমাদ্রি স্থিব হয়ে দাঁড়িযে ইতিকর্তব্য বিবেচনা কবে। লোকটি তেমন গুণ্ডাকৃতির নয়, একটু শীর্ণ ও অসুস্থ আকৃতি—শয়তান লোকটি পুনরায শীষ দেয়, আওয়াজ এবার একটু দীর্ঘস্থায়ী। হিমাদ্রি বোঝে সংগীদেব আহ্বান কবছে, এই তার ইঙ্গিত। আত্মস্থ ও শঙ্কামুক্ত হযে ওঠে হিমাদ্রি। এই দুর্বৃত্ত যে তাকে শীকাব স্থির কবে আক্রমণ কববে তা হতে পাবে না—সহসা সোজা হযে লোকটিব দিকে দৌড়ে যায।

সজোরে জড়িযে ধবে লোকটিকে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দেয়, একটু সংক্ষিপ্ত সংঘষ হয, লোকটিব গলা টিপে ধরেছে হিমাদ্রি, মুখ দিয়ে তাই গোঁ গোঁ করে আওযাজ বেবোচ্ছে, হিমাদ্রি তাকে আবো কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় —তাবপব হিড হিড করে টেনে অগভীর সবকারী খানায ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর আব একটুও অপেক্ষা না কবে দ্রুতগতিতে ওয়াটগঞ্জের জনবহুল অংশেব দিকে ছুটতে শুরু কবে।

হিমাদ্রি বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখল বাজীর টাকাটা অক্ষত আছে, পা আরো জোরে চালিয়ে দেয়, কাছাকাছি একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সে একটু থেমে মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি ঠিক করে নেয়। সারা দেহে কেমন একটা অবসাদ নেমেছে, গা হাত কামড়াচ্ছে, শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে।

একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নেয় হিমাদ্রি—শীতল হাওয়ার স্পর্শে অবসাদের আংশিক অবসান ঘটে কিন্তু তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে আসে। আর একটু এগিয়ে যেতেই পরিচিত পথ দেখা যায়। অন্তরে একটু স্বস্তির ভাব জাগে।

কাছেই 'হংকং', ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির আমলের এক পুরাতন বাগানবাড়িতে স্থাপিত চৈনিক রেস্তরাঁ, 'হংকং' নামে পরিচিত। ব্যোমকেশ এই জায়গাটিতে নিয়মিত আসে, ভিতর থেকে সেই মধ্য রাত্রেও হুল্লোড় আর হল্লার হট্টগোল ভেসে আসছে, আব ঘষা-কাঁচের সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চাকচিক্যময় কাঁচের গ্লাস আব ছুরি-কাঁটার আওয়াজ ও মাতালের অংসলগ্ন ও অবান্তর প্রলাপ শোনা গেল। এই দৃশ্যে হিমাদ্রির মনোভার লাঘব হয়ে গেল, চিত্ত পুলকিত হযে উঠল, মুখে হাসি ফুটল, এই ফেনোচ্ছল সুরাপাত্র তার তৃষ্ণা আবও বাড়িয়ে তুলল। একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি বসে পড়ল, একজন বয় অর্ডার নেবার জন্য দৌড়ে এল, হিমাদ্রিকে এরা সবাই চেনে, দু চারআনা টিপ্‌স্ পেয়ে থাকে, তাছাড়া হিমাদ্রি বয়গুলির সংগে আলাপ জমিয়ে কোথায় তাদের বাড়ি, দেশে কে কে আছে এই সব প্রশ্ন করে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে। বিনিময়ে পেগের মাপ কিঞ্চিৎ বেশি হয়, আরো দু চারটি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। হিমাদ্রি বীয়র আর স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিল।

সবাই যেন হিমাদ্রির দিকে চেয়ে আছে, সহসা যেন রেস্তরাঁটি শান্ত

হয়ে গেল। এই আকস্মিক নীরবতা অত্যন্ত বিশ্রী লাগতে লাগল। হিমাদ্রি গা থেকে বর্ষাতিটা খুলে রাখল, তারপর মাথার চুলগুলি হাত দিয়ে সুবিন্যস্ত করে শার্টের বোতামগুলি একে একে খুলে দিল। হাতটা একবার নাড়ল, কিন্তু কিসের এই অস্বস্তি, কেন এই অপ্রতিভ ভাব তা সে বুঝতে পারে না। এই সময়েই বয়টি বীয়রের বোতল আর স্যাণ্ডউইচের প্লেট নিয়ে এসে পৌঁছল। হিমাদ্রি আর পারিপার্শ্বিক স্তব্ধতা বা অপরের সন্দিগ্ধ চাউনি সম্পর্কে না চিন্তা করে সফেন গ্লাসে একটি দীর্ঘ চুমুক দিয়ে এক খণ্ড স্যাণ্ডউইচে কামড় লাগাল আর কি পরিমাণ টাকা আজ সন্ধ্যায় সংগৃহীত হল মনে মনে তার একটা হিসাব শুরু করলে।

টাকার অংকটা ভেবে হিমাদ্রির হাসি পায়। পকেট আজ তার ভর্তি, বিনা পরিশ্রমে এত টাকা লাভ একি সহজ কথা! যে গুণ্ডা তিনটে ওর কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে এসেছিল তাদের কথা ভেবেও মনে করুণা জাগে, হাসিও পায়, আপন মনেই সজোরে হেসে ওঠে—মুখ থেকে খাবার ছিটকে পড়ে।

আশে পাশের সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, লোকটির রকম দেখে তাদের মনে বিস্ময় জাগে। রেস্তরাঁর চারিধার থেকে সাগর তরঙ্গের মত হাসির স্রোত বইতে শুরু হয়, অথচ একান্ত অকারণ। হিমাদ্রি বোঝে হাসিটা ওকে নিয়েই, ওকে কেন্দ্র করেই হাসির রোল উঠেছে। হিমাদ্রি একটু অপেক্ষা করে তারপর সেই ঢেউ যখন ওর গায়ে এসে লাগে তখন একেবারে তার ভিতরে ডুব দেয়। এই মুহূর্তটি ওর জীবনে অপূর্ব, অবিস্মরণীয়।

খালি গ্লাসটি টেবিলে নামিয়ে হিমাদ্রি মুখ তুলে তাকাতেই বয় তাড়াতাড়ি ছুটে এল, হিমাদ্রি বলল—'আর একটা—'

মুখের হাসি চেপে নোয়াখালিবাসী বয় 'জী হুজুর' বলে ব্যস্ততা

দেখিয়ে যাবার উদ্যোগ করে, পিছন থেকে একজন ভারি গলায় বলে ওঠে—'দোঠো—'

লোকটি ব্যোমকেশ !

বয়কে দুটি বোতলের ইঙ্গিত জানিয়ে হিমাদ্রি ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকায়। বলে, 'তুই কি এতক্ষণ এখানেই ছিলি নাকি ?'

বিরাট ব্যোমকেশ এ প্রশ্নের জবাব দেয় না, কম্পিত হস্তে সে একখানি চেয়ার টেনে বসে পড়ে। বীয়রের প্রতিক্রিয়ায় তার চোখ ফুলে উঠেছে, জবাফুলের মত লাল চোখে একটা প্রত্যাশাভরা শিশুসুলভ চাউনি। 'কিরে হিমু কিছু জিত্‌লি ?'—ব্যোমকেশ সহজ ভাবেই প্রশ্ন করে। হেসে আবার বলে—'কত পেলি ?' মদ্যপানের ফলে ওর সমস্ত উচ্ছ্বাস, সমস্ত উত্তেজনার অবসান হয়েছে, বহিঃপ্রকৃতি বেশ সরল ও শান্ত হয়ে এসেছে।

হিমাদ্রি প্রথমটায় কথার জবাব দেয় না,—ব্যোমকেশ ওর সংগে যায়নি তাই মনে মনে তার ওপর একটু আক্রোশ ছিল, তারপর গোড়া থেকে আজ এমনই একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব নিয়েছিল সে, যা হিমাদ্রিকে একটু ক্ষুণ্ণ করেছে—এখন কিন্তু ব্যোমকেশ অনেকখানি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, হিমাদ্রি তাই ওকে বন্ধুত্বপূর্ণ দু' এক কথা বলতে চায়, কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ব্যোমকেশ মাথা নিচু করে রইল, সুরার প্রভাব থাকলেও হিমাদ্রির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সে যেন সচেতন।

ইতিমধ্যে বীয়র এসে পড়ায় এই অশোভন অবস্থার অবসান হল। গ্লাসে সেই আগ্নেয় তরল পদার্থ পড়তেই উচ্ছল ফেন তরঙ্গ আশে পাশে ফুটতে লাগল—উভয়ে এক একটি গ্লাস তুলে নিল, হিমাদ্রির মন ক্রমশঃই মেঘমুক্ত হয়ে এল, ক্ষুদ্র ঈর্ষার ঊর্ধ্বে উঠল বন্ধুপ্রীতি।

—'কত পেয়েছি বলত ব্যোমকেশ ?' প্রসন্ন মনে প্রশ্ন করে হিমাদ্রি।

—'কিছু পেলি নাকি? সত্যি?'

—'নিশ্চয়ই। শুধু কিছু নয়—বেশ কিছু। কত হতে পারে অনুমান কর।'

ব্যোমকেশ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে সশব্দে অথচ অনিচ্ছাকৃত ভাবে চারিপাশ চকিত করে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—'কত, একশ টাকা?'

কোন কথা না বলে হিমাদ্রি ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিলের অধাংশ তুলে দেখাল, তারপর অপর কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি নোটগুলি যথাস্থানে রেখে দিল।

মৃদুকণ্ঠে বলল—'সাড়ে তিনশো টাকা।' টাকাটা ত কম নয়। এতগুলি টাকা একত্রে দেখে ব্যোমকেশের যেন নেশা ছুটে গেল, হিমাদ্রি আশা করেছিল ব্যোমকেশ এবার কিছু বলবে, কিন্তু ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বোতলের অবশিষ্ট অংশটুকু গ্লাসে দিয়ে সবটুকু এক নিঃশ্বাসে গলায় ঢেলে দিল। ঠোটটি জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে হিমাদ্রির মুখের দিকে না তাকিয়েই গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব্যোমকেশ বলে—'তুই একটা ঐশ্বর্য পেয়েছিস হিমু রাজার ঐশ্বর্য।'

কথাগুলি বেশ মৃদু সুরেই বলে ব্যোমকেশ।

হিমাদ্রি ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয়—এতক্ষণে মনে হয় টাকার কথাটা ব্যোমকেশকে না জানালেই ভাল হত হয়ত।

ব্যোমকেশ আবার বলে—'এখন ত বাবা বড়লোক তুই, দুটো 'বড় পেগ' বলে দে— এই টাকায়—'

হিমাদ্রি নিরুৎসাহের ভংগীতে বলে—'এ সব নেহাৎই লাক্, হঠাৎ পেলাম।'

ব্যোমকেশ সেই সুরেই বলে, 'লাক আর লাভ, লাভ আর লাক, সবটাই হল প্লাক্—'

হিমাদ্রির মুখে আর কথা নেই, সে নিঃশব্দে পান করছে। বীয়র আর হুইস্কির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার সুরাচ্ছন্ন মনে সুবুদ্ধির উদয় হয়। প্রাণসঞ্চারিণী নূতন কণিকার মত ওর সারা দেহে একটা নূতন অনুভূতি, নূতন চেতনার সঞ্চার হয়।

কিছুক্ষণের ভিতরই উভয়ে নিঃশব্দে 'হং-কং' থেকে বেরিয়ে পড়ে রিক্‌সায় উঠে বলে—'এই পদ্মপুকুরের মোড়ে যাব—জল্‌দি।'

রিক্‌সা জনহীন পথে ছুটে চলে। উভয়ের মুখে তেমন কথা নাই, মাঝে মাঝে এক আধটা কথা ওঠে আর উভয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে।

হিমাদ্রির পকেটস্থ টাকা উভয়ের দৃষ্টিভংগীর একটা আকস্মিক পরিবর্তন সাধন করেছে, উভয়েরই মনোভংগীকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। হিমাদ্রির জীবনে যেন একটা নূতন যুগসন্ধি উপস্থিত।

স্ত্রীলোকটির হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে অপহৃত টাকা ক'টি বুক-পকেটে যেন কাঁটার মত বেঁধে, হিমাদ্রি এই ভেবে মনকে প্রবোধ দেয় ক'টাই বা টাকা, ইন্‌সিয়োরেন্স্ কোম্পানির কাছ থেকে ত সব টাকাটাই পাবেন—কতদিন আর এ কথা তাঁর মনে থাকবে।

তবু ত এটা চুরি। পদ্মপুকুরের বাসাবাড়ির সামনে এসে রিকসা থামে……

খিদিরপুরের পদ্মপুকুরের একপ্রান্তে ওদেব বাসাবাড়ি। একটি ঘবে দুজনে শোয়, আর এক্‌জন থাকেন তিনি ব্যাঙ্কে কাজ করেন। নিরীহ প্রাণী। বাড়ির প্রৌঢ়া কর্ত্রী নিঃসন্তানা বিধবা। দীর্ঘ দিন এইখানে থাকার ফলে তিনি ওদের সন্তানের চোখেই দেখেন।

ফিরতে প্রায়ই রাত হযে যায় তাই গিন্নীমার ব্যবস্থানুসারে সদর দরজায় চাবি দেওয়া থাকে। বাড়তি চাবি ওদের কাছেই থাকে। হিমাদ্রি ব্যস্তভাবে দরজা খোলে, আর ভাবে চুরি থেকে ভাগ্যোদয়, পাপের অপূর্ব পুরস্কার, কি বিচিত্র কাণ্ড!

অর্থে অর্থলাভ, পাপে পাপ বৃদ্ধি, উভয়বিধ অর্থ ই কিন্তু সদ্ভাবে সংগৃহীত নয়। চুরি আর জুয়া, অর্থাগমের সহজ ও মসৃণ পথ, কিন্তু শেষ কথা নয়।

দরজা খুলল। তন্দ্রাবিষ্টের মত ব্যোমকেশ ও ধীর লঘুপদে হিমাদ্রি ভিতরে ঢুকে পড়ে।

প্রাচীন ধরনের বাড়ি, দেউড়ি পার হয়ে উঠান, দেউড়িতে একটা ম্লান কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে—একপাশে চাকরটা চটের বিছানা বিছিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে—আর দেউড়ির সুদূরতম কোণে যেন একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

হিমাদ্রি থম্‌কে দাঁড়ায়, ফলে অন্যমনস্ক ব্যোমকেশ এসে হিমাদ্রির গায়ে ধাক্কা দেয়।

হিমাদ্রি চুপি চুপি বলে—'এই বকুলরাণী এসেছে রে—'ব্যোমকেশ কোনও কথা বলে না।

ছায়ামূর্তি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর পদে ওদের দিকে এগিয়ে এল, আর তার সামনে দুর্দান্ত হিমাদ্রি আর ব্যোমকেশ যেন মেষ-শিশু, মুখে একটিও কথা নেই। অন্য সময়ে হলে কথা কিছু হত, কিন্তু আজ আর কারো সাহস নেই।

বকুলের মুখে একটা শ্লেষ মিশ্রিত ক্ষুরধার হাসি কিন্তু সে হাসি অত্যন্ত মৃদু, বাতাসের মত তার পাত্‌লা ঠোঁট দুটির ভিতরই সীমাবদ্ধ। এই হাসির জবাবেও ওরা কিছুই বলতে পারে না। অথচ বকুলরাণীর মুখ দেখে মনে হয় ওদের কাছ থেকে সে কিছু শোনার আশা রাখে।

ওদের সামনেই গা থেকে ফল্‌সা রঙের মোটা খদ্দরের চাদরটি খুলে ফেলে বকুলরাণী, গায়ের চাদরের আবরণে যে শুভ্র সুন্দর তনু ঢাকা ছিল, তা মেঘমুক্ত সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, স্বল্পাভরণ দেহের

ভিতর থেকে গলার সরু হার ও হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি সেই আলো-আঁধারের ভিতরও চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

ওদের এই নীরবতা ভেঙে বকুলরাণীই কথা বলে প্রথম, ঝঙ্কার করে বলে ওঠে—'তবু ভাল বাড়িতে ফিরে এসেছ, আমি ত' ভেবেছিলাম, ভোরের আগে আসতে পারবে না। যাক এখন দুমুঠো খেয়ে নিয়ে বুড়িটাকে উদ্ধার করো।' এই বলেই অত্যন্ত দ্রুতপদে চলে গেল বকুল-রাণী, অত্যন্ত শব্দ করে একটা দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা গেল।

হতভম্ব হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে বলল—'দেখলি! কি কাণ্ড!'

ব্যোমকেশ বলল—'একেবারে জংলী হয়ে উঠছে দিনদিন।'

হিমাদ্রি কোন কথা না বলে ওয়াটারপ্রুফটা দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে।

গিন্নীমা বারান্দার একপ্রান্তে বসে বোধকরি একখানি ছিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলেন—তাড়াতাড়ি উঠে খাবার আয়োজন করে দিলেন। আসন পাতাই ছিল, শুধু খাবার গুছিয়ে দেওয়া। এমনই অবস্থা—না খেলেও মুসকিল, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুজনকে সেই রাত্রে আহারে বসতে হল। গিন্নীমার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বাক্য ও ব্যবহার তাঁর লক্ষ্য করার মত। দেখলে মনে হবে তিনি এদের ওপর হয়ত কিঞ্চিৎ রুষ্ট বা এদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে। হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশ ওঁর মুখের দিকে তাকায় না, আড়চোখে তাঁর গতিবিধিটুকু শুধু লক্ষ্য করে। গিন্নীমার ইঙ্গিতমত ওরা নীরবে আসনে গিয়ে বসল।

গিন্নীমা বললেন—'রাত অনেক হয়েছে বাবা। ভাতটা উনানে বসানো ছিল অল্প আঁচে, তাই বোধ হয় একটু গরম আছে। আর সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে—এত রাত্তিরও করতে পারো বাবা—'

একথারও কোনো জবাব দেয় না ওরা, গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে আহারের উদ্যোগ করে।

গিন্নীমা আবার বললেন—'শরীর কি তোমাদের ভালো নেই বাবা?' উগ্র গন্ধ নিশ্চয়ই তাঁর নাকে গিয়েছে—কিন্তু সে কথা প্রচ্ছন্ন রেখেই এই প্রশ্ন। গিন্নীমা উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন না, পাশের ঘরে গিয়ে আগামী প্রভাতের জন্য তরকারি কুট্তে বসেন—ঘরটি অন্ধকার, তাই দরজার সামনে বঁটি এনে বেশ গোছ করে বসে মোচা কুটতে আরম্ভ করেন। আলো পাওয়াও যাবে আর ওদের ভাবভংগী ও কথাবার্তার কিছু অংশ জানা যাবে। সহসা গিন্নীমা বললেন—'বকুলরাণী সেই রাত আটটা থেকে সমানে বসে আছে, কি জানি কি যেন দরকার!'

কেউই কথা বলেনা, উভয়েই একত্রে মুখ তুলে গিন্নীমার মুখের দিকে তাকায়।

গিন্নীমা হিমাদ্রিব দিকে ফিরে বললেন—'আর তোমার দিদি এসেছিলেন সন্ধ্যার দিকে।'

হিমাদ্রি উৎকণ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করল—'কেন কিছু বললেন নাকি!'

—'এমনই দেখা করতে এসেছিলেন বোধ হয়। বেশীক্ষণ ছিলেন না।'

হিমাদ্রি কি বলতে যাচ্ছিল তারপর সংযত হয়ে আবার নীরবে আহার করতে লাগল। দিদি কেন এসেছিলেন এই কথা চিন্তা করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হিমাদ্রি জিভ কামড়ে ফেলল।

ব্যোমকেশ স্তব্ধতা ভেঙে বলে—'কিছু কাজ নিশ্চয়ই ছিল, তোমাকে ত' একটা কিছু করবাব জন্য তিনি অনেকদিন ধরেই বলছেন।'

গিন্নীমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আচ্ছা আমি তাহলে যাই বাবা, সেই সাত সকালে উঠেছি, বসিনি দাঁড়াইনি—'একটা জবাব তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন জবাবই এল না।

গিন্নীমা আবার বললেন—'হ্যারিকেনটা তাহলে নিভিয়ে দিও বাবা।'

আবার তিনি ইতস্ততঃ করেন। কণ্ঠস্বরের তিক্ততা সত্ত্বেও তিনি এই প্রাণীদুটির মনোভংগী জানার জন্য বিশেষ কৌতূহলী—সব জিনিসটাই কেমন গোলমেলে লাগছে তাঁর।

তিনি বললেন—'আমি তাহলে যাচ্ছি—'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি নিঃশব্দে আবার ফিরে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য।

বিশেষ কিছু শোনা গেল না। বারকয়েক 'সাড়ে পাঁচশো' 'অনেক টাকা', 'রাজার ঐশ্বর্য,"এই সব টুকরা কথা শোনা গেল, হাসির রোল—তারপর হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল—'এত হৈ চৈ করিসনি এখন থেকে—'

'কিন্তু পাঁচশো—'

জলের গ্লাস মেঝেতে ঠোকার আওয়াজ শোনা গেল। গিন্নীমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল—কি ভয়ানক ব্যাপার—সাড়ে পাঁচশো—

গিন্নীমার হৃদপিণ্ডের কাজ যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর দাঁড়ালেন না তিনি, তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেন। অনেক পরে হিমাদ্রি আর ব্যোমকেশ শুতে এল কিন্তু তবু সারারাত ধরে এই বাড়িটিতে কি যেন জাগ্রত রয়ে গেল—সেই জাগরণের অংশী হলেন গিন্নীমা, হিমাদ্রি আর ব্যোমকেশ। টাকা—সৌভাগ্যের সূচনা,—সংগ্রহ ও সঞ্চয়,—মোটা টাকা!

গিন্নীমার চোখে ঘুম নেই, কেউ নেই তাঁর ত্রি-সংসারে, আছে এক দুঃসম্পর্কের ভাইপো। তবু টাকার মোহ তাঁকে পাগল করে রেখেছে—তাই এই বিভ্রান্তিকর চিন্তার দুঃসহ জ্বালার অংশভাগিনী হয়েছেন একমাত্র তিনি। হিমাদ্রি আর ব্যোমকেশ চুপি চুপি কি বলে এই ভেবেই গিন্নীমার বিনিদ্র রজনী কাটে!

হিমাদ্রিদের ঘরে আজ আর বিছানা তৈরি করতে হয় না,—বিছানা আজ তৈরি করা রয়েছে, জামাগুলি ধীরে ধীরে খুলে শোয়ার আয়োজন করে হিমাদ্রি, ব্যোমকেশ ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়ে এপাশ ওপাশ করছে—তার চোখে ঘুম নেই, কিন্তু সে আলোর দিকে নীরবে চেয়ে আছে—সারাদিন কি ভাবে কাটলো মনে মনে তারই হিসাব নিকাশ চলছে। কিন্তু শ্রান্তিহীন জটিলতায় পরিপূর্ণ হিমাদ্রির বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা—বহুবিধ চিন্তার সমাবেশে মাথার ভিতরটা জ্বালা করে। বিচ্ছিন্ন ভাব, রাগের সূত্র, ঘৃণা ও আনন্দের উৎসধারা সন্ধান করে অচেতন মন মাথা খুঁড়ে মরে।

হিমাদ্রি অতি সাবধানে তার কষ্টার্জিত অর্থ বালিশের তলায় রেখে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। একটির পর একটি কথা মাথায় এসে দুর্বল চিন্তাটিকে গ্রাস করে ফেলে—স্বস্তির ভঙ্গীতে নিঃশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি পাশ ফেরে। উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরের চারিপাশে যেমন কখনও শান্ত কখনও বা অশান্ত ঝটিকার আন্দোলন অনুভূত হয়, হিমাদ্রির অন্তর্লোকে তেমনই শান্ত ও অশান্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহমান। হিমাদ্রি জীবনে অপূর্ব ভাগ্যোদয়ের সুখস্বপ্ন দেখে, সামান্য কয়েক শত টাকা নয়—অসীম বিত্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে হিমাদ্রির নাম বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, এদিনের এই সামান্য অর্থলাভ সেই আসন্ন ভবিষ্যতের পূর্বাভাস মাত্র। হিমাদ্রি পরম শান্তিতে নিরুপদ্রব নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

পাশের খাটে অশান্ত ব্যোমকেশ ছটফট করে, বিপ্লবের আগুন আবার তার অন্তরে লেলিহান শিখা বিস্তার করেছে, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের প্রশান্ত আকাশের মত বর্তমানের সুখশয্যায় সে শায়িত বটে কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপ্রলয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যে তারই অন্তরে এই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

বকুলরাণীর বয়স বাইশ-তেইশ, দেখায় কিন্তু আরো কম, ছিপ্ছিপে একহারা চেহারা, চোখ দুটি ডাগর। চোখের পাতা এমনই কৃষ্ণবর্ণ যে সহসা দেখলে কাজল মাখানো বলে ভ্রম হয়, সামনের দাঁত কিঞ্চিৎ উঁচু, কথা বলার সময় ধরা পড়ে, এই বিকৃতি কিন্তু সৌন্দর্যের হানি করেনি, তার রমণীয়তা যেন আরো বেড়ে গেছে, কথা কয় মৃদু স্বরে ও অত্যন্ত ধীর গতিতে, আর এমনই তার গাম্ভীর্য যে এই উদ্দাম প্রকৃতির দুটি প্রাণী তার কাছে শিশুর মত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

এই অঞ্চলের কর্পোরেশন-ফ্রী-প্রাইমারি-স্কুলে বকুলরাণী মাস্টারি করে। প্রায় পাঁচ-ছ বছর এই কাজেই জড়িয়ে আছে, ম্যাট্রিক পাস করার পর এদিককার কাউন্সিলারকে ধরে অতিকষ্টে চাকরিটি সে সংগ্রহ করেছিল, তারপর এই চাকরি বজায় রেখে পরপর আই, এ, ও বি, এ, পাস করেছে, চাকরির উন্নতিও হয়েছে ধাপে ধাপে। এইখানেই হিমাদ্রির দূর সম্পর্কের বোন পুষ্পময়ী হেডমিস্ট্রেস। বকুলরাণী ও পুষ্প দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির সংযোগ বর্তমান। সমস্ত সময় একত্রেই কাটে, পারস্পরিক মতৈক্য থাকায় ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড়। স্কুলের ছুটির পর দু'জনে বসে বসে বসে নানান বিষয়ের আলোচনা চালায়, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও দু'জনের মনোভঙ্গি এখন এক হয়ে উঠেছে।

বকুল গরীবের মেয়ে, বাবা ছিলেন জাহাজঘাটার পঁচিশ টাকার মালবাবু। অল্প বয়সেই দায়িত্বভার মুক্ত হয়ে পরপারে পৌঁচেছেন। মেয়ে পড়িয়ে, ঠোঙা তৈরি করে, সেলাইএর কাজ করে পড়াশোনা চালিয়েছে বকুলরাণী, মা মারা যাওয়ার পর সকল বাঁধনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, বলে—'আমিই ত আসল প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারা আর কাকে বলে? মা নেই, বাপ নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই, টাকাকড়ি

কোনোকিছুর বোঝা-ই বিধাতা কাঁধে রাখতে দেননি। বাপ পঁচিশ টাকাতেই জীবনপাত করেছেন, আমি তাই জনতারই একজন, প্রভেদ শুধু পরিচ্ছন্ন পোশাকে।'

এই সব কথা বলে বটে বকুলরাণী, কিন্তু প্রকৃতি ও আকৃতিতে এই শ্রেণীর অনেক ওপরে তার স্থান, ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার জন্য সবাই তাকে ভয় করে, মর্যাদা-মণ্ডিত মুখভঙ্গি শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। চরিত্রে এমন একটা সহজভাব আছে যা প্রথমেই চোখে পড়ে। নিজের মনোভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে, জটিল বিষয়ের দ্রুত সমাধানে বকুলরাণীর জুড়ি নেই। যেভাবে তাকে পাঁচজনের একজন হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তার জন্যে মনে মনে একটু অহংকার আছে বকুলের—আবার পুষ্পময়ীর পবিত্র চরিত্রের সদ্‌গুণাবলীর প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধাও আছে।

পুষ্পময়ীর সংস্পর্শে এসেই বকুলরাণীর হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু এই আলাপই দুজনের সখীত্বের মধ্যে একটি আসন্ন বিচ্ছেদের কুয়াশা সৃষ্টি করেছে।

হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশ মাঝে মাঝে পুষ্পদির কাছে আসে, বকুলরাণীও থাকে, ব্যোমকেশের অনাড়ম্বর নিরাসক্ত প্রকৃতি সহজেই ভালো লাগে, এদিকে হিমাদ্রিরও যেন বকুলের ওপর একটা টান আছে বলে মনে হয়।

এই দু'টি রমণীর জীবনে তাই হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশ কালো মেঘের মত হয়ে জমে উঠেছে। যে সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে, উভয়ের মধ্যে কারও তা স্বীকার করতে সাহস হয় না, দু'জনেই বোঝে যে এই মানুষ দু'টি একত্র থাকার ফলে এইভাবে যথেচ্ছ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। বকুল ভাবে—ব্যোমকেশের মত একজন শক্তিশালী শ্রমিক নেতা হিমাদ্রির মত লোকের প্রভাবে দিন দিন অবনতির নিম্নতম সোপানে নামছে, আর পুষ্পময়ী ভাবে, একটা নিম্নশ্রেণীর শখের বিপ্লবী ও মাতালের সংস্পর্শে এসে চতুর ও বুদ্ধিমান হিমাদ্রি এতবড় বংশের মান-মর্যাদা ধূলিসাৎ

করছে, নিজে অধঃপতিত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করা, একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দু'জনকে দু'মুখে সরিয়ে দেওয়া।

কাজটি কিন্তু সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। পুষ্পময়ী জানেন ব্যোমকেশের প্রতি একটা টান আছে বকুলের, বকুল ব্যোমকেশকে হয়ত ভালবাসে ; ব্যোমকেশকে দেখলে পুষ্পময়ীরও মনে হয় এই শক্তিশালী বিরাট পুরুষটির ভিতর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ আছে, পুষ্পময়ী বোঝেন ব্যোমকেশেরও বকুলের ওপর একটু ঝোঁক আছে—দু'জনের মিলন পুষ্পময়ী কামনা করেন। প্রথমতঃ সকলেরই মঙ্গল হোক এই তাঁর জীবনাদর্শ বলে, দ্বিতীয়তঃ পুষ্পময়ী ভেবে দেখেছেন উভয়ের মিলন মঙ্গলকর হবে কারণ দু'জনেই একশ্রেণী থেকে এসেছে, দু'জনের আদর্শ মোটামুটি এক, শ্রমিক-বিপ্লবে দু'জনেই উৎসাহী, বকুলরাণীও সন্ত্রাসবাদী-দের দলে এদের সংস্পর্শে এসে শ্রমিক আন্দোলন বুঝছে এদেব সাহায্যেই। তাই ব্যোমকেশ ও বকুলেব মিলনকে বিলম্বিত করা হিমাদ্রির পক্ষে অন্যায়।

পুষ্পময়ী মাঝে মাঝে বলেন হিমাদ্রিকে—'তুমি একটা গাধা! কবে যে থামবে কে জানে!'

হিমাদ্রি উত্তপ্ত হয়ে বলে—'তাব মানে?'

—'এই রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর হল্লা কবা!'

হিমাদ্রি শান্তভাবে হাসে, পুষ্পময়ীও হাসেন, বলেন—'তুমি আব তোমার ওই নীরেট বন্ধুটি, যেমন যণ্ডামার্কা চেহারা তেমনই বুদ্ধি, রাস্তা দিয়ে যখন যাও—এমন দেখায়।'

হিমাদ্রি কি ভাবে, শান্তভাবেই বলে—'না না, ব্যোমকেশ লোক ভালোই!'

—'ভালো বই কি। একেবারে গণ্ডমূর্খ, চাষা, কি করে যে পাস-টাস করেছে কে জানে? দেখলেই ত' মনে হয় বন থেকে বেরিয়ে এল—'

পুষ্পময়ী হাসেন, কারণ হিমাদ্রিকে চটাবার জন্য যে ব্যোমকেশকে তিনি আঁকছেন, সে যেন চোখের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

হিমাদ্রি পুষ্পদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হিমাদ্রির এই নির্বোধের মত নীরবতা পুষ্পময়ীকে উত্তেজিত করে তোলে, চীৎকার করে তিনি বলে ওঠেন :

—'একবাব ওকে দেখলেই যথেষ্ট, কোথায় চলেছে, কি ওর বক্তব্য সবই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুমি কি ভাবো—কেউ ওকে ভয় করে? থোড়াই কেয়ার করে—'

—'কেউ কেউ কবে বই কি?' হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—

হিমাদ্রি মনে করবার চেষ্টা করে, কারা ব্যোমকেশকে ভয় করে, কারা তার আদর্শ মানে, তাকে মেনে চ'লে, এমন কি ব্যোমকেশেব চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্যেব কথা উল্লেখ করতে চায়, কিন্তু কিছুই তার মনে পড়ে না, বলাব মত কিছু খুঁজে পায না।

পুষ্পময়ী ঠেস দিযে বলেন—'তুমিও ওর গুণগানে পঞ্চমুখ দেখছি!'

—'কিছু ভালো ওর মধ্যে আছেই ত, একথা অস্বীকার করা চলে না।' হিমাদ্রি অবশেষে বলে।

পুষ্পময়ী হিমাদ্রির কাছে সবে এসে বলেন—'আচ্ছা হিমু, তুইও ত ওকে সত্যি ভালোবাসিস্ না, ওর প্রকৃত বন্ধু ন'স্, ব্যোমকেশও তোর হিতৈষী নয়, ওকে তুই ঘৃণা করিস্, অথচ কেন এই মাখামাখি!'

—'কে বলেছে, এসব কথা যারা মনে করে তারা আমাদের শত্রু, এ হতেই পারে না—অসম্ভব।'

পুষ্পময়ী দৃঢ় গলায় বললেন—'এই কিন্তু সত্য, তুমি ওকে ভালোবাসো না, ঘৃণা করো, আব আমার চোখে যদি এ ব্যাপার ধরা পড়ে থাকে, তাহলে বকুলেব চোখেও তা এড়িয়ে যায়নি—একদিন

ব্যোমকেশ স্বয়ং এই তথ্য আবিষ্কার করবে, আর সেদিনই দেখবে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে।'

—'আমরা কিন্তু সত্যি বন্ধু, ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ—'

—'কখনোই নয়, তা হতেই পারে না ; ওতে আর তোতে আকাশ পাতাল প্রভেদ।'

হিমাদ্রি কথাটি তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'তোমরা ওকে দেখতে পারো না, ও গরীবের ছেলে বলে, বংশ-মর্যাদা নেই তাই—'

—'তা নয় হিমু, ওদের ছেড়ে দেনা তুই, ওরা এক স্তরের, একই পথের দু'টি প্রাণী, বকুল আর ব্যোমকেশ যা করে করুক, তুই চলে আয়, ওদের মাঝে গিয়ে পড়ে তুই কেন একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, নিশ্চয়ই এর ভেতর জেলাসি আছে, একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার কুৎসিত কালো মাথা উঁকি দিচ্ছে—!'

অস্বস্তি বোধ করে হিমাদ্রি, পুষ্পদির কথার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করে জ্বালায় ছটফট করে হিমাদ্রি। অত্যন্ত দুর্বলভাবে ম্লান মৃদু গলায় বলে—'হঠাৎ তোমার একথা মনে হল? কি করে জানলে?' —তারপর তখনই আবার শক্তি সঞ্চয় করে বললে—'ননসেন্স, যত সব আজে বাজে কথা। আর কোনও কথা নেই তোমার?'

মনে মনে কিন্তু বুঝল হিমাদ্রি, দিদি ব্যোমকেশের সঙ্গে তার মিলনের উৎসটুকুর সন্ধান পেয়েছেন। অতর্কিতে ধরা পড়ে মানুষ যেমন অসহিষ্ণু ও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে হিমাদ্রিও সেইভাবে বলে ওঠে— 'যে যার নিজের কাজ করলেই পারো, আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাও কেন? আমাদের ছেড়ে দাও না বাপু, যেমন আছো তেমনই থাকো, গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এসে হানা দিয়োনা।'

হিমাদ্রি পুষ্পময়ীর কথা ভাবে, পুষ্পময়ী অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত স্বভাবের মেয়ে, প্রাচীন দিনের ব্রাহ্ম মেয়ের মত একটা নৈতিক শুচিতা

মেনে চলে, হিমাদ্রির ধনী আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে, সমাজ সংসারে চোখে সে আদর্শ মেয়ে, বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, হিমাদ্রির ওপর সতর্ক দৃষ্টি।

হিমাদ্রি অবসন্ন হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে—'পুষ্পদি তুমি ত বকুলের বন্ধু, অথচ তুমিও চাও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে—'

—'বন্ধুই ত, বন্ধু বলেই ত চাই, শত্রু হলে চাইতাম না। এ বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর।'

হিমাদ্রির সহসা মনে হয় বিভিন্ন জগতের এই দু'টি প্রাণী কেমন সহজে শুধু সখ্যতার বাঁধনে একত্রে মিশে গেছে, অথচ সে আর ব্যোমকেশ এত অন্তরঙ্গ হয়েও আজো তাদের যোগাযোগ নিবিড় হল না, বন্ধুত্বের সূত্র বিনি সুতোয় গাঁথা—

পুষ্পময়ীর মত বকুলরাণীও ব্যাপারটি বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিল। ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রি উভয়ের ঘনিষ্ঠতার ভিতর একটা ফাঁক রয়েছে, সেই সর্বনাশা ফাঁক যেদিন আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে উঠবে সেইদিনই বাধবে সংঘর্ষ। উভয়েই বন্ধুত্ব নিবিড় করার জন্য সচেষ্ট অথচ অসংখ্য বাধা ছড়িয়ে আছে বন্ধুত্বের পথে। বকুলরাণী ব্যোমকেশকে বাঁচাতে চায়, তাকে তার চরম সর্বনাশের হাত থেকে। এই লোকটিকে সে ভালবাসে, তার ওপর ওর অধিকার আছে, ওর অদৃষ্ট ব্যোমকেশের সঙ্গে বিজড়িত। হিমাদ্রির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেই ব্যোমকেশ একদিন অনেক ওপরে উঠতে পারবে। সুতরাং হিমাদ্রির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া প্রয়োজন।

বকুল প্রায়ই বলে, সময় ও সুযোগ পেলেই বলে, ব্যোমকেশকে নানাবিধ পরিকল্পনার কথা বলে, নূতন নূতন কল্পনার খোরাক দেয়, কখনও বা বলে—

—'একটা চাকরি করবে, আমি ত দত্তদের বাড়ি পড়াই, ওদের 'দত্ত

ইন্‌ডাস্ট্রিজে' অনেক লোক কাজ করে, তোমার মত লোক পেলে এখনই নেয়—'

—'ফ্যাক্টরিতে? বা, এই ত চাই, এই ত আমার স্বপ্ন!' ব্যোমকেশ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসভরেই বলে।

—'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

—'আমি আর তুমি বকুল,—একই জায়গায় কাজ করতে চাই, কোনো জায়গায় দু'জনে একত্র মাস্টারি নিলে কেমন হয়?'

—'মাস্টারি করবে তুমি? শান্তশিষ্ট নিরীহ মাস্টারের মতই লোক তুমি! তার চেয়ে এই কারখানাতেই এসো, ওসব হিমাদ্রি টিমাদ্রি ছেড়ে দাও, ওর দ্বারা তোমার এতটুকু মঙ্গল হবে না, পদে পদে ঐ তোমার বাধা।'

ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করে ওঠে, বলে—'না না, হিমু সে-রকম লোক নয়—ওর মনটা খুব নরম, তুমি জানো না বকুল—'

হতাশাভবে বকুল বলে—'জানি বলেই ত বলছি, যাক্ একটু সাবধানে অন্ততঃ থেকো।'

—'ও আমার কি করতে পারে? ওকে আমি গিলে খেতে পারি! যে কোন মুহূর্তে টিপে মারতে পারি। কিন্তু ও সত্যই ত তেমন খারাপ নয়।'

—'না-না, ওঁর সঙ্গ ছাড়ো, নিজের কাজ নিয়ে থাকলেই ত হয়!'

ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করে বাড়ি ফেরে. বকুলের সুপারিশে প্রাপ্ত চাকরি গ্রহণ করতে রাজী হয়—বলে, 'কাল সকালেই আমি যাচ্ছি চাকরির চেষ্টায়—'

তারপর দিনে কিন্তু ব্যোমকেশের হয়ত কোন কথা স্মরণ থাকে না, নয় ত ভাবে দরকার নেই অমন চাকরির, কম মাইনে, কিংবা অত্যাচারী

মালিক ইত্যাদি অজুহাত দেয়, বলে—'কি করে শ্রমিকরা মালিকদের এই অত্যাচার মেনে চলে কে জানে ?'

বকুলরাণীর মনে তাই ব্যোমকেশের জন্য অসীম অশান্তি। বকুল বোঝে ব্যোমকেশ নিশ্চয়ই হিমাদ্রিকে এই চাকরির কথা বলেছে, আর হিমাদ্রি মুখ-নিসৃত এই সব বাণীই ব্যোমকেশ কৈফিয়ৎ হিসাবে উদ্‌গার করে যায়।

হিমাদ্রিকে এতটুকু ভালো লাগে না বকুলের, পুষ্পময়ীর বাড়ির সরু গলি পথটায় মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা হয়, হিমাদ্রি মাঝে মাঝে বকুলের হাতটা চেপে ধরে, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিল, নীরবে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বিনিময়ে বকুল একটি চড় বসিয়ে দিয়েছিল হিমাদ্রির গালে। সেই থেকেই হিমাদ্রির আতিশয্য একটু কমেছে।

এর পর থেকেই বকুল সচেষ্ট হয়ে উঠেছে উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি কবার জন্য, বুঝেছে এইভাবে চললে সর্বনাশ অনিবার্য। তার বিশ্বাস আছে পুষ্পময়ীর সাহায্য মিলবে এই ব্যাপারে, পুষ্পময়ীও বিচ্ছেদ কামনা করেন, তবে তার কারণ ভিন্ন। ওদের এই ঘনিষ্ঠতার মূলে আর যাই থাকুক অন্ততঃ বন্ধুত্ব যে নেই, তা বকুলরাণী বা পুষ্পময়ী দু'জনেরই অজানা নেই।

পুষ্পময়ীর ওপর আরো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়েছে বকুলের। একদিন তিনি স্বয়ং ওদের বাসায় গিয়ে ব্যোমকেশকে একটি চাকরির সন্ধান দিয়ে এসেছেন। যে মুহূর্তে শুনেছেন একটা ভালো চাকরি খালি হয়েছে, যা ব্যোমকেশের গুণপনাব আয়ত্তাধীন, তখনই তিনি রিকসায় চেপে ব্যোমকেশদের বাসায় সন্ধ্যার পর ছুটে গেছেন—

গিন্নিমা বেরিয়ে এসে বললেন—'তারা ত কেউ নেই মা। সেই ছটাব সময় বেরিয়ে গেছে, এখনই হয়ত ফিরবে, একটু বসো না মা, ভেতরে এস—'

পুষ্পময়ী বসে গল্প করছেন, এমন সময় বকুলরাণী এসে উপস্থিত। পুষ্পময়ী হেসে বললেন—'কেন যে এসেছ বুঝেছি।'

উভয়েই হাসল, বকুল বলল—'বেরিয়ে গেছে ত, দু'জনেই বাড়ি নেই ?'

গিন্নীমা গম্ভীর গলায় বললেন—'জানোই ত মা ওদের রকম-সকম, তোমরা বরং বসো, আমি না হয় একটু চা করে আনি চট করে—'

গিন্নীমার অনুপস্থিতির সুযোগে বকুল একটু উত্তেজিত হয়েই বলে—'মিছিমিছি বসে থেকে লাভ নেই, ওরা আমাদের কথা কানে নেবে না—'

পুষ্পময়ী বললেন, 'আমি কি ভাবি জানো, একটা কাজকর্ম করলে একটু হয়ত সামলাতে পারে, এ যে দিনরাত হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ানো।'

—'আমিও ত তাই ভাবি।'

—'অন্ততঃ একজনও যদি একটু সামলে ওঠে—'

—'তাহলেও বাঁচে, দু'জনেই বাঁচে, ওদের মধ্যে এতটুকু ভালোবাসা নেই—।'

—'আর ভালোবাসা থাকলেই বা কি, প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকলেও এই উচ্ছৃঙ্খলতা আমার উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকত, আর ঐ যে মাঝে মাঝে সব বলে—'

—'কি বলে, কিসের কথা — !'

পুষ্পময়ী গলার স্বর খাটো করে বলে—'এই যে বসে বসে দিনরাত রেভলিউশন, বিপ্লব, দলবল ইত্যাদি—'

বকুলরাণী তাচ্ছিল্যভরে বলে ওঠে—'বিপ্লব না ছাই, ওসব কিছুই হবে না তুমি দেখো, ওটা ওদের একটা বিলাস—'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর পুষ্পময়ী উঠে দাঁড়ায়, বলে—'আমি আর বসতে পারছি না, আজ যাই ভাই—তুমি বরং একটু থেকে যাও—'

বকুল বলে—'আমি থাকবো, কিন্তু তাতে কিছু ফল হবে?'

—'হ্যাঁ, তুমি একাই থাকো, দু'জনের কথা ওরা শুনবে না। একত্রে দু'জনকে দেখলে ওরা শুধু হৈ হৈ করবে—তুমিই একটু বরং থাকো আজ।'

বকুল চুপ করে বসে রইল। কখন ওরা ফিরবে তার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে আর গিন্নীমার বিরামবিহীন খোশগল্প শোনে—যে উদ্দেশ্যে বকুল এখানে এসেছিল, সে মহৎ উদ্দেশ্য এখন অন্তর্হিত হয়ে তার জায়গায় মনের ভিতর উত্তাপ সঞ্চিত হতে লাগল, সে রাগ চাপা যায় না, ব্যোমকেশের জন্য চাকরির কথাও আর ভাবে না।

বৃদ্ধা বকে চলে, তারপর রাত এগারোটার পর তিনিও উঠে পড়লেন, আসন পেতে দু'জনের খাবার বেড়ে রাখলেন—তাঁর ভঙ্গিতে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বকুল উঠে দাঁড়াল, তার রাগ ধরা পড়েছে গিন্নীমার চোখে, তিনি একটু করুণার ভঙ্গিতেই বললেন, 'শোনো মা, ওদের ওপর রাগ করতে নেই, হাজার হোক ওদের বয়সটা ত অল্প।'

অনেক পরে পথে রিকসার ঘণ্টা শোনা গেল, বকুলরাণী দেউড়ির মুখে এসে দাঁড়াল—হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশের নিরীহ শান্ত ভঙ্গিটুকু দেখে বকুলরাণীর মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠল।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই গিন্নীমা ফিস্ ফিস্ করে বললেন—'জানো মা কি হয়েছে।—ওই হিমাদ্রি—'

—'কি করেছে? কি হয়েছে বলে ফেলুন না—'

—'কাল অনেক টাকা নাকি পেয়েছে, দু'চার হাজার—!'

—'কোথায়? কে বলল আপনাকে!'

—'ওরাই বলাবলি করছিল, তাই শুনলাম কিনা—'

বকুল হেসে বলল—'তাতে আর কি···আপনিও পাননি বা আমিও পাইনি; যার কপাল ভালো, সে পেয়েছে।'

গিন্নীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'পোড়াকপাল মা—আমাদের পাথর-চাপা কপাল।'

পরদিন প্রভাতে খবরটা আর চাপা রইলনা, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হতে লাগল। যেন খড়ের আগুন। কেউ বলল চার-পাঁচশো টাকা মেরেছে, কেউ বলল হাজার-দু হাজার হবে, অনেক টাকা। লোকটা কে? ওই হিমুবাবু। ঐ যে ওধারে থাকে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায়। চা-খানা থেকে বিড়ির দোকান—সর্বত্র এই আলোচনা। সকলেই ভাবছে, আহা টাকাটা আমিও ত' পেতে পারতাম, শুধু—তকদির।

হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে বলছিল—'সব চেয়ে ভালো একেবারে চুপচাপ থাকা, কি দরকার আমাদের বোকার মত কথাটা চাউর করে বেড়িয়ে।'

ব্যোমকেশ সমস্ত মুখটায় সাবানের ফেনা মেখে অযত্নবর্ধিত দাড়ি সযত্নে কামাচ্ছিল, হিমাদ্রির দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর অট্টহাস্য করে ক্ষুরটা মুড়ে রেখে হিমাদ্রির কাছে দৌড়ে এসে বন্ধুজনোচিত ভঙ্গিতে কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেয়, যেন পোষা মেনি বেড়ালকে আদর করছে।

হিমাদ্রি আবার বলে—'না না, এই সবচেয়ে ভাল হবে, বুঝলি?'

কিন্তু দুজনে পথে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ঘিরে চারপাশে গুঞ্জন চলল, ওদের গায়ে যেন এই গুপ্ত সংবাদ লেখা আছে। ওরা অবশ্য নিঃশব্দে চলছিল, একটু অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, ঠিক ওদের সাধারণ

পথ চলার ভঙ্গি নয়। হয়ত আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি-জনিত আনন্দাতিশয্যই এই নীরবতার কারণ।

আজকের এই প্রভাত কি বিচিত্র। পৃথিবী কি মনোরম। নূতন দৃষ্টিকোণে সবই সহসা যেন পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে।

ওরা বেশ আনন্দভরেই চলেছে, আশপাশের লোক বলছে—ওই বেঁটে লোকটাই হিমুবাবু, আর পাশের লোকটা কুলীর সর্দার ব্যোমকেশ!

ব্যোমকেশের কানে টুকরো কথা ভেসে আসে, ব্যোমকেশ চাপা গলায় চটুল হয়ে বলে ওঠে—'এই হিমু, পথচলা দায়।'

হিমাদ্রি ওর পানে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। ব্যোমকেশ কিন্তু এই ভঙ্গিমায় হেসে ফেটে পড়ে, কি হাসি, হাসির বেগ আর থামতে চায় না, শেষ কালে হিমাদ্রিকে সস্নেহ ভঙ্গিতে ধরে, নিজেকে সামলে নিয়ে, ব্যোমকেশ মমতা মাখানো কণ্ঠে বলে—'হিমু, তোকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে আজ। কেমন ভালো লাগছে না?'

আবার উভয়ে পথ চলতে শুরু করে। মোড়ের মাথার বিড়ির দোকানের ছোকরারা ছোট্ট কুলোয় শুখো আর পাতা নিয়ে বিড়ি বাঁধছিল, তারাও কাজ থামিয়ে ভাগ্যবান পুরুষটির দিকে আঙুল দেখায়—ঐ, ঐ যে—।

হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশ মার্জিত হয়ে উঠেছে, দুজনেই বেশ পরিচ্ছন্ন পোশাক পরেছে, খদ্দরের এবং হাতে কাচা, ইস্ত্রী করা নেই, হিমাদ্রি আবার আজ কাঁধে একটা চাদর নিয়েছে, মাঝে মাঝে চাদর নিয়েই বেরোয়। ব্যোমকেশ বরাবরই একই রঙের খদ্দরের জামা পরে, মেটে গেরুয়া রঙের জামা ওর পছন্দ, আর মাথায় গান্ধীটুপি, এটা নিয়মিতই পরে। হিমাদ্রির চকচকে নিউকাট এলবার্ট পায়ে, ব্যোমকেশের পায়ে মোটা কাবুলী স্যাণ্ডেল, আঙুল বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। তলায় লোহার নাল বসিয়ে নিয়েছে কিনা কে জানে, মাঝে মাঝে বেশ

আওয়াজ হয়। যারা ওদের দিক লক্ষ্য রাখে তারা পায়ের আওয়াজ চেনে।

ব্যোমকেশ হেসে চলেছে, হাসি আর থামেনা তার, উভয়ে বড় রাস্তায় পড়ল, তারপর বড়-রাস্তা পার হয়ে একটা সংকীর্ণ গলিপথে ঢুকল, পথটি নির্জন, ব্যোমকেশের হাসি তাই কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে ওঠে, সহসা থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ বলে ওঠে—'এই টাকাগুলো বার করনা মাইরি, আর একবার দেখি—'

চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে হিমাদ্রি সহসা বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়, তারপর খানিকটা ওঠায়, নোটের তাড়াগুলির প্রান্তদেশ ব্যোমকেশের চোখে পড়ে। হিমাদ্রি কিন্তু তাড়াতাড়ি নোটগুলি পকেটেই ঢুকিয়ে রাখে, তার ওপর ময়লা রুমালটা ভালো করে চাপায়।

ব্যোমকেশ ফুল্লকণ্ঠে বলে—'সত্যি ভাই, রাজার ঐশ্বর্য তোর হাতে এসেছে!'

হিমাদ্রি মাথা নাড়ে, তার সরু, পাতলা ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে কিন্তু কথা বেরোয় না।

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বাসভরে বলে—'এখন আমরা দাঁড়িয়ে যাব, আমরা দুজনে এবার নতুন দল গড়ে তুলব।'

হিমাদ্রি কোন কথা বলেনা, এমন কি মাথাটিও নাড়েনা, তার চোখের দৃষ্টি এখন গভীর, সামনের দিকে নিরর্থক তাকিয়ে আছে, যেন কোন কথাই কানে আসেনি। আসলে ব্যোমকেশের মন্তব্যে ও চটে গেছে, অনর্গল এই ধরণের অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বিরক্তিকর, তারপর বারবার টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন হিমাদ্রিকে বিরক্ত করে তুলেছে। ক্রোধ তার চিন্তাশক্তিকেও আচ্ছন্ন করে তুলেছে, তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ব্যোমকেশ সম্পর্কে একটা আবছা আশঙ্কা। জিনিসটা অথচ এমনই, যে ক্রোধ বা ভয় দুটিরই মাত্রা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তবু রক্তের

ভিতর বিষের মত প্রতিক্রিয়া শুরু করে, আর পুনরায় ব্যোমকেশের কণ্ঠে বিযোদ্গারই শুরু হয়।

ব্যোমকেশ বোকার মত বলছিল—এই যে টাকাটা পেলাম—

হিমাদ্রি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল···একটুও কি চুপ করে থাকতে পারিস না, যেন দম দেওয়া গ্রামোফোন।

ব্যোমকেশ হেসেই বলে—কেন ‿য় কিসের ?

হিমাদ্রি রাগে কাঁপছিল; ব্যোমকেশের উচ্ছ্বাস থামিয়ে সে বলে ওঠে—টাকা টাকা করে চেঁচাচ্ছিস, টাকা ত' তোর কি ? তোমার এতে কোন অংশই নেই—

ব্যোমকেশ ওর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। এই মন্তব্যটুকু প্রচণ্ড আঘাতের মত ওর মুখে এসে পড়ল। মনে কিন্তু কলুষের ছাপ পড়ার পূর্বেই ব্যোমকেশ এই আঘাত মুছে ফেলার চেষ্টা করে। শান্তকণ্ঠে বলে—হ্যাঁ টাকাটা তোমারই, কিন্তু সব কিছুই ত' আমরা বরাবর ভাগ করে নিই। যেমন সেবার টালিগঞ্জের মাঠে জিতে দুজনে ভাগ করে নিয়েছিলাম, মনে নেই,—সেই কথাই বলছি আর কি!

—কিছু লেখাপড়া আছে নাকি!—ওসব ভুলে যাও।

ব্যোমকেশ তবু বলে—বরাবরই ত কথা আছে আধাআধি ভাগ হবে, যে যা পাই সেইভাবেই ত নিই।—ব্যোমকেশ চটে নি, তবে সে অবাক হয়েছে, মনে মনে একটু আহতও হয়েছে।

হিমাদ্রি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলে—এবারকার ব্যাপার আলাদা। এর সঙ্গে অন্য কিছু জড়ানো চলে না।

এই কথায় ব্যোমকেশ আরো বিস্মিত হয়, হিমাদ্রির পরিবর্তন হয়েছে, তার ধারণা হয়েছে যে সে নিজের চেষ্টায় ও ভাগ্যের জোরে যা পেয়েছে তাতে আর কারো অধিকার নেই, অংশ নেই।

কিন্তু—। ব্যোমকেশ কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়।

হিমাদ্রি কথার ভিতরেই বলে ওঠে, গতরাত্রে তুমি আমার সঙ্গে কার্নিভালে যাওনি, গিছলে? আমি তবু ডেকেছিলাম! তুমি হংকং-এ ছুট্‌লে, আর পিছু ফিরে একবার তাকালেও না।

ব্যোমকেশ শান্ত গলায় বলে—না ভাই তর্কের প্রয়োজন নেই টাকা তোমারই, তোমার কাছেই থাক, আমি কি চেয়েছি—

হিমাদ্রি চুপ করে থাকে, রাস্তার দিকে বিমর্ষ বদনে তাকিয়ে থাকে।

একটু পরে ব্যোমকেশ বলে—না ভাই, জুতোটায় পেরেক উঠেছে বড় ফুটছে, তুই যা আমি আর চলতে পারছি না, দেখি কাছাকাছি একটা মুচি পাই কিনা।

সকালটা সহসা যেন ওদের কাছে মেঘমলিন হয়ে উঠল। ব্যোমকেশের অন্তরের সমস্ত উচ্ছ্বাসের উৎস স্রোত নিঃশেষিত হয়ে গেছে, সমস্ত আনন্দ মৃত। কেমন একটা নিদারুণ শূন্যতা বুকটা চেপে ধরেছে। এই বিষাদঘেরা মুহূর্তটি ওর সমগ্র চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে তুলল।—হিমাদ্রি পাশ কাটালো, ব্যোমকেশের বিশ্রী লাগছে। কোনদিন যার চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না, সে আজ লজ্জা ও অপমানে অভিভূত হয়ে পড়ল। ব্যোমকেশ সোজা হয়ে দাঁড়াল, বুকটা টান করে দীর্ঘদেহ ব্যোমকেশ একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে তারপর পিছন ফিরল—মুচির সন্ধানেই বোধ হয়।

হিমাদ্রি ওকে লক্ষ্য করছিল। তারও মনটা খারাপ হয়েছে, ব্যোমকেশকে এমন আচ্ছন্নের মত চলে যেতে দেখে ওর নিজেকেই অত্যন্ত নীচ মনে হল, সত্যই ওর আচরণটা একটু ঘৃণ্য হয়েছে। ওর এত টাকা অথচ ব্যোমকেশের কাছে গোটা চার পাঁচেক খুচরো টাকা ভিন্ন কিছুই নেই। আর ভাগ্যের এই বিরাট বৈপরীত্যই সে কথা স্পষ্ট করে ওকে বুঝিয়ে দিল। কাজটা নিষ্ঠুর হয়েছে। হিমাদ্রি ঘটনাটি

মানিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠে—এই ব্যোমকেশ, শোন শোন, আচ্ছা মাথামোটার পাল্লায় পড়েছি বাবা!

ব্যোমকেশের পিছনে ছোটে হিমাদ্রি। ওর মনে অনুশোচনা জেগেছে। হিমাদ্রির সহসা মনে হল জুতোর কাঁটা ওঠার অছিলা নিয়ে অভিমানভরে যে বিরাট পুরুষটি হন্‌হন্‌ করে চলেছে, আসলে সে একটি বয়স্ক শিশু। সত্যি ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ওর প্রতি মমতা জাগে।

একটু পা চালিয়ে চলে হিমাদ্রি আবার চেঁচায়—এই ব্যোমকেশ, শোন্‌না, দাঁড়া একটু—।

ব্যোমকেশ কিন্তু সোজা বাসায় ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে, পিছন পিছন হিমাদ্রিও সেই ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে।

ব্যোমকেশ তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে তাকায়, রাগে, অভিমানে তার রৌদ্ররাঙা মুখখানি ফুলে উঠেছে। মুখে কথা আসছে না, ঠোঁট কাঁপছে, হিমাদ্রির কাঁধে হাত রেখে একটু দম নিয়ে কষ্ট করেই বলে ব্যোমকেশ—কি এমন পেয়েছিস তুই, হয়ত দুচার হাজার! কিন্তু সত্যই ত রাজার ঐশ্বর্য নয়।—রেখে দে তোর টাকা তোর কাছে, পোস্টাফিসে বা ব্যাঙ্কে রেখে সুদ জমিয়ে ক্যাপিটালিস্ট বনে যা, তেলের বা সাবানের কারখানা কর, আমি চিরদিন ব্যোমকেশই থাকব।

জামা-জুতা ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ব্যোমকেশ সযত্নে জুতার কণ্টকজর্জরিত পা খানি তুলে নিয়ে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সজোরে নিঃশ্বাস নেয়, আওয়াজটা দীর্ঘশ্বাসের মতই শোনায়।

হিমাদ্রি শুধু বলল—অভিমান করিস নি, উঠে পড়।

জানালার পাশে অশান্ত হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে, ব্যোমকেশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখে অবশেষে হেসে উঠল, শ্লেষমিশ্রিত হাসি।

বিছানায় বিরাট শরীরটা নিয়ে আড়মোড়া খেয়ে সহসা ব্যোমকেশ বলে ওঠে—তাহলে এবার পুরাপুরি ক্যাপিটালিস্ট হয়ে উঠলি—!

হিমাদ্রি মিনমিন করে বলে—তোর পায়ে পড়ি বাবা, একটু থাম।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে ব্যোমকেশ বলে—কেন তুই কি তাহসে ক্যাপিটালিস্ট নোস্?—

বিছানায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ টান হয়ে শোয় ব্যোমকেশ, বলে—কিবে চুপ কবে রইলি যে?

এত শ্লেষ ও বিদ্রূপ কিন্তু বৃথা গেল। কয়েক মুহূর্ত ঘরটি নিস্তব্ধ, কারো মুখে কথা নেই, অবশেষে হিমাদ্রির দিকে পাশ ফিরে বলল ব্যোমকেশ—যদি কিছু মনে না করিস ত' বলি সত্যি টাকাটা নিয়ে কি করবি তাহলে?

ব্যোমকেশের চোখে আর শ্লেষ নেই, এবার তার কণ্ঠে আন্তরিকতা সুর, কিন্তু কোন উত্তর নেই। হিমাদ্রি ব্যোমকেশেব দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে পড়ল। ওর মনে কি একটা কথা জমেছে, কিন্তু ব্যোমকেশ তা বুঝতে পারছে না।

হিমাদ্রি চাদরটা হাতে নিয়ে একটু নাড়ল, জুতাব বগলসটা টান করে আঁটলো। একবার কাসল। হিমাদ্রি ওর পরিকল্পনার কথাই ভাবছিল, ব্যোমকেশ সেকথা শুনলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবে—এতদিন তার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নি, হয়ত ভগবান যা করেছেন মঙ্গলের জন্যই, এই পবিকল্পনা সম্পর্কে তাই তার উৎসাহের অন্ত নেই। তবু একটু সাবধান হ'তে চায়, যদি ওর মতলব অবশেষে ভেস্তে যায়।

ওর দিকে তাকিয়ে ব্যোমকেশ পুনরাবৃত্তি করে যদি কিছু তোর বলতে না আপত্তি থাকে—।

হিমাদ্রির মুখ থেকে ও দৃষ্টি আর নামায় না, সোজা তাকিয়ে আছে, যে ভাবে হিমাদ্রি চাদরটা ভাঁজ করছে আর জুতার বগলস আঁটছে তা

দেখে ব্যোমকেশের মাথায় বিভিন্ন চিন্তার স্রোত বয়ে গেল। সহসা সে বিছানায় উঠে বসল। তারপর বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলল—তুই কি,—মানে কোনো মতলব ছিল তোর? কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই সকালে বেরিয়েছিলি হিমু?

হিমাদ্রি এইবার জবাব দেয়—নিশ্চয়ই, নইলে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরার আর উদ্দেশ্য কি বল!

ব্যোমকেশ হিমাদ্রির পাশে এসে দাঁড়ায়, তার ধীর বুদ্ধিতে আগুন ধরে। মৃদু গলায় সে প্রশ্ন করে—কোথায় যাবি ভেবেছিলি?

হিমাদ্রি এবার গম্ভীর হয়ে বলল—ভেবেছিলাম অ্যালেনবেরীতে গিয়ে একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি দেখে আসব। সেই জন্যই এত সাজ-সজ্জা।

—ও অ্যালেনবেরী, তা ওদের গাড়িগুলো ত' রিকণ্ডিসন্ড্!

—হ্যাঁ, দেড় হাজারের হয়ত একটা পাওয়া যাবে, ওদের ম্যানেজার মিলটন সাহেবের সঙ্গে অনেক আগে আমার একবার কথা হয়েছিল।

ব্যোমকেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উত্তেজনায় প্রায় জিভ বেরিয়ে আসে। বড় বড় থাবার মত হাত দিয়ে হিমাদ্রির পিঠে চাপড় মেরে বলে—হিমু ঠিকই ভেবেছিস, একটা গাড়ির দরকার।

হিমাদ্রি মৃদু গলায় বলে—বরাবরই ত' আমি বলেছি গাড়ি একটা চাই-ই।

ব্যোমকেশ হিমাদ্রির পিঠে চাপড় মেরে বলে—সত্যি হিমু, তোর মাথা আছে, আঁইডিয়া আছে—বেশি কথা তুই বলিস না বটে, কিন্তু যে ভাবে আইডিয়াগুলোকে পূর্ণ করিস তা সত্যই অপূর্ব।

হিমাদ্রি বলে যদি যেতে চাস ত' এখনও যাওয়া চলে, যাবি?

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বিছানার ধারে গিয়ে, জুতা পরতে বসে, তারপর বলে—আশ্চর্য, কোনদিন কিন্তু আমাকে জানতে দিসনি। আমি

স্বপ্নেও ভাবিনি কিন্তু। এখন কিন্তু বেশ বুঝছি। ভেবেছিলাম এমনই বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছি—গাড়ির কথাটা আমার মাথায় আসেনি।

হঠাৎ পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে হিমাদ্রি অসতর্কভাবেই বলে—পকেটে এই নিয়েও কি ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরব?

ব্যোমকেশ গম্ভীর হয়ে বলে—তা বটে, সব বদলে গেল হঠাৎ।

হিমাদ্রি বললে—এই জন্যই ত' কিছু বলিনি এতক্ষণ, চুপচাপ ছিলাম।

ব্যোমকেশ একমত, বলে—ঠিক বলেছিস, এই হল আমাদের নতুন রাজ্যে প্রবেশের পাসপোর্ট—

ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রি পুনরায় বেরিয়ে পড়ল। এবার ভিন্ন পথ ধরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উভয়ে চলল, তবু অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হল, যারা ইতিমধ্যেই এই আকস্মিক ভাগ্যোদয়ের কথা শুনেছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে উভয়ে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে হাজরা রোডে অ্যালেনবেরীর গ্যারাজে ছুটল। এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগল গাড়ি পছন্দ করতে, হাতে টাকা নিয়ে রেডি, মিলটন সাহেব ওদের কথাবার্তাতেই অবস্থাটা অনুমান করে নিয়েছিলেন, তাই যতটা সম্ভব দাঁও কষতে লাগলেন।

যখন বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল হিমাদ্রিকে পুরোপুরি আঠারশো দিতে হল। গাড়িটা টু-সিটার টুরিং মডেলের মরিস গাড়ি, অন্ততঃ চার বছরের পুরাতন, তবে এঞ্জিন আর টায়ার টিউব ঠিক আছে। আলো, প্লাগ, ব্যাটারি ইত্যাদি সবই মেরামত করা আছে, বয়স হলেও এখনও বেশ কিছুদিন কাজ চালিয়ে নেবে। হিমাদ্রি পাকা মিস্ত্রীর মত সব দেখে নিয়েছে আর ব্যোমকেশ শিশুর মত ইলেকট্রোপ্লেট করা চকচকে অংশগুলিতে হাত বুলিয়ে শুধু হেসেছে।

হিমাদ্রি বলল—ভালোই হবে, কি বলিস ?

মিলটন সাহেব বাংলা বোঝেন, একটু আধটু কষ্ট করে বলতেও পারেন, বললেন—ভালো কি মিস্টার, It's a little bargain—ইঞ্জিনটা দেখেছেন ?

হিমাদ্রি সাহেবের কথা বিশ্বাস করে। মিলটন সাহেবের খ্যাতি আছে। টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে, ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেই কাগজ-পত্র ঠিক করে যথারীতি গাড়ি ডেলিভারি নেওয়া হল।

স্কুল পালানে অবাধ্য দস্যি ছেলের মত ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রির জীবনের এই নতুন পর্ব শুরু হল। রাজপথের ধূলিকণার মতো নগণ্য এই দুটি অকর্মণ্য বেকার যুবকের ওপর অনেকেরই নজর। পথে ঘাটে, ফুটপাথে, সিনেমার দরজায়, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, এসপ্লানেডের ট্রামের গুমটিতে, চৌরঙ্গীর আশপাশের সস্তা চায়ের দোকানে, মিউনিসিপাল মার্কেটে, ময়দানে মনুমেন্টের তলায় বক্তৃতা দিতে অনেকেই দেখে, আর দেখা যায় ব্যারাকপুর, টালিগঞ্জ ও খিদিরপুরের রেসের মাঠে। ওদের মত লোকের কাছে এই বিরাট শহরের নাগরিক জীবন একটি বিরামবিহীন বিরাট নাটকের মত, কখনো যবনিকা পড়েনা আলো কখন ম্লান হয় না, হাজার হাজার অঙ্ক আর দৃশ্যে অপূর্ব কলরবের ভিতর দিনের পর দিন অসংখ্য পাত্র-পাত্রী অভিনয় করে চলছে, মূল কাহিনীকে সকলেই নতুন কথায়, নূতন ঘটনায় সমৃদ্ধ করে তুলছে।

প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত সমস্যা ও বিপত্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় ওরা এইভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত।

ক্লান্তস্বরে ব্যোমকেশ হয়ত বলত—এই হিমু চল, এবার ফেরা যাক, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

হিমাদ্রি বলত—চলো, গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক, দুটো "হ্যাকার-ব্রো" কেনার মত পয়সা আছে, 'চাবি'র দাম হবেনা।

চাবি-মার্কা বেক্স্ বীয়রের চাইতে 'হ্যাকার-ব্রো' দামে সস্তা, তাই দুজনের পকেট মন্থন করে বীয়রের দাম সংগৃহীত হয়, যেদিন তা হয় না সেদিন 'কেবিনে' ঢুকে চায়ের কাপেই সন্তুষ্ট হ'তে হয়। পয়সা সংগ্রহের জন্য নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, পাঁচটাকা ফর্মা হিসাবে স্কুলপাঠ্য মানের বই লেখা, প্রুফ দেখার বিনিময়ে মাঝে মাঝে যখন কিছু টাকা পাওয়া যেত, ওদের দিনযাপনের গ্লানি তখন সাময়িক ভাবে গরিমামণ্ডিত হয়ে উঠত। বেশী টাকা পেলে রেসের মাঠে ভাগ্য পরীক্ষাও চলে।

অবসর সময়ে ডকের প্রান্ত, সস্তার সিনেমা, আর 'পাবলিক মিটিং' চিত্ত-বিনোদনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। পার্কে, সভামঞ্চে, বৃদ্ধ বা খ্রীষ্টমন্য বক্তাদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে নামাও একটা কাজ, আবার পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথচলতি লোকের কলহ, ট্রামে বাসে বা লরিতে ধাক্কা লাগলে, বা ট্রাম আউট-লাইন হলে এগিয়ে যাওয়া, কিংবা কুকুর চাপা পড়লেও 'আহা' 'উহু' করা ওদের কর্তব্যের অঙ্গ। উভয়ে যখন একত্র থাকতো না, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথে বেরোত, তখন ওদের মিলন ক্ষেত্র এস্‌প্লানেডের ট্রামের গুমটি ; এইখানকার অসংখ্য সংবাদ ও সাময়িক-পত্র শোভিত স্টলটিতেও বিনামূল্যে জ্ঞান আহরণ করা চলে, কোথায় কি প্রকাশিত হল, কে কি বলছেন জানার এমন সুবিধা আর নেই। ওদের এই সব অতি পরিচিত ও প্রিয়তম বিচরণ ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে যারা ঘোরাফেরা করেন, তাঁরা সকলেই এই মানিকজোড়দের জানেন, নাম না জানলেও মুখ চেনেন ও অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলেন এমন লোকের সংখ্যা

কম নয়। কিন্তু গাড়ি কেনার পর অকস্মাৎ অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সব জনগণ ওদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কোনদিন প্রকৃত অভাব অনুভব করে নি। অনেকের মনেই এইবার প্রশ্ন জাগল—কে ওরা, কোথায় থাকত! কোথায় বা গেল?

ওরা ছোট্টগাড়ি খানি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, হিমাদ্রি স্টিয়ারিং ধরে বসে, আর ব্যোমকেশ পাশে বসে গম্ভীর ভাবে মোটা বর্মা চুরুট টানে, পা-টা সামনের দিকে তুলে দিতে পারলেই তার আরাম হয়—কিন্তু দেখায় খারাপ, হিমাদ্রি চটবে, গাড়ি চড়ে নতুন একটা উৎপাত হয়েছে, হঠাৎ 'প্রেস্টিজ' আর 'ডিগ্‌নিটি' কথা দুটির ওপর হিমাদ্রি বিশেষ জোর দিয়েছে। ব্যোমকেশ একটা গান্ধীটুপি ব্যবহার করছে আজকাল, হিমাদ্রিও কিনেছে, তবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে খুলে পকেটে রাখে।

মাথার টুপিটা বেঁকিয়ে বসিয়ে ব্যোমকেশ বলে—আশ্চর্য হিমু, কি করে যে তুই ঘোড়ার খবর পাস, আশ্চর্য তোর টিপ্‌স্।

হিমাদ্রি হেসে বলে—যে লোকটা ঘোড়ার খাবার দেয় তার সঙ্গে যে আলাপ জমিয়েছি, সে বেটা সব খবর রাখে—তারপর আবার বলে,—না বেশি বাজে বকা ঠিক নয়, আমি মুখ বন্ধ করলাম।

ব্যোমকেশ বলে, সেই ভালো, চুরুটে অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ করা হয়নি। চুরুট এতটুকু উপেক্ষা সহ্য করেনা, অনেক টানবার পরও ধোঁয়া বেরোলনা ব্যোমকেশ দেশলায়ের জন্য পকেট হাতড়ায়।

এত করেও সব খবরই প্রকাশ পায়, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীরা জানতে পারেন, কার্নিভালের টাকা, মোটর কেনা, এমন কি রেসের খবরটাও মুখে মুখে চলে বেড়ায়।

কার্নিভালের সেই রাত্রির পর এক সপ্তাহ কেটে গেল—উভয়ের মধ্যে কেউই কিন্তু বকুলরাণী বা পুষ্পময়ীর খোঁজ খবর নিতে পারেনি, হয়ত ওদের কথা ভাবেই নি। ওরা একটা নূতন, উত্তেজক ও সম্মোহক

জগতের দ্রুততালে জড়িয়ে পড়েছে—যার আকর্ষণ ও উন্মাদনা সহসা ম্লান হয় না, ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণাবঞ্চিত হয়ে জীবনের দুঃখরাত্রে হিমজর্জরিত গ্লানির কথা মনে পড়েনা—নূতন জীবনের মন্ত্র 'গতি' ও 'অর্থ'। লাভ-ক্ষতি টানাটানির হিসাবনিকাশেব এখন অবসর নেই।

বকুলরাণী ও ব্যোমকেশের মধ্যে কিছুকাল আর দেখাশোনা নেই, ইতিমধ্যে ব্যোমকেশের কাছ থেকে একখানি চিঠি অবশ্য এসেছিল, ছোট্ট চিঠি, একখানি ব্যবহৃত খামের অব্যবহৃত অংশে লিখিত :

"বকুল—

বৃহস্পতিবার ঐখানেই সন্ধ্যার পর থেকো, অনেক কথা আছে।

—তোমার 'ব্যো'।"

বকুলরাণী কিন্তু চিঠিখানি নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাযনি, জবাবও দেযনি, বা ব্যোমকেশের প্রতীক্ষায় নির্দিষ্টস্থানে বসে অপেক্ষা করেনি। বৃহস্পতিবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ক্রমে বৃষ্টিব বেগ বেড়ে ওঠে, কলকাতা শহরের পথঘাট সহজেই জলে বোঝাই হয়ে যায, আর ট্রাম বাসও সুযোগ বুঝে থেমে যায়। প্রতি পসলার সঙ্গেই মনে হতে লাগল এবার বুঝি বৃষ্টি থামবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামলনা—বেড়েই চলল। বকুলরাণী বাড়িতেই রইল, কোথাও আব যাওযা হল না।

শনিবার সন্ধ্যায় ট্যামার লেনের পার্টি অফিসে কিন্তু ব্যোমকেশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। ব্যোমকেশ এক পাশে বসে পার্টির প্রকাশিতব্য ম্যানিফেস্টোর প্রুফ দেখছিল, জায়গাটি কিন্তু এমনই অন্ধকাব সহসা কিছু নজরে পড়ার কথা নয়, চুরুটের তীব্র গন্ধে বকুলরাণীর খেয়াল হল।

বকুল পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'এত অন্ধকারে বুঝি প্রুফ দেখা যায়? না দেখলেই বোধ হয় কিঞ্চিৎ নির্ভুল হবে।'

ব্যোমকেশ উল্লাসভরে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে—তুমি যে। তোমার কথাইত ভাবছিলাম, দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই, বেস্পতিবার এলে না যে?'

ব্যোমকেশের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বকুল মৃদুস্বরে বলল—'কতটা বাকী? বাইরে এস, কথা আছে!'

ব্যোমকেশ বলল—'বাকী বেশি নেই, তা ছাড়া এটা ফার্স্ট প্রুফ, এই হয়ে এল,—তা আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

বকুল বলল—'বলছি ত'। বেরিয়ে এস কথা হবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত বকব।'

সামনের ছোট প্যাকিং-বক্সটি এগিয়ে দেয় ব্যোমকেশ, বসতে অনুরোধ করে। বকুল না বসে বলে, 'বসলে উঠতে দেরি হয়ে যাবে, তুমি বরং তাড়াতাড়ি সেরে নাও।'

ব্যোমকেশের প্রুফ বেশি ছিল না, তাড়াতাড়ি পাতাগুলি মিলিয়ে নিয়ে কপি ও প্রুফ একত্রে বেঁধে ব্যোমকেশ উঠতে উঠতে বলল—প্রকাশবাবু এখনও এলেন না, তাঁর হাতে দিয়ে গেলেই হত। যাক—ঐ বেহারাটাকে বলে যাব, ওই আমাদের ম্যানেজার।'

দীর্ঘদিন এইখানে কার্য করার ফলে বেহারী শিখেছে অনেক কিছু আর তার ওপর সকলের বিশ্বাসও আছে।

ট্যামার লেনের এই বাড়িটি বিচিত্র, এমন ধরনের কেল্লার মত বাড়ি যে কলকাতার বুকের ওপর আছে ভিতরে না প্রবেশ করলে অনুমান করা সম্ভব নয়। কত রকমের দোকান ও কারখানাই না এ-বাড়িতে আছে। গ্রামোফোনের বাক্স, সস্তার পাতা ও গুঁড়া চা, মেস ও নানারকম ছোটখাটো অফিস। অনেক হিসাব করেই এইখানে পার্টির জন্য ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাদের ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইখানেই বাসা বাঁধা হয়েছে, তারা কিন্তু সবই জানে এবং সকলের গতিবিধির সন্ধান রাখে।

সিঁড়ি ধরে নামবার সময় ব্যোমকেশ বলল—'কাজ কিছুই হচ্ছে না সবাই কেমন গা ঢেলে দিয়েছে। এ কদিন দেখছি সবাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছে। পার্টি অফিসে তাই ভীড় কম।

বকুল এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল—'তোমাদের দুই বন্ধুর খবর কি? অনেক কিছুই ত' শুনছি—'

ব্যোমকেশ এতটুকু বিরক্ত বা বিস্মিত না হয়ে বলল—'তাই নাকি! তোমাদের কানেও পৌঁছেচে? আমাদের একটা মোটর হয়েছে।'

—'আমরা? 'এডিটোরিয়াল উই' নাকি?'

—'আমরা মানে এক রকম আমরাই, আমি আর হিমাদ্রি—'

—'চুরি করেছ?'

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বেই উভয়ে হ্যারিসন রোডের ওপর এসে দাঁড়াল। সামনেই কেবিন, ব্যোমকেশ একরকম বকুলরাণীকে টানতে টানতেই কেবিনে ঢুকল। এই সময়টাতেও ভীড় কমেনি, অতি কষ্টে একটি খালি টেবিল সংগ্রহ করে উভয়ে বসল।

বয়কে অর্ডার দিয়ে ব্যোমকেশ সহসা বলে উঠল—'চুরি একথা মনে হল কেন? চুরি নয়, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি হিমাদ্রি নগদ টাকা গুণে দিয়েছে।'

বকুল কিছু বলল না, ইতিমধ্যে চা এসে গিছল, চামচ দিয়ে পেয়ালার তলদেশস্থ চিনি ঘাঁটতে লাগল—দৃষ্টি নীচের দিকেই, ব্যোমকেশের জবাব যেন শুনেও শুনল না,—অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু যে ওর অজানা নেই এই ভাব, আর সেই কারণেই যেন ওর পক্ষে তাচ্ছিল্যভরে নীরব থাকাটাই স্বাভাবিক।

ব্যোমকেশেরও ভ্রূ কুঞ্চিত হল, সহসা তার কেমন মনে হল হিমাদ্রির এই গাড়ি লাভ ব্যাপারটি হয়ত ঠিক সদুপায়ে সম্ভব হয়নি, স্বচক্ষে দামটা

দিতে দেখলেও মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগে। তবু সে পুনরায় বলে —'আমি স্বচক্ষে দাম দিতে দেখলুম।'

—'কার টাকা?' এবারও বকুল ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকায় না। যে প্রকৃত তথ্য থেকে এতদিন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সেই পরম সত্যের সঙ্গে যেন মুখোমুখি হয়ে গেল এখনই।

ব্যোমকেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল একটু শংকা জাগল মনে। বিশেষ করে একটি কথাই বাব বার তাকে পীড়ন করতে লাগল, হিমাদ্রি কতক-গুলি ঘটনা স্বেচ্ছায় ওর কাছে চেপে গেছে যা পূর্বেই খেয়াল করা উচিত ছিল ব্যোমকেশেব।

বকুলরাণী পুনরাবৃত্তি করে—'টাকাটা কার, বললে না?'

—'ওরই ত। ওর বলেই মনে হল, নিজের পকেট থেকে বার করে গুণে দিল। আর কার্নিভালে ঢুকতে ত' আমি নিজেই দেখেছি।'

—'যে টাকা জিতেছে, তাব জন্য কত টাকা দিয়ে খেলা শুরু কবতে পারে?'—বকুলরাণী বেশ ধীর ভাবেই প্রশ্ন কবে।

এতক্ষণে ব্যোমকেশ বোঝে বকুলের প্রশ্ন কোথায় নিয়ে যেতে চায়, আর হিমাদ্রি যে ওকে প্রবঞ্চনা করেছে এই কথা চিন্তা করতেই ওর কেমন অপমান ও গ্লানি বোধ হতে লাগল।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে ব্যোমকেশ বলে ওঠে—'থামো থামো, হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। যে রাতে হিমাদ্রি বাজী জিতেছিল সেই রাত ও তাব আগেব বাতের কথা স্মরণ কবার চেষ্টা করে।

বকুলরাণী বলল—'তুমি আর হিমাদ্রি ত' শুনেছি পরস্পর লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি কবে নাও। কেমন তাই নয়?'

বকুলরাণী কি আজ ক্ষেপল নাকি! এত প্রশ্ন কোথা থেকে ওর মাথায় জাগছে?

রাগে মুখ দিয়ে কথা বেরোল না ব্যোমকেশের। কথা বলতে গিয়ে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে। ভঙ্গিটা হতাশা ও বিস্ময়ের। অস্বচ্ছন্দ ও অসহায় মুখভাব নিয়ে বসে রইল ব্যোমকেশ। অত্যন্ত মৃদু গলায় বকুলের প্রশ্নের জবাব দেয়—'হ্যাঁ, তুমি ত' জানো, ওটা আমাদের মধ্যে একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।'

—'হিমাদ্রি যখন কানিভালে ঢুকেছিল, ওর কাছে কত টাকা ছিল?'

ব্যোমকেশ এইবার বুঝতে পারে বকুল কিন্তু বলতে চাইছে, আর ভাবে হিমাদ্রি কি ভাবে ওর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে সেটা বকুল কেমন সহজে ধরে ফেলেছে। কিন্তু এ সব বিষয় বিবেচনা করতে চায় না ব্যোমকেশ। মনকে এই বলে প্রবোধ দেয়, বকুলরাণীর হিমাদ্রি-বিদ্বেষ এতই গভীর যে, সে তাকে কিছুতেই ভাল চোখে দেখতে পারে না।

ব্যোমকেশ সাদা গলায় বলে—'কি জানি, কত ছিল কে জানে? কে আর দেখেছে?'

বকুল সেইভাবেই বলে চলে—'নিশ্চয়ই ওর কাছে বেশ কিছু ছিল। বেশি টাকা নিয়েই খেলা শুরু করেছিল। কারণ শুনেছি বেশি টাকাতেই বেশি টাকা ওঠে। যে টাকা ও জিতেছে তা দু'চার টাকার কর্ম নয়।'

ব্যোমকেশ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে—'হ্যাঁ তা বুঝি। ওর বেশি টাকাই ছিল হয়ত।'

—'কিন্তু তোমাদের ত' ভাগাভাগি চলে। তোমার কাছেও ত' অর্ধেক থাকার কথা—কি ছিল তোমার সেদিন, মনে পড়ে না?'

সোজা ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে বকুলরাণী, একটা স্পষ্ট জবাব চায়। ব্যোমকেশ কিন্তু উত্তর দেয় না, একটা তীব্র অপমানবোধ তার অন্তরটা মথিত করে তুলল, হিমাদ্রির সঙ্গে ওর

সখ্যতার মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে, তা যেন ওর চোখের ওপর এখন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বকুলরাণী নির্মম কণ্ঠে বলে—'তোমার সঙ্গে ভাগাভাগির কথাটা তাহলে নিছক ভাঁওতা, অনেক কথাই ও তোমার কাছে চেপে যায়—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'আমি ওকে এক ঘুঁষিতে গুঁড়ো করে দিতে পারি, ও আমার কাছে কি··· ?'

বকুলরাণী হাসি চেপে তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ করে নেবার জন্য পেয়ালায় চুমুক দেয়। আর তার কাছে হিমাদ্রির তুচ্ছতা প্রমাণ করার জন্যই ব্যোমকেশ বার বার উত্তেজিত ভাবে বলে—'আমার কাছে দু দশ মিনিটের ওয়াস্তা—, কি করতে পারে হিমু!'

এই সব কথায় কিন্তু বকুলের মন ভেজে না, আর বকুল কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যোমকেশের প্রবল আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব দৈহিক শক্তির ওপর আস্থা একটু একটু করে হ্রাস পেতে লাগল।

—'এ সব কথার কোন মানে হয় না, আজকালকার দিনে শক্তির কোন দাম নেই, দাম বুদ্ধির, বুদ্ধির কাছে শক্তি তুচ্ছ, হিমাদ্রির বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি খাটায়, সে তোমাকে ঠকায়, সে জেতে, বুদ্ধিতেই জেতে, আমি ত' তোমাকে সব বুঝিয়ে দিলাম স্পষ্ট করে, তোমার মনটা সাদা তাই তুমি বুঝেও বোঝ না—কবে তুমি বুঝবে ?'

বকুলরাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

একটু শান্ত হয়ে ব্যোমকেশ বলে—'চল, মাঠে একটু বসবে না ?' মাঝে মাঝে মেমোরিআল হলের সন্নিকটস্থ লেডীজ গল্ফ্ ক্লাবের ধারে মাঠের ওপর বসে ওরা সন্ধ্যাযাপন করে, আজও সেই আমন্ত্রণ জানায় ব্যোমকেশ।

বকুলরাণী সংক্ষেপে বলল—'নাঃ যাই, আমার একটু কাজ আছে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যোমকেশ আজ বকুলকে ছেড়ে দিল। তারপর

সেই বকুল-হীন টেবিলে বসে পুনরায় এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। বাইরে দুর্দান্ত ঠাণ্ডা, কোথায় কোন্ দেশে নাকি বরফ পড়ছে, তারই প্রতিক্রিয়া কলকাতা শহরে এসে পৌঁছেচে। এই শৈত্য কিন্তু ব্যোমকেশকে যেন বিঁধছে না। গায়ের জামাটির কয়েকটি বোতাম খোলা—দুটি পকেটের ভিতর হাত রেখে ব্যোমকেশ হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াল।

ব্যোমকেশ ভেবে পায় না কি করবে, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তার, হিমাদ্রি আর বকুলরাণী উভয়েই তাকে উপহাস করে, তাচ্ছিল্য করে—হিমাদ্রি যে তাকে প্রতারণা করেছে তা অসহ্য যন্ত্রণা হয়ে গায়ে বিঁধতে লাগল, মনোভার কিছুতেই নামে না।

পথ দিয়ে কত বাস, ট্রাম, চলে গেল, কত মটর, আর ট্যাক্সি ও রিক্সা, কিন্তু ব্যোমকেশ উদাসীনের মত নীরবে দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে লাগল—অবশেষে এই সব গ্লানি মন থেকে মুছে নতুন ভাবে নতুন পথে জীবন-যাপনের সংকল্প নিয়ে পথ চলা শুরু করে।

অসীম জনসমুদ্রের চলমান মিছিলে নিজেকে মিশিয়ে দেয়।

ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরে দেখল, হিমাদ্রি একা বসে কি একখানি পুরাতন বিদেশী সাময়িক পত্রে মনঃসংযোগ করেছে। ব্যোমকেশকে দেখে হিমাদ্রি বলল—'কিরে? হঠাৎ কোথায় যে মিলিয়ে গেলি, সমস্ত দিন আর পাত্তা নেই, সব প্ল্যান আপ-সেট হয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ কণ্ঠে একটু তিক্ততা মিশিয়ে বলে—'বকুলের সঙ্গে দেখা হল কিনা!' কণ্ঠস্বরের এই বৈচিত্র্যটুকুতেই যেন হিমাদ্রি বোঝে ওর অভিযোগ। ব্যোমকেশ বিছানায় পা ছড়িয়ে দিয়ে যখন শুয়ে পড়ল, তখন ওর মুখভাব দেখলে মনোভাব বোঝা খুব কঠিন হত না হয়ত।

বকুলরাণী যে সব কথা বলেছিল, তা যেন টগবগ করে মনের ভিতর ফুটছে, আর তার মাননিক স্থৈর্য ও শান্তি নষ্ট করে চিন্তাধারা আচ্ছন্ন করে তুলতে লাগল।

তীক্ষ্ণধী হিমাদ্রির চোখে এই অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু ধরা পড়ল আর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই সে প্রশ্ন করল—'বকুল কি বললে?'

হিমাদ্রি বুঝেছে এমন কোনো কথা বকুল বলেছে যার ফলে ব্যোমকেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

এই প্রশ্নে ব্যোমকেশ আবো বিব্রত ও বিরক্ত হল, বকুল যা বলেছে সে কথা এখন যেন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, আর চতুর হিমাদ্রি যে তা বুঝেছে, সেই চিন্তাই অধিক পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করছে ও অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করছে। ব্যোমকেশ মন থেকে সব কিছু মুছে ফেলে হিমাদ্রির সঙ্গে স্বাভাবিক আলোচনা শুরু কবাব চেষ্টা করে—কিন্তু কিছুতেই তা পেরে ওঠেনা,—ঠিক কিভাবে যে কথাটা শুরু কববে ঠিক করতে পাবে না।

হিমাদ্রি আবাব প্রশ্ন করে—'কি কথা হল বকুলেব সঙ্গে, বল্না? চুপ কবে বইলি যে?'

ব্যোমকেশ ওর মুখেব দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। যেন সেই দৃষ্টির দাহ সহ্য করতে না পেরেই হিমাদ্রি পুনরায় পুরাতন সাময়িক পত্রটিতে চোখ বুলায়, আর হিমাদ্রি ভয় পেয়েছে ভেবে ব্যোমকেশ একটু সান্ত্বনা পায়। তার কাছে এই এক সুযোগ। আব সে সুযোগ গ্রহণ করে ব্যোমকেশ উঠে দাঁডায়, সামনের খালি টুলটা অসাবধান ব্যোমকেশের ধাক্কা খেয়ে শব্দ করে মেঝেতে পড়ে যায়, ব্যোমকেশ হিমাদ্রির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—'ও বলছিল,—তুমি একটি ভণ্ড, চৌট্, আর অনেক কিছু। বলছিল……।'

কি যে বলেছিল সেই সব কথা স্মরণ করার চেষ্টা করে। কথাগুলো

এমন কিছু না হলেও উত্তপ্ত ব্যোমকেশ দু-একটা জোরালো কথা হিমাদ্রিকে শোনাবার জন্য বকুলের মুখনিঃসৃত কথাগুলি মনে মনে সন্ধান করে ফেরে, কিন্তু ঠিক সেইভাবে হিমাদ্রির কাছে সব কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে উঠতে পারে না। তেমন জোর দিতে পারে না। শুধু হিমাদ্রির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—'আর তুই সত্যই আমাকে ঠকিয়েছিস, বরাবরই আমরা দু'চার পয়সাও ভাগ করে নিয়েছি, অথচ এবার আমাকে কিছু জানানোরও প্রয়োজন মনে করিস নি।'

হিমাদ্রি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়—'কেন বরাবরই ত' আমি ভাগ দিই, কবে দিই নি বল্?'

ব্যোমকেশ চেঁচিয়ে বলে—'কেন কার্নিভালে যাবার আগে তোর কাছে যা ছিল তার ভাগ ত' দূরের কথা, আমাকে কিছু জানাসনি পর্যন্ত, অথচ কাছে টাকা না থাকলে তুই খেললি কি করে?'

হিমাদ্রি বেশ শান্ত গলাতেই বলে—'বারে, কিসের ভাগ?'

কয়েকদিন ধরে হিমাদ্রি একেবারে ভুলেই গিছল যে কার্নিভালে যাবার পূর্বে ও মোটর থেকে নোট নিয়েছিল। এখন দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সেই রাত্রির চুরির কথা স্মরণ হল হিমাদ্রির, আর সেই সঙ্গে তার মনে ভয় ও শঙ্কাও জাগল। তার ভয় হল হয়ত বকুলরাণী কিছু খবর পেয়েছে সেই ব্যাপারের, কিংবা গাড়িখানি ঐভাবে রেখে আসার সময় কারো নজরে পড়ে থাকবে, বকুল ঐ অঞ্চলেই ব্যোমকেশের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করে, তাও হিমাদ্রির অজানা নেই। হয়ত বকুলরাণী সমস্ত ব্যাপারটি অনুমান করেছে, তাই ব্যোমকেশের এই অভিযোগ নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামিয়ে, কি ভাবে কতটুকু সংবাদ সে পেয়েছে সেই কথাই চিন্তা করতে লাগল হিমাদ্রি।

ব্যোমকেশ এবার কথাটা স্পষ্ট করেই বলে—'কার্নিভালে খেলার

আগে নিশ্চয়ই কিছু টাকা তোর হাতে ছিল, সে টাকা কোথায় পেলি ?'

হিমাদ্রির ভয় বাড়ল ; তার উষ্মা, অকৃতজ্ঞ ব্যোমকেশের উপর বিরক্তি ও ঘৃণা সব মুছে গেল, তার পরিবর্তে সহসা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল মনে হল হিমাদ্রির, সেই শীতের রাতেও যেন কপাল ঘেমে উঠল—হিমাদ্রি বোকার মত হেসে অকারণ মাথা নাড়তে লাগল।

ব্যোমকেশ বাগে পেয়ে পুনরায় বলে—'কার্নিভালের ব্যাপারটি ত' আর দু-এক টাকার কর্ম নয়, অথচ আমার কাছে বেমালুম চেপে গেছিস ?'

এর পর কয়েক মিনিট সম্পূর্ণ নীরবতা।

হিমাদ্রি টেবিল থেকে চিরুণীটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে আবার মাথা আঁচড়ায়—এই ভাবেই নীরবতার মধ্যে সময় কাটে। আর অসহিষ্ণু ব্যোমকেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়—তাব জবাব চাই। ব্যোমকেশ একটু পরে আবার বলে—'না না, ব্যাপাবটার একটা মীমাংসা হওয়া উচিত, মানে···।'

হিমাদ্রি এইবার বলে—'বকুল আর কি বলেছে ?'

ব্যোমকেশ ঠিক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ভেবেছিল ও যা বলেছে তাই শুনেই হিমাদ্রি চটে উঠবে, অভিযোগ অস্বীকার করবে, কিন্তু হিমাদ্রি সে সব কথা গায়ে না মেখে নির্বিকাব ভাবে আবার আগের সূত্রে ফিবে যেতে চায়।

এ অবস্থা অসহ্য ও অর্থসূচক, কিন্তু এতদ্বারা যা প্রকাশ পেল তা ব্যোমকেশের পক্ষে আলোচনা চালাবার নূতন সুযোগ এনে দিল। ব্যোমকেশেব মনের ভিতর একটা অস্পষ্ট ধারণা জাগল, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওর ভোঁতা বুদ্ধিতে হিমাদ্রির চিন্তাসূত্রের উৎস সন্ধান করা সহজ নয়, হিমাদ্রি কি ভাবছে ধারণা করা কঠিন।

যাই হোক্ ব্যোমকেশের আংশিক জয়লাভ হয়েছে, ব্যোমকেশ বুঝল বকুলরাণী যে-সব কথা বলেছে হিমাদ্রি সব জানতে চায়, এখন সব কথা শুনে একটা পছন্দমত জবাব তৈরি করা ওর পক্ষে সহজ হবে, সত্য-মিথ্যা যাই হোক একটা বানিয়ে বলবে ।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশি কিছু নয়, তোর কথাই বেশি করে হল।' টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ব্যোমকেশ আবার বলে—'বকুল বলল, 'সবাই কানাকানি করছে হিমাদ্রি কি করে হঠাৎ এত টাকা পেয়ে গেল, কার্নিভালে খেলার পয়সাই বা কোথায় পেল? পুলিস নাকি তোর গাড়ির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছে, কোথা থেকে টাকা এল, এইটাই নাকি সন্ধান করছে সবাই, যা জিতেছিস তা নয়, তার আগে টাকা,—এই সব কথাই বকুল বলতে লাগল। ও যেমনটি বলেছে আমি ঠিক ঠিক তোকে শুনিয়ে দিলুম।'

একটা সঙ্কটজনক মুহূর্ত, হিমাদ্রি কথাগুলি সব বিশ্বাস করল এবং সত্যই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, যেন ওর সকল সামর্থ ও শক্তি হ্রাস পেতে চলেছে। হিমাদ্রি কথার জবাব দিতে পারে না,—সামনের চিরুণীটার দিকেই ও তাকিয়ে রইল।

ব্যোমকেশ আবার বলল—'আমার কথা বিশ্বাস না হয়, বকুলের কাছে চল।'

হিমাদ্রি চুপ করে সব শুনতে শুনতে সহসা অট্টহাস্য করে উঠল। ব্যোমকেশের মুখের পানে করুণার চোখে তাকাল, তারপর অনেকটা শিশির ভাদুড়ির ঢঙে বলে উঠল—'আমাকে কি কি বলেছে, ভণ্ড, নীচ, প্রতারক, কেমন এই ত' ?'

—'হ্যাঁ, আর বলেছে মিথ্যাবাদী।'—ব্যোমকেশ বলে ওঠে।

—'আর তোকে মিথ্যাবাদী বলেনি ?'

—'না!'

হিমাদ্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার অট্টহাস্য করল।

তারপর বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—'তোকে কিছু যে কেন বলল না তাই ভাবছি!'

হিমাদ্রি নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ব্যোমকেশ সেই ভাবেই বসে থাকে।

হিমাদ্রি আর কিছু ভয় করে না, লোকে কি ভাবছে না ভাবছে তাতে তার কিছুই এসে যায় না, তার সৌভাগ্যে সবাই ঈর্ষান্বিত। বকুলরাণীর কথায় হিমাদ্রির মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। এত কথাই যদি হয়ে থাকে শীগ্‌গীরই অন্য সূত্রেও খবর মিলবে। পুষ্পদি একদিন ডেকে পাঠাতে পারেন বা স্বয়ং এসে উপস্থিত হবেন। সতর্ক করে দিয়ে যাবেন, বরাবরই তিনি তাই করেন। জীবনের সকল সীমান্তের তিনি প্রহরী-স্বরূপিনী। যেখানেই বিপদ সেইখানেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, হিমাদ্রির কাছে যথাকালে হুঁশিয়ারি এসে পৌছয়। হিমাদ্রির নিরাপত্তা রক্ষার্থেই যেন পুষ্পদি জীবন উৎসর্গ করেছেন। অতীতের দুঃখের দিনগুলির কথা ভাবে হিমাদ্রি। এখন এতই যদি কাণ্ড হয়ে থাকে পুষ্পদি নিশ্চয়ই আসবেন, তাঁর আগমন অনিবার্য! হিমাদ্রি স্বচ্ছন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

পুষ্পদি কিন্তু এলেন না, পরদিন সমস্তক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় বসে রইল হিমাদ্রি, তারও পরদিন। এইবার সে সত্যই ভয় পেল, তাই বাইরে বেরোবার সাহস আর হল না। ক' দিন দিনরাত বাড়িতেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল, কি জানি কোথা থেকে কি বিপদ আসে।

পুষ্পদিও ব্যাপারটি বুঝেছিলেন, ও সন্দিগ্ধ হয়েই স্বেচ্ছায় হিমাদ্রির সংস্পর্শে আসেন নি। হিমাদ্রি যে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় বাড়িতে বসে দিন কাটাবে এ কথা তিনি ভেবেছেন, এবং সেই ভেবে মনে মনে হেসেছেন। অনেক সদুপদেশ ও সুপরামর্শ তিনি হিমাদ্রিকে দিয়েছেন।

এখন হিমাদ্রি বরং উদ্বেগ ও সংশয়ের ভিতর দিন কাটাক, তাকে আর উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই।

আরও একদিন কাটল, তারপর হিমাদ্রির বাইরে বেরোবার সাহস হল। প্রথম দিন একা, তারপর দিন ব্যোমকেশের সঙ্গে। উভয়ে পথে বেরিয়ে হাসে।

ব্যোমকেশ বলে—'কি মজাই না হল হিমু!'

হিমাদ্রি বলে—'আর জ্বালাসনি ভাই, আমার হাসি পায়।'

ব্যোমকেশ সহসা বলে—'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

হিমাদ্রি বলে—'কোথায় যে যাব জানি না, তবে এখনত' চল 'হংকং'-এ, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।'

শীতের শেষ. কয়দিন সামান্য দক্ষিণের গরম হালকা হাওয়ায় পর অবার হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। গত রজনীতে শীতটা একটু বেশি ছিল, ভোরের দিকে আবার ঘন কুয়াশা হয়েছে, আকাশ কিন্তু মেঘলা, হয়ত দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও হতে পারত, অথচ বেলা বাড়তে সূর্যোদয় হল, কুয়াশা মিলিয়ে গেল, আবার দখিনা হাওয়া বইছে। শীতও একটু কমেছে—কোলাহল-মুখরিত নগরীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চারিদিক স্পন্দমান।

খিদিরপুরের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি নগরের চারিপাশে একবার দেখল, কলকারখানা, গুদাম, আর বিরাট আকারের বাড়িতে শহরটি কণ্টকিত। আর একটু এগিয়ে গেলেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ—ডকের ওপাশে জাহাজের মাস্তুল গগন স্পর্শ করছে, আর এদিকে রেস-কোর্সের ফ্লাগস্টাফের ওপর য়ুনিয়ন জ্যাক উড়ছে, আজ শনিবার, মাঠে দৌড় আছে।

হিমাদ্রির বেশ ভালো লাগছিল, স্বাভাবিক জড়িমার ঘোর কাটিয়ে শরীরে ও মনে একটা নতুন প্রেরণা এসে জাগল যেন। ওর ছন্নছাড়া জীবনে সহসা যেন একটা বিস্ময়কর সম্ভাবনার সূচনা হয়েছে। এ বছরের রেসিং সিজ্‌ন্‌ শেষ হয়ে আসছে, এই সমাপ্তির মুখেই জীবনের মোড় ফেরাতে হবে—আজকের দিনটি হয়ত সৌভাগ্যের বাণী বয়ে আনবে। ইতিমধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে,—ওর হঠাৎ ভাগ্যোদয়ে যাঁরা সন্দিহান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন হিমাদ্রিদের বাসার ব্যাঙ্ক-কেরানী অনিলবাবু, একই বাড়িতে থেকে হিমাদ্রি কেমন পয়সা পেল, অথচ উনি আজীবন না খেয়ে না পরে পোস্ট-অফিসের দেড় পার্সেণ্টের লোভে দিন কাটাচ্ছেন। অনিলবাবুর জীবনটি শুধু পয়সা জমানোর সাধনাতেই কেটে গেল, কি করে দু পয়সাকে বাড়িয়ে চার পয়সা করতে হয়, তার গূঢ়তত্ত্ব তাঁর কাছে শেখার মত, অফিস থেকে দীর্ঘপথ হেঁটে তিনি বাড়ি ফিরে চার পয়সা বাঁচান, ট্রাম কোম্পানি এক পয়সা ভাড়া কমিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া তিন পয়সা করাতে তিনি নাকি আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ তাহলে তাঁর জমবে মাত্র তিন পয়সা করে। হিমাদ্রির সঙ্গে একদিন এই অনিলবাবুর দেখা হয়ে গেল, হিমাদ্রির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়, অনিলবাবুর মত কৃপণ এবং নীতিবাগীশ ব্যক্তি কিনা কার্নিভালে এসেছেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। ধরা পড়ে যেতে অনিলবাবু স্বীকার করলেন হিমাদ্রির ভাগ্যোদয়ের কথা শুনে তিনি লোভে পড়েই এসেছেন—সেদিন অবশ্য অনিলবাবুর বিশেষ লাভ হয়নি, তিনিই অত্যধিক লাভের আশায় হিমাদ্রিকে ত্রিশটি টাকা দিয়েছেন একটা ভালো ঘোড়ার পিছনে লাগাবার জন্য। সেই ত্রিশ-টাকার ওপর আরো কিছু চাপিয়ে হিমাদ্রি আজ ভাগ্য পরীক্ষা করবে, একটু অবশ্য ভয় আছে পরাজয়ের, কিন্তু জয়ের আশাও কম নয়—এর পরই নূতন জীবন শুরু করতে হবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করে—'আজ তোর কি প্রোগ্রাম রে হিমু! ভালো টিপ্‌স্‌ পেয়েছিস নাকি ?'

হিমাদ্রির একবার মনে হল, কি ওর মনে জেগেছে প্রকাশ করে বলে, জীবনটাকে ও নূতন পথে চালাবে, পার্টি ফার্টি ছেড়ে ছুড়ে এই বাউণ্ডুলে জীবনের ওপর যবনিকা টানবে—চাই কি এদেশ ছেড়ে বিদেশেও চলে যেতে পারে।

কিন্তু ব্যোমকেশকে কোন কিছু প্রকাশ করে বলতে ইতস্ততঃ করে হিমাদ্রি, ওর অন্তর থেকে সেই পুরাতন অবিশ্বাস ও সন্দেহ জেগে ওঠে, —একটা আদর্শ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যে সব কাবণ এতদিন অন্তরায় হয়ে আছে, সেই সব যুক্তি মনে উদয় হয়। হিমাদ্রি সাত-পাঁচ ভেবে নীরব রইল, আর ব্যোমকেশও দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলল না।

রেসের মাঠে কিন্তু খেলার কথা পূর্বাহ্ণেই ঠিক করে নিতে হয়,—ব্যোমকেশ তাই পুনরায় প্রশ্ন করে—'কি হল ? কি ঠিক করলি ?'

রেসের বইখানিতে অখণ্ড মনঃসংযোগ করে হিমাদ্রি নীবব থাকে, কোন কোন ঘোড়াকে সে 'ব্যাক্' করবে তা সে ভাল কবেই জানে, আজকের খেলা খুব জবর, অনেকগুলি প্লেট আর অনেক ভাল ভাল ঘোড়া। ঝুঁকে পড়ে 'রেসিং-গাইড'টাই দেখতে থাকে হিমাদ্রি। কিন্তু রেস বা ব্যোমকেশ কোনটাই তার মাথায় নেই, মাথায় ঘুরছে অনিলবাবুর কথা, তাঁর জন্যে কি খেলা যায়, সেই কথাই চিন্তা করছে হিমাদ্রি। অনিলবাবুকে একটা মোটা রকমের লাভ পাইয়ে দিতে চায় হিমাদ্রি, এ বিষয়ে সে সত্যই সৎ। তাঁকে ঠকাবার বাসনা তার মোটেই নেই, বরং কিসে তাঁর টাকাটা ভাল ভাবে খাটানো যায়, সেইটাই ওর চিন্তা। ও যদি এক তাড়া নোট নিয়ে তাঁর হাতে দিতে পারে, তবে ওর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়বে, অন্ততঃ অনিলবাবুর চোখে—তবে

মুস্কিল এই যে অনিলবাবুর কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যে কোন মতেই তাঁর নামটি প্রকাশ করা হবে না।

ব্যোমকেশটাও সেই থেকে এমন পিছনে সেঁটে রয়েছে যে তাকে লুকিয়ে কোন কিছু করা যায় না, তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে হিমাদ্রি, কিন্তু পারে না। আর ব্যোমকেশটা যেন একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই ওর পেছনে লেগে থাকে। ফলে প্রথম দে ৗটা কোন বাজি না ধরেই কাটল।

ব্যোমকেশ সন্দিহান হয়ে উঠল—ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল—'ব্যাপার কি হিমু? চুপচাপ রয়েছিস, তোর মতলবটা কি?'

হিমাদ্রি তবু নিরুত্তর—হিমাদ্রিকে উদ্বিগ্ন ও সংশয়াচ্ছন্ন মনে হয়, সে রেসের মাঠের চারিদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকায়, ব্যোমকেশের চোখে তা এড়ায় না।

ব্যোমকেশ বলে—'কি রে হল কি তোর?'

হিমাদ্রির নীরবতা ও অনিশ্চয়তা ওর ভাল লাগে না। সে এবার বিরক্ত হয়ে বলে—'কিরে মুখে কি চাবি দিয়ে রইলি নাকি? কি ভাবিস তুই আমাকে? বাজার সরকার?'

হিমাদ্রি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—'জ্বালিয়ে মারলি দেখছি, দেখছিস না ভাবছি! একটু ভাবতেও দিবি না।'

ব্যোমকেশ চুপ করে রইল। হিমাদ্রি পুনরায় মাঠের পানে তাকিয়ে রইল।

ব্যোমকেশ শ্লেষ ভরে বলল—'কি দেখছিস? সর্ষে ফুল?'

এই কথার জবাবের জন্য আর অপেক্ষা না করে ব্যোমকেশ অশেষ বিরক্তভরে 'বারে'র দিকে ছুটল। দীর্ঘক্ষণ ধরে একপাত্র মদ্যপান করার সময় পরিচয় হল এক দালালের সঙ্গে, লোকটি সৎ, কারণ মাত্র এক বোতল বীয়রের বিনিময়ে ব্যোমকেশকে একটা অমূল্য 'টিপ্‌স্' দিয়ে দিল।

ব্যোমকেশ বিশ্বাস করল টিপ্‌টি ভাল, বেশ নিশ্চিন্ত মনে 'বার' ত্যাগ করে ভদ্রলোকটির পরামর্শ মত 'বেদিং বিউটির' বোর্ডে লক্ষ্য করে দেখল সব চেয়ে কম টিকিট বিক্রি হয়েছে, প্লেসে না খেলে দশ টাকার 'উইন' খেলাই ভাল এই ভেবে, দশটাকা খরচ করে ফেলল ব্যোমকেশ। হিমাদ্রির কথা ভুলে গেছে ব্যোমকেশ, আর যা ভিড়—কে কার খবর রাখে। একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ত' নাচছে বললেই হয়, আর ওদিকে একটি ঠোঁটে রঙ মাখানো বাঙালী মেয়ে একটি সাহেবের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে, একেবারে পরমহংস অবস্থা। দুজন মাড়োয়ারী ছুটতে ছুটতে এসে 'বেদিং বিউটি'তেই একতাড়া নোট লাগাল—ব্যোমকেশের আব ভাবনা রইল না—এই পারিপ্রেক্ষিতে হিমাদ্রি শুধু ওর অবচেতন মনে জেগে রইল, যেমন জেগে থাকে চৈত্র বৈশাখ মাসের আকাশের পশ্চিম প্রান্তে টুকরো কালো মেঘ, যা সুযোগ ও সুবিধা বুঝে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে, আর ঝড়ের তাণ্ডব শুরু করে।

রেস আরম্ভ হল—ঘোড়া ছুটতে আরম্ভ করেছে। কী স্পীড্‌! তীরের গতিতে ছুটে চলেছে ঘোড়াগুলো—গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে ব্যোমকেশও দেখে। সেও যেন ঘোড়া হয়ে গেছে, সবাই পাগলের মত যে যার প্রিয় ঘোড়ার নাম ধরে চীৎকার করছে।

ফিনিশের মাথায় তখনও 'বেদিং বিউটি'ই ফার্স্ট আসছে, কিন্তু হঠাৎ কি যে হল, পিছন থেকে 'হনি বী' গলা বাড়িয়ে এগিয়ে এল, সেই সঙ্গে 'প্লে মেট', 'অরেঞ্জ বিল'—ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড হয়ে গেল, অনেক পিছনে পড়ল 'বেদিং বিউটি'—জকিটা বোধ হয় লজ্জায় ঘোড়াটাকে অন্যদিকে ছোটাল। এই নৈরাশ্য ও হতাশায় ব্যোমকেশের ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রজ্জলিত হল,—সেই টুকরো মেঘটুকু এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যোমকেশ চটল, সহসা চটে গেল—আজকের দিনটাই মাটি হয়ে

গেল, এর জন্য দায়ী হিমাদ্রি। বেরোবার পর থেকেই হিমাদ্রি কেমন আনমনা ও গম্ভীর হয়ে আছে,—শয়তানের মত চুপচাপ থেকে সব নষ্ট করল, সব দোষই ত' ওর, এমন চমৎকার দিনটা বৃথা গেল—!

ব্যোমকেশ হিমাদ্রিকে খুঁজতে লাগল, প্রথমটায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে চারিদিক দেখতে লাগল, তারপর চারদিকে ঘুরে ঘুরে হিমাদ্রিকে খুঁজে বেড়ায়, আর হিমাদ্রিকে যতই দুর্লভ বলে মনে হয়, রাগও ততই বেড়ে চলে, তখন এর ওর ঘাড়ে পড়ে ভিড় ঠেলে পাগলের মত এদিক ওদিক ঘোরে। একটা কালো ছায়া যেন তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই ছায়ার মুখে শ্লেষ মিশ্রিত বিদ্রুপের হাসি।—এ হাসি হিমাদ্রির প্রবঞ্চনা ও শঠতার হাসি।

হাঁফিয়ে না ওঠা পর্যন্ত ব্যোমকেশ এই ভাবেই ঘুরল—হিমাদ্রি বেশ গা ঢাকা দিয়েছে। ব্যোমকেশ অবাক হয়ে গেল, এতবড় মাঠে, এতগুলি এনক্লোজারে, বারে, ল্যাভাটরি, উইনডোতে, কোথাও হিমাদ্রির চুলের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

ব্যোমকেশ হাঁফায়, সহসা বিদ্যুতালোকেব মত দ্রুতগতিতে ওর সহজাত বুদ্ধি হিমাদ্রির সংবাদ এনে দেয। এই হিমাদ্রির খবর দিয়েছে বকুলবাণী। হিমাদ্রি সকাল থেকে কি ভাবে গম্ভীর হয়ে আছে, কেমন আনমনা ভাব, ওর কথা, ভঙ্গিমা সব একত্রিত হযে ব্যোমকেশের রক্ত গরম করে তুলল। এর প্রাথমিক ফল হল, ব্যোমকেশ অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পডল। পৃথিবীটা সে যেমন সহজভাবে গ্রহণ করেছে, পৃথিবীর আর কেউ তেমন সহজ ও সরল নয় কেন? কেন মানুষের এই কপটতা? নিজেকে অত্যন্ত মূর্খ ও অপদার্থ মনে হয় ব্যোমকেশের। বোঝা গেল হিমাদ্রি ইচ্ছা করেই ওকে এড়িয়ে গেছে।

বকুলরাণীর হুঁশিয়ারির প্রতিক্রিয়া হয়। সে যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সতর্ক করছে, তিরস্কার করছে। ঠিক এই সময়েই হিমাদ্রিকে

দেখা গেল, সেই দীর্ঘাকৃতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি, ডান হাতটি পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকানো। মুখ ভঙ্গিমায় আর সেই অনিশ্চয়তার ছাপ নেই, যেন আত্ম-প্রত্যয় ফিরে এসেছে।

ব্যোমকেশের বাসনা হল ছুটে যায় ওর দিকে,—জীবনে এই সর্বপ্রথম হিমাদ্রি সম্পর্কে ও সংযম প্রকাশ করল, এই সংযমে ও নিজেই খুশি হল। এতদ্দারা একটা নূতন আত্ম-বিশ্বাস মনে জাগল। ব্যেমকেশ পিছন থেকে নিঃশব্দে হিমাদ্রিকে অনুসরণ করে, হিমাদ্রি ধীরে এগিয়ে চলে, সাড়ে চারটের অক্টারলোনি প্লেটের স্টার্ট দেখার জন্য একেবারে স্টার্টারদের কোল ঘেঁষে রেলিং ধরে দাঁড়ায়—ঘোড়াগুলি পরস্পর ঘাড় বেঁকাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে, আসন্ন দৌড়ের জন্য তারা প্রস্তুত, উত্তেজনা চাপতে পারছে না। স্থান কাল পাত্র ভুলে হিমাদ্রি আত্মসমাহিত ভঙ্গিতে সেই দিকেই তাকিয়ে আছে, আর কোন কিছু লক্ষ্য করার মত তার অবস্থা নয়। পুরো রেসটা মাঠের পানে না তাকিয়ে হিমাদ্রির প্রতি লক্ষ্য রাখল ব্যোমকেশ।

ব্যোমকেশ দেখল—বুকিদের কাছে দৌড়ে গেল হিমাদ্রি, ব্যোমকেশ দেখল—পেমেণ্ট নিচ্ছে হিমাদ্রি, মোটা টাকার পেমেণ্ট, বুকিটা মাঝে মাঝে ওর মুখের পানে তাকাচ্ছে—ব্যোমকেশ এ দৃশ্য দেখেও সংযত রইল। ব্যোমকেশের মনে মনে অস্বস্তি হতে লাগল, কেবলই মনে হল হিমাদ্রি ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে, এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, যা আর জোড়া সম্ভব নয়।

সহসা পিছন থেকে সে সজোরে ওর কাঁধে ঝাঁকানি দিল। মুখ বেঁকিয়ে ব্যোমকেশ দেখল হিমাদ্রি। কিন্তু তার মুখে সেই আত্ম-প্রত্যয়ের সুদৃঢ় ভঙ্গি কই? ব্যোমকেশ বলে—'কি রে কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সেই থেকে খুঁজে মরছি—'

হিমাদ্রি গম্ভীর ভাবেই বলে—'তার মানে? তুই-ই ত হঠাৎ সরে

পড়লি।' কি শয়তানী! হিমাদ্রির কথায় ব্যোমকেশের রাগ আরও বেড়ে যায়।—পকেটে এক গাদা নোট নিয়ে হিমাদ্রি এইভাবে কথা বলছে। এত নীচে নেমেছে, এত পর হয়ে গেছে! ব্যোমকেশ প্রথমটা কথা বলতে পারল না, তারপর বলে—'সারা মাঠটা ত তোকেই খুঁজলাম, যাব আর কোথায়?'

শীতের অপরাহ্ণ শেষ হয়ে আসছে, রোদ পড়ে গেছে—পূবদিকটায় ইতিমধ্যেই একটা পাতলা ছায়া পড়েছে—ভিড়ও ভাঙছে একে একে,—উত্তর দিকে হাওয়া বইছে, শীতের হাওয়া, সূর্যালোকের আর তেজ নেই।

ব্যোমকেশ বলে—'এইবার ত যেতে হয়।' —তারপর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলে—'সারা দিনটা ত তুই মাটি করলি, প্রথমটায় ছোট ছেলের মত গুঁজ্ গুঁজ্ করে কাটালি, তারপর একেবারে অদৃশ্য—'

এই দৃষ্টি কাটিয়ে হিমাদ্রি বলে—'বললুম ত তোকে এইখানেই ছিলাম, যাব কোথায়?' ব্যোমকেশ ধীর ভাবে প্রশ্ন করে—'কি খেললি?'

—'এমন আর কি, তেমন কিছু নয়…'

—'কিছু আপসেট হল? বল না কত ধরেছিলি?'

—'কত আর? সব জড়িয়ে একশ' টাকা!'

—'কিসে কত লাগালি?'

—'দুটো বাজী খেলেছি, তিনটে পঁচিশ আর সাড়ে চারটে—'

—'তার মানে—?'

—'বুঝেছি তুই কি বলবি, আমি 'রয়েল মার্ক', আর 'ভার্জিন জিপ্সি' ধরেছিলাম—'

—'ভার্জিন জিপ্সি'? সাড়ে চারটেয় 'ভার্জিন জিপ্সি'ই ত মারলে?' ব্যোমকেশ চেঁচিয়ে উঠে আবার সামলে নেয় নিজেকে। তারপর বলে—'তবে তুই খুঁত খুঁত করছিস কেন?'

—'বারে—খুঁত খুঁত করছিস ত তুই, সকাল থেকেই ত তুই ক্ষেপে আছিস।'

ব্যোমকেশের কানে কথাটি পৌছল কিন্তু সে কিছু বলল না। তার রাগ শুকিয়ে এসেছে—বেশি কিছু ভাবতে পারল না ব্যোমকেশ, সত্যই সে সরল, ঘোর প্যাচ খুব বেশি বোঝে না। এখন কেবল একটি কথাই বোঝে—অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হিমু এক তাড়া নোট পকেটে করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই টাকাই শেষটায় উভয়ের বন্ধুত্বের ভিতর প্রচণ্ড বাধা হয়ে উঠল।

ব্যোমকেশ ধীর ভাবে বলে—'আমি ক্ষেপিনি হিমু, তোকে না দেখে অবশ্য ভাবনায় পড়েছিলাম, এই যা—তুই মাঠে আছিস কিনা কি করে বুঝব বল?'

—'তুই দেখছি চটেছিস!'

—'যাক্ গে, ওসব কথা ছেড়ে দে—আজকের দিনটাই খারাপ দেখছি।'

'—যাক্ গে ওসব কথায় আর কাজ নেই—'

নীরবে উভয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল, সেলুন কার, ট্যাক্সি আর স্পোর্টস্ মডেলের অসংখ্য মোটরের ভিড় ঠেলে পথ করে এসে ওদের ছোট্ট গাড়িটাতে এসে বসল,—ব্যোমকেশ পিছনে বসে শিস দেয়। পা দুটো যথারীতি সামনের দিকে তুলে দিয়ে ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—'এক বেটা একটা টিপ্‌স্ ছাড়লে—যে কটি টাকা ছিল লাগিয়ে দিলুম—সব ভোঁ ভা! কাজেই অবস্থাটা বুঝছিস! সাধে তোকে খুঁজছিলাম!'

ছোট্ট গাড়িটি ভিড় ঠেলে এসে খিদিরপুরের পোলের ওপর পড়েছে—অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে, দূরে জাহাজের মাস্তল আর আলো, আর কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় এক অপূর্ব দৃশ্যপট রচিত

হয়েছে—আলো ও ছায়ার অপরূপ সম্মিলন। রাত এল, মহানগরীর রাত, পাপ আর পাপীদের রাত, আলো আর আগুন, মদ ও মেয়েমানুষ, কলরব ও কোলাহলের রাত নামল…

ব্যোমকেশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—'যাক, বাড়ি ফেরাই ভালো। দিনটা অতি কুৎসিৎ, অতি বিশ্রী ভাবেই কাটল'—তারপর কি মনে করে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল…'কত পেলি হিমু ?'

গাড়িটা একসিলারেট করে যেন রাস্তার ওপর ধাক্কা লাগল, সে-যাত্রা সামলে নিয়ে হিমু বলল…'এই গোটা পঞ্চাশেক টাকা থাকবে আর কি।'

ব্যোমকেশ স্তম্ভিত, বাক্যহীন। ইচ্ছা হল হিমাদ্রির গলাটা টিপে ধরে প্রাণটা নিংড়ে বের করে নেয়।

কিছুই যেন হয়নি এই ভাবে হিমাদ্রি গাড়ি চালায়। ব্যোমকেশ শুধু পিছন থেকে ওর বড় বড় চুলগুলো দেখে—কেমন একটা নিস্ফল আক্রোশে জ্বলে। তার মনে পড়ে বকুলরাণীর কথাই ঠিক, সে যা বলেছে তা বর্ণে বর্ণে সত্য। সেই কথাই বার বার মনে পড়ে। এ দিনের কথাও সে পূর্বাহ্নে বলেছে। সে স্বচক্ষে হিমাদ্রিকে অনেক টাকার নোট পকেটে গুঁজতে দেখেছে—আব এখন কিনা ওকে লুকিয়ে এই ওব উক্তি! এই শেষ,—বাড়ি পৌছে আজ হিমাদ্রির সঙ্গে চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতে হবে।

গাড়িখানি যখন ব্রিজ ছাড়িয়ে নীচে নামল, হিমাদ্রি সহসা বললে—'বেশ দেখাচ্ছে—না রে ব্যোমকেশ—বারোমাসই যেন কালীপূজো—'

ব্যোমকেশ নীরব। হিমাদ্রি যা বলে, কিছুই কানে পৌছয় না, কিছুই ভাল লাগেনা—হিমাদ্রিও এই নীরবতার হেতু হয়ত অনুমান করে, কিন্তু সে-ও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে,—তার একটা সমস্যা রয়েছে, টাকাটার বেশি অংশ অনিলবাবুর জন্যই রয়েছে, তাঁর টাকাতেই জিত হয়েছে, তাঁর টাকা তাঁকেই দিতে হবে, তার উপর প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়েছে এই বিষয় কিছুই প্রকাশ হবেনা। ব্যোমকেশ কিন্তু সন্দেহ করছে,—তার উপস্থিতি তাই অস্বস্তিকর, অবাঞ্ছিত।

অবশেষে হিমাদ্রিই নীরবতা ভেঙে কথা বলল—'তুই তাহলে নাম, গাড়িটা গ্যারাজে রেখেই আসছি।'

ব্যোমকেশ নিরুত্তর। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে গ্যারাজের কাছেই চুপ করে দাঁড়াল ব্যোমকেশ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হিমাদ্রি ফিরে এল। ওরা দুজনে অন্ধকারে পথ চলে—হিমাদ্রি পকেট থেকে টাকা বার করে, অসংখ্য নোট ও খুচরো টাকায় তার দুহাত ভর্তি। কিছু টাকা গুনে কয়েকখানি নোট ব্যোমাকেশের হাতে দিয়ে হিমাদ্রি বলে—'এই নে ব্যোমকেশ—আজকের ভাগ—'

বিনা দ্বিধায় ব্যোমকেশ টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে ওঠে—'না-না, টাকার দরকার নেই, খুব হয়েছে, ড্যাম্ চীট্—' এই কথা বলেই হিমাদ্রির গালে সজোরে ঘুঁষি মেরে বসে।

অন্ধকারে নোটগুলো ছিট্‌কে পথের ওপর উড়ে পড়ে, বিস্মিত হিমাদ্রি হতবাক, প্রথমটায় দু' এক কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু পরে বোঝে স্তব্ধতাই শ্রেয়, মুখ বুজে ব্যোমকেশের ভঙ্গি লক্ষ্য করে। বোঝে —এই শেষ, ও বুঝেছিল যে ওদের প্রাথমিক মতানৈক্যের পর এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, সেদিন যে মতান্তরের বীজ প্রকাশ পেয়েছিল আজ তাই মনান্তরের মহীরুহ হয়ে উঠেছে।

হিমাদ্রির মনে মনে একটা এই ধরনের আশংকা ছিল, কিন্তু যখন স্পষ্টই বোঝা গেল ব্যোমকেশ একটা মারামারির উদ্যোগ করছে, তখন আর ওর মনে এতটুকু ভয় জাগল না, বরং কেমন একটা স্বস্তির ভাব এল, প্রকৃত স্বস্তি। ব্যোমকেশের মুখের পানে সে ভাল করে তাকায়—তারপর ওর সহসা মনে হয় সংঘর্ষ আক্রমণাত্মক হওয়াই ভাল, প্রতিরোধমূলক সংঘর্ষে পরাজয় সম্ভাবনা, তাই বিনা দ্বিধায়

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ব্যোমকেশের নাকে একটা ঘুঁষি মেরে বসে।

ব্যোমকেশের সমস্ত কথা স্তব্ধ হয়ে যায়, আঘাতটা প্রচণ্ড হলেও ওর প্রকাণ্ড মাথা ও ঘাড় ও কাঁধের পেশীর জোরে সে আঘাত সহ্য হয়। তার শারীরিক ওজনের ওপর প্রতিক্রিয়া হয় সামান্যই, তবে মেজাজ অতিশয় রুক্ষ হয়ে ওঠে।

ব্যোমকেশও লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত হল। একটু আগে হিমাদ্রি যদি ওর সঙ্গে তর্ক করত, সমস্ত ব্যাপারটা যুক্তিদ্বারা বোঝাত তাহলে ব্যোমকেশ ঠাণ্ডা হয়ে যেত, ওর কথায় নতি স্বীকার করত। এখন ওর মন বিষিয়ে উঠেছে একটা উৎকট আক্রোশে, এই মুহূর্তটিই যেন একদিন ও মনে মনে ভেবে এসেছে। হিমাদ্রি ওকে আঘাত করে একটা মাবামাবির সুযোগ এনে দিয়েছে, এর ফলে হিমাদ্রিকে আঘাত করার একটা যুক্তি পাওয়া যায়—বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায়—কোনমতেই ওর পক্ষে পাল্টা জবাব দেওয়া সম্ভব হত না, ব্যোমকেশের আর এতটুকু দ্বিধা নেই, সে এগিয়ে এসে তাই আঘাতেব জবাব দিতে যায়, কিন্তু সে কিছু করাব পূর্বেই হিমাদ্রি আবার ঘুঁষি মেরে বসে, চোখের পাশে এসে সেই আঘাত তীব্র হয়ে লাগে, লেগেছেও জোর, আন্দাজে মেরেছিল হিমাদ্রি। সেইটাই এত তীব্র হযে উঠল দেখে সে অবাক হযে গেল, ব্যোমকেশও কম বিস্মিত হল না হিমাদ্রির এই দক্ষতায়। উভয়ে সেই নিরালা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে হাঁপায়, রাগে, বিস্ময়ে ও বেদনায় উভয়েই অন্ধ হয়ে আছে। হিমাদ্রি একটু হিসাব করে নিয়ে আবার এগিয়ে আসে—ব্যোমকেশ এবার তৈরি—হিমাদ্রির আঘাতটার প্রত্যাশায তৈরি হযেই আছে ও, এইবার মারামারির শুরু ও শেষ, এইবার প্রকৃত লড়াই। ব্যোমকেশের দেহ লৌহ-প্রাচীরের মত কঠিন হযে উঠল, হিমাদ্রি এগিয়ে আসতেই তাই ব্যোমকেশ তার থাবার মত

শক্তিশালী হাত দুটি এগিয়ে দেয় প্রথমটায়, তার পর তার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে মেরে বসে, এই ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতা হিমাদ্রির নেই, সে মাটিতে লটকে পড়ে গেল। ব্যোমকেশ হাঁফাতে হাঁফাতে আবার আঘাত হানবার জন্য অগ্রসর হয়, কিন্তু সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে হিমাদ্রি উঠে দাঁড়ায়, জ্যামুক্ত তীরের মত তার বেগ, ঘটনাটি এতই দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে ব্যোমকেশ প্রথমটা আতংকিত হয়ে উঠল, কি করবে আর ভেবে পায় না। তাই লক্ষ্য না করেই এলোধাবাড়ি একটা ঘুঁষি হিমাদ্রির ওপর ছোঁড়ে। এ ঘুঁষি কিন্তু হিমাদ্রির গায়ে লাগল না, বরং সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি হিমাদ্রি সজোরে বাগিয়ে ধরে। ব্যোমকেশ হাতটি ছাড়াবার চেষ্টা করে, আর তারই ফলে উভয়ের রীতিমত হাতা-হাতি শুরু হয়ে গেল। হিমাদ্রি ইতিপূর্বে ব্যোমকেশের চোখের ওপর যে ঘুঁষি মেরেছিল এতক্ষণে তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, চোখের দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তবুও বোঝে হিমাদ্রি এগিযে আসছে, যা কিছু করার তা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। এই ভেবেই হয়ত ব্যোমকেশ হিমাদ্রির দিকে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইখানেই উভয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে। সেই ঝাপটা-ঝাপটির ভিতর ব্যোমকেশ সুবিধা বুঝে উন্মত্তের মত হিমাদ্রির বুকের ওপর চেপে বসে, তাব পর ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের মত ভঙ্গী করে হিমাদ্রির পকেট হাতড়িয়ে টাকা বের করে গোনে, বলে—'এর নাম তোমাব কিছুই হয়নি, এত টাকা তোর কাছে আব আমাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য মিথ্যা বললি?'—ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়ায়, ওর সারা শরীর ঘর্মাক্ত ও কম্পমান, আর হিমাদ্রি সেইভাবেই মাটিতে পড়ে থাকে, তার যেন আর ওঠবার শক্তি নেই। বোধহয় জ্ঞানও নেই।

গলির মোড়ে ফিরে এসে ব্যোমকেশ একবার পিছনে তাকায়, কিন্তু তখনই আবার দুর্বলতা কাটিয়ে নিয়ে পথ চলে। জামা কাপড়ে ধুলা

ও কাদা লেগেছে, নীচের পকেট ছিঁড়ে গিয়েছে। গলার কাছটাও ফেঁসেছে, এ এক বিশ্রী অবস্থা। কিন্তু এ ছাড়া আর কি করার ছিল? সে দিন অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলের টেবিলে বসে বীয়র খেয়েই কেটে গেল ব্যোমকেশের।

মদ্যপানে শুধু সামর্থ্য নয়—একটু ফুর্তিও ফিরে এল। কি যে করেছে ও তাই ভাবছিল বসে বসে। প্রথমটায় খুব কষ্ট হচ্ছিল, দুঃখের আর অবধি ছিল না, কিন্তু সুরা সকল ভাবাবেগ মুছে দেয়। মনটা কিন্তু খুবই উদ্বিগ্ন ও আকুল হয়েছিল। কাজটা ভাল হল কি মন্দ হল সেই ভাবনাই মনকে পীড়া দেয় বেশি করে। তারপর ভাবে আজকের এই সংঘর্ষটার জন্য যে অন্তর বেদনাবিহ্বল হয়েছে, তা নয়, দীর্ঘ দিন ধরে ওদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতার দড়ি টানাটানি চল্‌ছিল আজ তার অবসান ঘটল, তাতে আর উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধনই রইল না। এখন ব্যোমকেশ একান্তভাবে একা। ওর বিজয় এনেছে নিঃসঙ্গতার দুঃখ।

এই সময়ে বকুলরাণীর কথা মনে পড়ে। এই ঘটনার পর ও যেন বকুলরাণীর আরো কাছে এসে পৌঁছল, ব্যবধান কমলো, যা ঘটছে তাতে বকুল খুশি হবে। মনে হল এখনই বকুলের সঙ্গে দেখা করলে ভাল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, পথে বেরিয়েই কিন্তু মত বদলায়। কেমন ক্লান্তি বোধ হয়, তাই বাড়ির দিকেই ফেরে।

বাড়িতে প্রবেশ করতেই সর্বাগ্রে দেখা হল অনিলবাবুর সঙ্গে, সাধারণতঃ এত রাত পর্যন্ত তিনি জেগে থাকেন না, আজ কিন্তু সারা শরীরে গায়ের কাপড় জড়িয়ে চোখ দুটি শুধু বার করে রেখে সকালকার সংবাদপত্রটি তিনি দাগ দিয়ে পড়ছেন। ব্যোমকেশের মুখের পানে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—'ব্যাপার কি! অ্যাক্‌সিডেন্ট নাকি! হিমাদ্রিবাবু কই? তাঁরও লেগেছে নাকি?'

লোকটির মুখে কেমন একটা আতংকের ভাব। ব্যোমকেশ কিন্তু তাঁর প্রশ্নে বাধা দিয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে। তারপর বলে—'হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টই বটে, ওর একটু লেগেছে বৈকি!'

এই হাসি ও কথাবার্তায় ওর শরীরের বেদনা বেড়ে ওঠে, তাই বাহিরে পাতা মাদুরের ওপর ও শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। খবরের কাগজ মুড়ে রেখে উৎকণ্ঠ অনিলবাবু ব্যোমকেশের পাশে এসে বসে, বলে—'বলুন না কি হয়েছে! মানে, হল কি হঠাৎ?'

ব্যোমকেশ বিরক্ত হয়ে ওঁকে একটু ধাক্কা দিয়েই বলে—'আপনার অত মাথাব্যথা কেন? নিজের চরকায় তেল দিন।'

অনিলবাবুও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, বলেন—'দরকার একটু আছে বৈকি! খুলেই বলছি—' তারপর প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'বলুন না কোথায় উনি?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলে—'নেহাৎই যখন ছাড়বেন না তখন শুনুন—আমি তাকে গলা টিপে মেরেছি, খুন করেছি। দেখগে যান হেমচন্দ্র লাইব্রেরির কাছে পড়ে আছে এতক্ষণ।'

তারপর ব্যোমকেশ সমস্ত ঘটনা খুলে বলে, আবেগভরে বলে যায়, কিছুই গোপন করেনা। বলে—'আমার কাছে মিথ্যা কথা, এতদিন আমি যা পেয়েছি, সমান ভাগ দিয়েছি, আর আজ তিনশো টাকা পকেটে রেখে আমাকে ত্রিশ টাকা দিয়ে ঠকাবে—তাই একটা হেস্তনেস্ত করে নিলাম।'

ব্যোমকেশ একতাড়া নোট বার করে দেখায়।

অনিলবাবু প্রায় চীৎকার করে ওঠেন—'ওঃ মশাই, শুনুন, ব্যাপারটা সব শুনুন আগে, আপনি ভুল করেছেন, ভীষণ ভুল করেছেন।'

ব্যোমকেশ বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উত্তেজিত অনিলবাবু চেঁচাতে থাকেন, 'হিমাদ্রিবাবুর কথাই ঠিক,

আমি সব খুলে বলছি, ও টাকা আমার। আমি যে ওঁকে টাকা দিয়েছিলুম, ভালো টিপ্ ধরবার জন্য, বারণ করে দিয়েছিলাম কাউকে জানাতে, কথা ছিল বাড়ি ফিরে টাকার ভাগ ঠিক করা যাবে।'

ব্যোমকেশ বুঝতে পারে অনিলবাবুর কথাই ঠিক। সমস্ত টাকা মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে ব্যোমকেশ উঠে পড়ে—পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে অনিলবাবু পৈশাচিক উল্লাসে টাকা গুনছেন, ব্যোমকেশ শুনতে পায় অনিলবাবু বলছেন—'শুনুন—এই ত হল অর্ধেক, বাকী টাকা কই! বাকী টাকা দিয়ে যান—'

ব্যোমকেশ উত্তর দেয়না। সজোরে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারটি তার স্থূল মস্তিস্কে কেমন গুলিয়ে যায়। সদর দরজা খোলার আওয়াজে বোঝা যায় অনিলবাবু হিমাদ্রিকে খুঁজতে বেরোলেন। ঘৃণা ও রাগে ব্যোমকেশ বিছানায় শুয়ে গুমরিয়ে ওঠে। সর্বাঙ্গে ব্যথা, কাটা অংশগুলিতে বেদনার আর সীমা নেই।

অনেকক্ষণ সেইভাবে মাটিতে পড়েছিল হিমাদ্রি, ওর নাকে ধুলা, ধুলার স্বাদ ওর ঠোঁটে। সর্বাঙ্গে ব্যথা, আর কিছুতেই যেন উঠে দাঁড়ান যাচ্ছেনা। শিরদাঁড়াটাই বোধ হয় অচল হয়ে গেছে, তাই সেইভাবে পড়ে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। এই সময়টায় এই অঞ্চলে লোক চলাচল নেই, তাই কারো নজরেও পড়ল না। গায়ের উত্তাপের নীচে মাটি অত্যন্ত শীতল। হিমাদ্রি নিঃশব্দে তাই শুয়ে থাকে। একটা পথের কুকুর চলে যাচ্ছিল, এসে দেখল, হিমাদ্রির কানটা একবার জিভ দিয়ে চাটল, হিমাদ্রি তাকে তাড়িয়ে দিতে গিয়ে আকস্মিক আবেগের মুখে উঠে বসল। এই সামান্য নড়াচড়ার ফলে গায়ে যেন একটু শক্তি ফিরে এল, নাড়ি সবল হল, কিন্তু গায়ে অসহ্য বেদনা। হিমাদ্রি দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ায়। মাটিতে পড়ে যাবার সময় এতখানি বেদনানুভব করা

যায় নি। এখন উঠে দাঁড়াতে মনে হল যেন অদ্ভুত একটা যন্ত্রণার বোঝা ঘাড়ে চেপেছে। হিমাদ্রির মনে হয় আবার শুয়ে পড়ে।

এমনই অবস্থা যে, বেদনার কথা ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যায় না। ওর চৈতন্য যেন অবলুপ্ত—বড় রাস্তার দিকে যাবার জন্যই সে দেয়াল ধরে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতেই আর চলতে পারে না, সেইখানেই বসে পড়ে। পিছন থেকে একটি জাহাজী খালাসী কিছুক্ষণ থেকে ওকে লক্ষ্য করছিল, ওইবার সামনে এগিয়ে এসে সবিনয়ে প্রশ্ন করে—'কি হয়েছে বাবু? জ্বর হয়েছে?'

হিমাদ্রি প্রথমটা কথা বলতে পারেনা, পরে অতিকষ্টে বলে—'একটা গাড়ি ডেকে দিতে পার, আমি আর চলতে পারছি না।'

লোকটা ভালো, তাড়াতাড়ি একখানি রিক্সা নিয়ে এসে হাজির হল। হিমাদ্রি গাড়িতে কাত হয়ে পড়ল—কিছু বলার আর তার সামর্থ নেই। আঙুল দেখিয়ে রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দেয়—সামনে চল।

দ্বিতীয় পর্ব

হাঁসপাতালে দিন দশেক কাটবার পর হিমাদ্রির দিদি ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে, হিমাদ্রি উপভোগ করে, হাসে। যে স্বাচ্ছন্দ্য এই নূতন আবহাওয়ায় পাওয়া যায়, জীবনে দীর্ঘদিন তার আস্বাদ পাওয়া যায়নি। তাই এই সেবা ও ভালোবাসা দুর্বল দেহকে শুধু সুস্থ করেই ক্ষান্ত রইল না, আরো গভীরে গিয়ে আঘাত করল। এই অখণ্ড অবসরে এতদিনের ফেলে আসা জীবনের একটা হিসাব-নিকাশ করার যেন সুযোগ মেলে, চরিত্রটাকে নূতন ধারায় গড়বার অবসর পাওয়া যায়। ওর দিদি ভাবেন এইবার ও একটু শোধরাবে, তাঁর আনন্দ হয়—তাই সযত্নে তার সেবা ও পরিচর্যা করে তাকে নূতন জীবনধারায় দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

দীর্ঘদিন হিমাদ্রির জীবনযাত্রার ধারা ওঁদের কাছে অত্যন্ত কটু ও অশোভন ঠেকেছে, চাকরি যাবার পর কোনরকম কাজের চেষ্টা না করে অকারণ বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ানো, উনি বা পুষ্পময়ী কোনদিনই ভালো চোখে দেখেন নি। সকলেই ধরে নিয়েছিল উচ্ছৃঙ্খল বয়াটের জীবনটাই ওর মনে মোহ সঞ্চার করেছে। এই কারণেই হিমাদ্রিকে দূরে রেখেছেন ওঁরা, এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে ওকে দেখার সুযোগ মেলেনি, আজ এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ভিতর সেই ব্যবধানটুকু সরে গিয়েছে।

শৈশবের পর এই প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে ওদের দেখার অবসর পাওয়া গেল। দিদির বয়স খুব বেশি না হলেও, বাঙালীর মেয়ে সংসারের

ঝক্কি-ঝাপটায় অনেকখানি প্রবীণত্ব লাভ করেছেন। নীচের তলায় ওঁদের কাপড়ে দোকান, অনেক রাত পর্যন্ত দোকানে কেনা-বেচা চলে, এই দোকান বহুদিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার। একদিন হিমাদ্রির ভগ্নিপতি মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরেছেন, তারপর ভাগ্যলক্ষী প্রসন্না হয়েছেন। আজ তাই ধনী হলেও দৃষ্টিভঙ্গী ওঁদের গোঁড়ামি ও নীতিবাগীশের, এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেয়াদপি সহ্য হয় না। নূতন যুগের ছোঁয়াচে আবহাওয়া থেকে নিজেদেব যথাসম্ভব মুক্ত রেখে একটা দুর্লঙ্ঘ্য নৈতিক আবেষ্টনী রচনা করে তাব ভিতর নিজেদের শুচিতা কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দারিদ্র্যেব সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, অভাব ও অনাহারের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন। মানব জীবনের ইতিহাসেব এক শোচনীয় যুগ ওঁরা অতিক্রম করে এসেছেন—এ সবই সম্ভব হয়েছে সংযম, নিয়ম-নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনে। এই কারণে এঁদের মুখভাবে দৃঢ়তাব ছাপ আছে, আসলে কিন্তু এঁরা ভীরু ও ভাবপ্রবণ। তবে আর যাই হোক. এঁবা একটা আদর্শ আঁকড়ে বসে আছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শান্তি নিরাপত্তা ও সুখের এঁরা অধিকারী। হিমাদ্রির ভগ্নিপতি ভবনাথবাবু কথায় কথায় এই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করে থাকেন, হিমাদ্রি নীরবে শোনে, আমোদ অনুভব করে। হিমাদ্রি ভাবে ওকে যেমন করে ওঁরা বোঝাচ্ছেন, দোকানের অসংখ্য কর্মচারীদেরও এইভাবে বুঝিয়ে আসছেন, ওঁদের এখানকার নিয়ম-কানুন হিমাদ্রির ওপব চাপাতে চান, হিমাদ্রি মনে মনে হাসে। এতখানি ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন এঁদের সঙ্গে থাকেনি, তাই ভালোও লাগে।

দিদি বা ভাগনীরা হিমাদ্রির অবস্থা একটু একটু বুঝতে পারেন, তাই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও চলে। হিমাদ্রির সহিষ্ণুতার পরীক্ষা চলে, হিমাদ্রি ভাবে এক সময় ওরা ম্লান হয়ে পড়বে, তখন থামবে। এক সময়

হয়ত ওকে নিয়েই একটা ঝড় উঠবে। বিশেষতঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে এই কথাটাই বার বার মনে হয়। হিমাদ্রি হাঁপিয়ে ওঠে।

হিমাদ্রি যদি আবিষ্কার করতে পারত যে দীর্ঘদিনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পর ওকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র চলেছে, তাহলে বিস্মিত হত। ওর জীবনধারার আমূল সংস্কারের জন্য দিদি এবার বদ্ধপরিকর হয়েছেন। হয়ত হিমাদ্রির জন্য যে লজ্জা ও অপমানের হাতে তাঁরা এতদিন উৎপীড়িত হয়েছেন এ তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পুষ্পদিদি।

ওদের এই উৎসাহের মুলে রয়েছে হিমাদ্রির এ বাড়িতে আশ্চর্যজনক আবির্ভাব। ওদের কাছে এর অর্থ হয়ত এই যে, দীর্ঘদিনের অপমানের ও কানাকানির এইবার অবসান ঘটল। দিদিব কাছে এর চাইতে আনন্দকর ঘটনা বিবাহের পর আব ঘটেনি। বাপের বাড়িতে উভয়ের শৈশবাবস্থায় যে উদ্বেগ শুরু হয়েছিল, পিতৃবিয়োগেব পর যে জ্বালার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, আজ যেন তার অবসান হযেছে। ভাইটির মনোবৃত্তির অস্থায়ীত্ব ও ভয়ংকরত্ব সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই সচেতন। ছেলেবেলায পাড়ার দস্যি ছেলেদের সর্দারিতে হিমাদ্রিব জোড়া ছিল না। সেই কালেই সে নিত্য নূতন বিপদ সৃষ্টি করত। বাল্যকালে ওর সঙ্গে মিশে খেলা-ধুলায় যোগ দিলেও বিপদ হত, আর সে বিপদ কোথা থেকে যে আসত, বোঝা যেতনা। তবু ওর নিরাপত্তাব জন্য উনি উপস্থিত থাকতেন। তারপব ওকে বিপদ থেকে ত্রাণ কবাটাই যেন ওঁর সবশ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে দাঁড়াল। ডাক দিলেই উনি হাজিব হতেন, হিমাদ্রিও জানতো একবার একটু চেঁচিয়ে ডাকতে পারলেই দিদি ওকে উদ্ধার করবেন। সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসবেন। এইভাবেই ওরা মানুষ হয়েছে, এইটাই ওদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সব কিছুরই

পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু দিদির কোনো পরিবর্তন নেই, তাই হিমাদ্রি আজও জানে দিদি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই।

দিদি কিন্তু ধরে নিয়েছেন যে, এইবার হিমাদ্রি পিছিয়ে পড়েছে আর উনিই জিতেছেন। হিমাদ্রির পরাজয় ঘটেছে, চূড়ান্ত পরাজয়। অতীত মুছে গেছে, দিদি এখন নূতন পরিকল্পনা হিমাদ্রির সুমুখে তুলে ধরেছেন, অলস কল্পনাবিলাসের দিন অবসান হয়েছে—নতুনভাবে চরিত্র গঠন করতে হবে।

হিমাদ্রিকে ওরা পেড়ে ফেলেছে, একেবারে হারিয়ে দিয়েছেন সবাই, তাই ওকে ঘিরে ধরে দুর্বল রোগী হিসাবেই দেখছে। অথচ ও দিন দিন গায়ে বল পাচ্ছে, শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ছে। পুষ্পদিদি ত' দিনে তিনবার বলেন—'তুই এতই বোকা হিমু, ব্যোমকেশের কাছে এর চাইতে আর কি আশা করেছিলি? এর বেশি আর কি পেতিস? ছি, ছি, ভাবাও যায়না...'

হিমাদ্রি কিছুই বলে না, নিরুত্তর থাকে, যা ঘটেছে তাতে ওদের আত্মতৃপ্তি হোক, তাই হিমাদ্রি চায়। নিজের লজ্জা, বা দুঃখকর ঘটনা, বিপর্যয়ের কথা গোপন রাখা চলেন আর।

পুষ্পদিদি বলেন—মনের ভিতর কিসের প্রতিক্রিয়া চলছে, তা বুঝেই বলেন—'ওসব কথা ভুলে যাও, মুছে ফেল, এখন একটা নূতন কাজে হাত দাও।'

হিমাদ্রি বিধ্বস্ত বন্ধুত্বের কথা ভাবে, বিচলিত হয়। এর অন্তর্নিহিত শোক যেন ওকে ব্যঙ্গ করে। পুষ্পদিদি তাও যেন বুঝতে পারেন। বলেন—'ভেবে আর লাভ কি ভাই! তোমাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকতেই পারেনা, ওকথা ভেবে আর মনে কষ্ট কোরোনা।'

হিমাদ্রি তবুও নীরব থাকে, সমস্ত বিষয়টি চিন্তা করে, কি কাজ করবে শূন্য মনে তাই চিন্তা করে। আর ডেস্কে বসে কেরানীর কাজ

করার কথা কল্পনা করা যায় না। অফিস-জীবনের নিয়মানুবর্তিতা আর ওর সইবেনা। সেই ঘড়ি আর ঘণ্টায় আর মিনিটে বাঁধা জীবন—স্বাধীনতার যেখানে কোনো সম্পর্ক নেই, সে কাজ ও আর পারবেনা। কিন্তু এই সব কথার নীচে প্রচ্ছন্ন ক্ষতের মত খোঁচা মারে একটা নিবিড় বেদনা, লজ্জা, অপমান ও পরাজয়ের গ্লানি। একটা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও উঁকি মাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে গেলে সব কথা মিলিয়ে যায়।

বাইরে পুষ্পময়ী ও বকুলরাণীর ভিতর কথা হয়: এক সপ্তাহের ওপর বাড়িতেই রইল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, একটা কাজ পাবেই।

বকুলরাণীর চুপ করে থাকে। পুষ্পময়ী আবাব বলেন—'ওদের যে আব সাক্ষাৎ হয়নি এইটাই ভালো।'

বকুলরাণী এইবার বলে ওঠে—'আশ্চর্য! দিনরাত ওরা ঝগডাই করে, বুড়ো বয়সে এত মারামারি, এত ভাবের পর—! আশ্চর্য!'

হিমাদ্রি যদিচ পবিবর্তনের পথে চলেছে, ব্যোমকেশ সেইভাবেই রইল, তাব কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেল না—এই কারণে বকুলরাণীর মনে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে আশা করেছিল যে বিজয়ের বার্তা নিয়ে ব্যোমকেশ তার কাছে ছুটে আসবে, প্রতিশ্রুতি দেবে নূতন জীবনের, নূতন পথ নেবে। তার এই নীরবতা বকুলকে অসহিষ্ণু করে তুলল। এক সপ্তাহ কেটে গেল, বকুলেব মনে হল ব্যোমকেশ হয়ত ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে চলেছে। তবু সে বুঝতে পারে না কেন ব্যোমকেশ আসছে না।

অথচ যে মুহূর্তে ওদের সাক্ষাৎকার ঘটল, বকুলের বুঝতে দেরি হল না কেন ব্যোমকেশ এতদিন দেখা করেনি, কিসের সেই বাধা, তা সে

সহজেই বুঝল। বকুলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। তার চোখে মুখেই যেন হিমাদ্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ লেখা ছিল। কাছাকাছি আসতে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যোমকেশ বলে ওঠে—'তোমার কথা একবর্ণও সত্যি নয়—সব মিথ্যে!'

উচ্চারণ ভঙ্গি রাগের চাইতেও তীব্র কিন্তু শোকের মত করুণ শোনাল। বকুল এতকাল অসহিষ্ণুভাবে ওর প্রতীক্ষা করেছে, এই কথা ক'টি বলার জন্য ও না জানি কি ভাবে দিন কাটিয়েছে।

বকুলের একটু ভয় হল, আতংকমিশ্রিত উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল। ব্যোমকেশের দৃঢ় মুষ্টির ভিতর থেকে নিজের হাতটিকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বকুলরাণী। কিন্তু সেই দানবীয় শক্তিকে হটায় কে!

গর্জন করে বলে ব্যোমকেশ—'তুমি বলেছিলে!'

এইবার বকুল দৃঢ় দীপ্তকণ্ঠে বলে—'হয়েছে কি, অত চেঁচাচ্ছ কেন? কি বলবে বলোনা—'

কিন্তু সংবাদ ও পূর্বেই বুঝেছে। হিমাদ্রির কাছে ওর এই বিজয়ের অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ওর মনকে ঘিরে রইল।

হাঁফাতে হাঁফাতে ব্যোমকেশ বলে—'হিমাদ্রি, হিমু—'তারপর সহসা বকুলের হাতটি মুক্তি দেয় কি ভেবে। ওর মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে,—বিজয়ের যে আনন্দ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সহসা তা তিক্ততা ও অনুশোচনায় পরিণত হয়। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে —'হিমাদ্রি ঠিকই আছে, তুমি যা বলেছিলে সব ভুল, বাজে কথা—'

বকুলরাণী নীচের ঠোঁটটি দাঁতে চেপে বললে—'আমার কথা একটুও মিথ্যা নয়, যা বলেছি তা নির্জলা সত্যি।'

ব্যোমকেশ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, সে রাতের সেই সংঘর্ষের কথা মনে পড়ে, অনিলবাবুর খেদোক্তিও সেই সঙ্গে মনে ভেসে

আসে। বলে—'আমি ওকে বিশ্বাসই করতাম, সেদিনও বিশ্বাস করতাম, তুমিই শুধু বলেছিলে, ও জোচ্চোর।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বকুলরাণী ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারে, ব্যোমকেশের অনুশোচনা থামিয়ে বলে—'চুপ করো, খুব হয়েছে, তুমি মেয়েমানুষেরও অধম, আকারটাই বিরাট, ভিতরটা খোকার মত। এতদিনের বন্ধুত্ব লড়ায়ে এসে পৌঁচেছে, ভালোই হয়েছে, সব কিছুই চুকেবুকে গেছে সেই সঙ্গে, এখন নতুন ভাবে আবার নিজেকে গড়ে তোলো, নতুন পথ ধরো—তা নয় তুমি আবার পুরানো রাস্তায় ফিরে আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করতে চাও—কোথায় থামতে হয় তা তোমার জানা নেই—'

ব্যোমকেশ বলে—'এখন তুমি নিজের যুক্তির সমর্থনে এই সব কথা বলছ,—হিমুর সম্বন্ধে একটা ভুল করেছ, এখনও আমাকে সেই ভুলই আঁকড়ে থাকতে বলছ, আর তার কারণ তুমি তাকে মোটেই দেখতে পার না—'

দৃঢ় কণ্ঠে বকুল বলে—'নিজের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললে ভালো হত, নিজেই নিজেকে জানো না। হিমাদ্রির সঙ্গে এই কি তোমার প্রথম লড়াই? এই সর্বপ্রথম ঝগড়া?—তোমাদের ঝগড়া-মারামারি ত লেগেই আছে, সেটা কি বোঝ? এটা কি বুঝতে পার না তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অসম্ভব? সর্বদাই তুমি ওকে টেক্কা দেবার তালে আছ, আর ও তোমাকে টেক্কা দিচ্ছে। পার্টি-ফার্টি চুলোয় গেছে, জুয়া আর মদে তোমরা জড়িয়ে পড়েছ, হিমাদ্রিকে এখন আর কেউ তাই আগের চোখে দেখে না, সবাই সন্দেহ করে—তোমরা পরস্পর মিত্র নয় শত্রু, আর থাকবেও তাই, তুমি ওকে ঘৃণা করো ও তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি ভাবো এসবও বুঝি বন্ধুত্বের অঙ্গ, এই বলেই হয়ত মনকে প্রবোধ দাও, কিন্তু এবার আর নয়, থামো। একটা হিসেব-নিকেশ করো—'

—'না, আমি তাকে খুঁজে বার করব, মাফ চাইব, আমারই ভুল, আমারই ত দোষ—'

বকুলরাণী এ-কথায় ক্ষেপে গেল—তার বক্তব্য তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এই ক'টি কথায়—'ও তোমার সর্বনাশ করবে, তাই চায়। আবার যাও, তার পায়ে ধরে মাফ চেয়ে তাকে আবার সুযোগ দাও। দেখ, এই তোমার বোঝার সময় এসেছে, সব ছেড়ে দিয়ে এখনও নতুন পথ ধরো—'

ব্যোমকেশ মৃদু গলায় বলে—'না-না, আমরা ঠিকই আছি,, আমাদের বন্ধুত্ব কি এত ঠুন্‌কো!'

—'তুমি তাই ভাবো। একটু গভীরে তলিয়ে দেখতে পারো না আসল ব্যাপারটা কি? কেন ওর সঙ্গে মেশার জন্য তোমার এই সর্বনাশা আগ্রহ, তা কি বুঝতে পার না? তোমার যে শত্রু, তা কি বলে বোঝাতে হয়? ওর ওপর তোমার ঈর্ষা আছে, চাও ওকে তাঁবে রাখতে, পার না, বারে বারে হার মানো, ওরও মনে মনে এই একই ফন্দি, ও চায় তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে। তোমাদের ভিতর একজনকে সরে আসতেই হবে। এই যে যেতে চাইছ, তার ভিতব প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা, ওর সত্যি কতটা লেগেছে, দেখে আসা।'

ব্যোমকেশ কোনও জবাব দেয় না, সামনের দিকে শূন্য দৃতেষ্টি তাকিয়ে থাকে। মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে, যেন এইখানে দাঁড়িয়ে বকুলের যুক্তি আর হজম করা চলেনা।

বকুল শান্ত কণ্ঠে বলে—'তোমরা, মানে দুজনেই, দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে ঝগড়া করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। বাদ বাকী সব কিছু মুছে ফেলছ, কিন্তু ঐ অভ্যাস আঁকড়ে পড়ে আছ। এখন হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে পড়েছে,—সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে এই কলহের লোভেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছ।'

ব্যোমকেশ নীরব। বকুল তাকে জোর করে কথা বলানোর চেষ্টা

করে। বকুল বিদ্রূপ করে, ব্যঙ্গ করে, তারপর অকস্মাৎ কি ভেবে সে-ও চুপ হয়ে যায়। সংঘাতের ভিতর দিয়েই এই দুটি প্রাণীর ভিতর দীর্ঘদীন ধরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারই বন্ধনে ওরা জড়িয়ে পড়েছে, ভাবে বুঝি এরপর একটা চমৎকার কিছু ঘটবে। একটা সুদৃঢ় প্রণয়সূত্রে ওরা পরস্পব বাঁধা পড়বে। তার ভিতর দিয়েই ওরা একটা প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনার ছবি কল্পনার তুলিতে এঁকে নিয়েছে। কল্পনার সে মায়াজাল ছিন্ন করা কঠিন।

বকুল তাই বলে—'তুমি ওকে ছাড়তে পারবে না। অতদূর যাওয়ার সাধ্য তোমার নেই, তোমার কাছে আশাও করা যায় না।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলে ভাল করে বকুলের মুখের পানে তাকায়। অন্ধকারের ভিতর বকুল চলে গেল। যেন ব্যোমকেশেরই একটা অঙ্গ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল—তার সেই চলার পথে ব্যোমকেশ বোকাব মত তাকিয়ে থাকে,—নিজেকে নিতান্ত অসহায়, নিঃসঙ্গ ও বিভ্রান্ত মনে হয়—ব্যোমকেশ চুরুটটি ধরিয়ে নিয়ে সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর অপর দিকের পথ ধরে চিন্তিতভাবে এগিয়ে চলে।

আগে আগে যে-সব জায়গায় ওবা আড্ডা দিয়েছে, সময় কাটিয়েছে, নেশা করেছে, জুয়া খেলেছে, পার্টি-অফিস, জাহাজ-ঘাটা, পথে, ঘাটে, ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরিব পাঠাগারে, বাজারে, চায়ের দোকানে, ফুটবলের মাঠে, ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ধরে ব্যোমকেশ হিমাদ্রিকে খুঁজে বেড়ায়, সেই উজ্জল ও প্রতিভাদীপ্ত ধারালো মুখ আর মোটা মোটা পাথরের কালো সেলের চশমাওলা ছবি চোখের সামনে ভাসে। ভাবে, যতই যাই কিছু হোক না কেন, যে-মুহূর্তে দেখা হবে, উভয়েই অতীত ভুলে গিয়ে আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠবে। হয়ত একটি যুৎসই অশ্লীল গালাগালিও দিয়ে উঠবে—কিন্তু কোথায় কে ?

অনুসন্ধান চলে, জল-বৃষ্টি হলে ম্যুজিয়ম বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছিল বাঁধা আশ্রয়। ব্যোমকেশ তাই মনে মনে ভাবে শহরে থাকলে হিমাদ্রি নিশ্চয়ই এই সব জায়গায় এসে আশ্রয় নেবে, তাকে পাওয়া যাবেই।

হতাশা ও ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত হয়ে ব্যোমকেশ গান্ধার শিল্পের নিদর্শনগুলির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে, হয়ত সহসা এর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে হিমাদ্রি বলবে—'আরে, এই যে।'

হৃদয়ে এই ছিল একমাত্র আশা, একটা বেঞ্চের ওপর বসে বসে শ্রান্ত ব্যোমকেশ ভাবে, প্রতি পদশব্দে সচকিত হয়ে সামনের সিঁড়ির দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ এই ভাবে অপেক্ষা করে, উঠে পড়ে অন্য ঘরে মন্থর গতিতে ঘোরে, করে কি বলেছে হিমাদ্রি, কোন কোন মূর্তি বা শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে—সেই কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

আবার বসে বসে হিমাদ্রির কথাই চিন্তা করে। হিমাদ্রি জ্ঞানী. তার পড়াশোনা আছে, সে চিন্তা করতে পারে, তার মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে, কথা বলার কৌশল জানে—সব জড়িয়ে একটা চৌকস লোক। বহুবিধ গুণে গুণান্বিত হিমাদ্রি, আর ব্যোমকেশের আছে শুধু শক্তি ও সাহস, নিয়মনিষ্ঠা ও কর্তব্যজ্ঞান।

পুরানো দিনের কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে—আমি আর হিমু, কেউ কাউকে ছেড়ে চলতে পারে না—

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেল, ব্যোমকেশ ম্যুজিয়ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, পথে অতি পরিচিত দরোয়ান বৃন্দাদিনের সঙ্গে দেখা হতে প্রশ্ন করে—'কি, হিমুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, আসে আজকাল?'

দরোয়ান খৈনী টিপতে টিপতে জবাব দেয়—'হিমু বাবু, ওই যে আপনার সঙ্গে রোগামত বাবু আসে—না, কই দেখতে পাইনা। অনেকদিন আগে এসেছিলেন—'

ব্যোমকেশ বাইরে চলে আসে, একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভাবে কোথায় যাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে ম্যাকেঞ্জিলায়াল বা সেল্‌স্‌বুরোর নীলাম ঘরে মনে হয় হিমাদ্রির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবে, উত্তেজনায় বুক কেঁপে ওঠে—কিন্তু আশাভঙ্গ জনিত হতাশায় ওর রাগ আবার বেড়ে ওঠে। ঘৃণা ও ঈর্ষায় মন আচ্ছন্ন হয়।

এই ধবণের অভিজ্ঞতাব ফলে ওর মনের ভিতর নৈরাশ্যের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে—হিমাদ্রিকে অবশেষে বুঝি হারাতে হয়। এখন ও সম্পূর্ণ একা, নোঙরহীন নৌকার মত ঘুরে বেড়াবে, ওদিকে বকুলও ওকে বোধ হয় ত্যাগ করল—আশাহীনতার দুঃখে মূহ্যমান না হলেও নিঃসঙ্গতার কষ্ট নিদারুণ হযে ওঠে। ওর উচ্ছ্বাস ও আকুলতাভরা বাণী হিমাদ্রির মত শ্রোতার অভাবে বুকের ভিতর আলোডন সৃষ্টি করে।

যে ব্রিজেব ওপর ওরা এসে দাঁড়াত, কতদিন কত পরামর্শ করেছে, গ্রীষ্মে বসে হাওযা খেয়েছে—আজ সেই ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়িয়ে সহস্রবাব সহস্র ভাবে দেখা শহরের আলোর পানে তাকায়—সেদিনের কথা আজ অতীতে দাঁডিয়েছে, তখন সঙ্গে থাকত হিমাদ্রি আজ সে একা। আজ আর কেউ সাথী নেই, যাকে মনের কথা বলা চলে—একটা ভাবধাবা নির্বিঘ্নে আলোচনা করা যায়, যে পথের সাথী হিসাবে দিতে পাববে নতুন নির্দেশ, দেবে নতুন দিনেব সন্ধান।

ব্রিজেব ওপব এসে প্রথমটায় মনে তেমন আকুলতা জাগেনি। কিন্তু ব্রিজের বড থামটার কাছে দাঁডিযে মন গভীর ব্যথায় নিপীডিত হয়ে উঠল, ব্রিজের গায়ে হিমাদ্রিব অসমান হাতেব লেখা আজও স্পষ্ট হয়ে আছে—

"নবযুগ ঐ এলো ঐ,
এলো ঐ বক্ত যুগান্তর রে—"

তবে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে আছে, দু'একটা কথা একটু কষ্ট করে পড়তে হয়।

এই কথা ক'টির যে বিপ্লবাত্মক অনুপ্রেরণা আছে, যে মাদকতা আছে, আজ তা যেন সুদূরের ভেসে আসা প্রতিধ্বনি—যে ভাবে আগের দিনে এই কথায় ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, আজ আর প্রাণে সে ভাব নেই, কথাগুলি অর্থহীন বাক্যসমষ্টি হয়ে আছে। শুধু এই কথাটাই মনে বার বার আঘাত করতে লাগল যে, হিমাদ্রিকে ছেড়ে চলবে না, হিমাদ্রিকে চাই-ই। এমন একজন চাই, যে ওকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, ধাক্কা সামলাবার শক্তি এনে দেবে। ওর মনের কথায় দেবে নূতন রূপ, উৎসাহ ও উত্তেজনায় অন্তরে আনবে উন্মাদনা।

পাথরের মোটা থামের গায়ের সেই অক্ষর ক'টির দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে, এতে যদি আসন্ন বিপ্লবের ইংগিত না থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত সংঘর্ষেং কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যে ভবিষ্যৎবাণী বকুলরাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তাই যেন অবশেষে সত্য হল।

বিষন্নচিত্তে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে ব্যোমকেশ। একে একে আরো লোকজন এসে পড়ে, এরাই একদিন ওদের নির্ভরযোগ্য সমর্থক ছিল। উদ্দাম কল্পনায় সেদিন ওরা ভেবেছে, এই সব অসহায় দল একদিন ওদের পিছনে এসে দাঁড়াবে প্রচণ্ড শক্তিতে, সেদিন তাদেব যাত্রাপথে কারো দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকবেনা,—সেদিনের যাত্রাই হবে জয়যাত্রা।

আজ কিন্তু চোখে আর সেই রঙিন স্বপ্ন নেই, তাই সল্‌মা-চুমকীব জামাহীন থিয়েটারের রাজা-রাজড়ার মত তাদেরও জৌলুস খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে তাদের প্রকৃত রূপ। তারা এসেছিল একদিন সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হয়ে উঠবেন এই ভেবে, নূতন যন্ত্রের যন্ত্রী হয়ে তারা এক অদ্ভুত পৃথিবী গড়ে তুলবে—আজ যেন তারাও ব্যোমকেশেরই একজন। তাদেরও স্বপ্নশেষ।

ব্যোমকেশ একটা চাকরি পেয়ে গেল, একরকম হঠাৎ। একটা নামকরা পাটের কলের পুরানো কারখানা ভেঙে সেই জায়গায় একটা নতুন ধরনের বিরাট কারখানা গড়া হবে, কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন মাড়োয়ারী কোম্পানি, তাদেরই একজন পদস্থ কর্মচারী, ব্যোমকেশের পরিচিত, আলাপটা বীয়ারের গ্লাসে কি রেসের মাঠে সে কথা কারো মনে নেই, তিনিই এক রকম ধরে বেঁধে চাকরিতে বসিয়ে দিলেন। কাজকর্ম বিশেষ কিছু নয়—শুধু খবরদারি করা। কাজটা ব্যোমকেশ অসীম আগ্রহভরে নিয়ে বসল, তবু ত' কিছুকাল কাজের ভিতর কাটবে। পরে কিন্তু বোঝা গেল কাজটি তেমন সহজ নয়, বেশ কঠিন এবং বিপজ্জনক আর পারিশ্রমিক তদনুপাতে অনেক কম। ব্যোমকেশ কিন্তু এই কাজেই লেগে রইল।

আজকাল সন্ধ্যার পর একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরে ব্যোমকেশ, কোথায় যাবে, মাঝে মাঝে পার্টি-অফিসে যায়—সেদিন রাত হয়। গিন্নীমা ঘুমিয়ে পড়েন, হাতমুখ ধুয়ে ঢাকা-চাপা খাবার বার করে খায় ব্যোমকেশ, তাঁকে ঘুম ভাঙিয়ে আর বিরক্ত করেনা। আজ ব্যোমকেশের দেরি হয়েছে, গিন্নীমা বড়ঘরটার একপাশে কাঠের তক্তাপোষে শুয়ে আছেন। পাশে শুয়ে তাঁর আদরের বিড়াল, ম্লান কেরোসিনের আলোর গন্ধটা নাকে উৎকট লাগে।

পেটভরে ধীরে ধীরে খায় ব্যোমকেশ, ঘরে একমাত্র আওয়াজ ওর গাল নাড়া আর চিবানোর শব্দ, তাকের ওপর রাখা প্রাচীন অ্যালার্ম ঘড়িটার টিক্‌টিক্, আর গিন্নীমার নাসিকাধ্বনি। খাওয়া শেষ হল, বিড়ালটা নেমে এসে উচ্ছিষ্টের ভাগ নিতে এল। ব্যোমকেশ এঁটো বাসনগুলি একত্রিত করে চাপা দিয়ে রাখল, নইলে গভীর রাতে ইঁদুরের উৎপাত অতিবড় সাহসী ব্যক্তির অন্তরেও ত্রাস সঞ্চার করবে। পরম

তৃপ্তিতে ব্যোমকেশ দেশলায়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটে। দাঁতে শাকের অংশ ঢুকেছে, মাংসের কণা নয়। ঘরের চারিপাশে ওর বিরাট শরীরের ছায়া ভেসে বেড়ায়। অতি পুরাতন হাতলভাঙা চেয়ারে উপবিষ্ট ওর শারীরিক ছায়া অপর পাশের দেয়ালে সুবিশাল হয়ে প্রতিবিম্বিত।

ব্যোমকেশ বৃদ্ধার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, কুঞ্চিত মুখখানিতে কেমন একটা ক্লেশের চিহ্ন, অশান্তি ও অবসাদে ভরা। ব্যোমকেশের মনে কষ্ট হয়। বিড়ালটাও এই সময় মাছের কাঁটা শেষ করে এক টুকরা রুটি নিয়ে গিন্নীমার বিছানায় উঠল।—গিন্নীমার ভীষণ শুচিবাই, এখন যদি ঘুম ভাঙে, তিনি কি করবেন তাই ভেবে ব্যোমকেশ হেসে ওঠে, অট্টহাস্য করে ওঠে। গিন্নীমার ঘুম ভেঙে যায়, সহসা আচমকা ঘুম ভেঙে ব্যাপারটা কি না বুঝেই তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ধড়মড় করে উঠে বসেন।

ব্যোমকেশ বিড়ালটাকে তাড়া দেয়, রুটি শুদ্ধ বিড়াল দেখলে বৃদ্ধাকে এই রাতে উঠে আবার স্নান করতে হবে, তাই হাতের কাছে তালপাতার পাখাটি বিড়ালকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে।

গিন্নীমা এইবার বিরক্তিভরে বলেন—'কে অমন বিশ্রী করে হাস্‌ল? একটু ঘুমিয়েও শান্তি নেই, সেই ভোর থেকে খাটছি, এতটুকু বিশ্রাম নেই, দিন রাত কেবল হট্টগোল!'

ব্যোমকেশ ভালোমানুষের মত মুখ করে বলে—'আমি ত' হাসিনি মাসিমা। হয়ত স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছেন—'

—'হ্যাঁ বাবা, স্বপ্নই বটে!'—গিন্নীমা উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে বার কয়েক নারায়ণের নাম স্মরণ করলেন—তারপর অনিলবাবুর খাবার ঠিক করতে বসলেন। অনিলবাবু ঠিক নটায় খেতে বসেন, রুটি-খেলে সয় না, তাই ভাত খান, আবার গরম থাকা চাই, তাই গরম জলের ভিতর ভাতের বাটি বসান থাকে। সেই সব গোছগাছ করে

দিতে থাকেন গিন্নীমা, সকালের খবরের কাগজটা মুখের ওপর তুলে ধরে আড়চোখে অনিলবাবুকে লক্ষ্য করে ব্যোমকেশ।

অনিলবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলার জন্য উস্‌খুস্‌ করতে থাকেন, ব্যোমকেশের শক্তি ও গাম্ভীর্যকে অনিলবাবু ভয় করেন, তাই এই শংকামিশ্রিত শ্রদ্ধা। গলাটা পরিষ্কার করে, একটু কেসে, অনিলবাবু বিনা ভূমিকাতেই বলেন—'দেখা পেলেন?'

—'কার দেখা?'—গম্ভীর গলায় পালটা প্রশ্ন করে ব্যোমকেশ।

গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে, একটু শ্লেষ মিশিয়ে অনিলবাবু বলেন—'আপনার বন্ধুর কথা বলছি, খোঁজ খবর নিচ্ছেন, না, একেবারে ছেড়েই দিলেন?—না পাওয়া গেলে কি সর্বনাশই যে হবে—'

কাগজখানি পাশে রেখে দিয়ে ব্যোমকেশ বলে—'সর্বনাশটা আবার কিসের, কি হল আপনার?'

প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে গায়ের কাপড়ে নাকটা মুছে নিয়ে অনিলবাবু বলেন—'বলেন কি মশাই, সর্বনাশ নয়? আমার মত হলে আপনিও এতক্ষণে—'

বিস্ময়ের প্রাথমিক ঘোর কাটার পর ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করে ওঠে—'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন—'

—'কি আর বলব স্যার! ওর জন্যই ত' আমার এই দুর্দশা, কি কুক্ষণেই ওর কথায় মজেছিলুম—'

—'ও আপনাকে বলেছিল? সেধেছিল কথা শোনবার জন্য?'

—'ঐ সব জুয়োর ব্যাপার। রেসে আমার দুশো টাকা গেল, কষ্টার্জিত অর্থ!'

—'সব কি হিমুর জন্যেই গেল? দিলেন কেন?'

—'লোভে মশাই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! বাকী আছে এইবার মৃত্যু—'

ব্যোমকেশ ও গিন্নীমা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ব্যোমকেশ বলে—'দুশো টাকা কি সবটাই হিমুকে দিয়েছিলেন? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, আমিই ত' এক কাঁড়ি টাকা আপনাকে দিয়েছি—'

—'হিমুবাবুই আমায় ডোবালে, ধনে প্রাণে মলুম—'

ব্যোমকেশ সহানুভূতিভরে ভাবে—'কি করা যায়, রেস এখন টালিগঞ্জে।'

—'গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছে স্যার, একেবারে ভরাডুবি—থাকলে তবু দু'একটা টিপ্‌স্ ত' পাওয়া যেত।'

—'তাই বলুন—আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছেন!'

—'কি করি স্যার, হাতে আর পঞ্চাশ টাকা রইল, আমার এত কষ্টের টাকা!'

—'ভালোই হয়েছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে, পঞ্চাশ টাকাও যে আছে তার জন্যেই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিন!'

—'একবার দেখা পেলে…'

ব্যোমাকশ উত্তেজিত হয়ে বলে—'এতদিন কি তাকে প্রাণভরে দেখেন নি? আর কি দেখতে বাকী আছে? কি দেখতে চান—?'

—'যা হেরেছি, সেইটা উসুল করে নিতে চাই, তাহলেই—'

ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করে থাকে ব্যোমকেশ, বলে—'বেশ, তাহলে হলধর বর্ধন রোডে, ওর ভগ্নিপতির দোকানে যান, দেখা পাবেন।'

আধ-খাওয়া অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন অনিলবাবু, বলেন—'হলধর বর্ধন! হলধর বর্ধন রোড! সেটা আবার কোথায়—যাই হোক লিখে রাখা ভালো—'

গিন্নীমা এই সময় ঘরে এলেন, শুধু বললেন—'আবার হিমু—!'

ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করে ওঠে, বলে—'হ্যাঁ মাসীমা, টাকার কামড়

বড় বিশ্রী! আগেও অনিলবাবুর ছিল, অন্ত ধরণের—যা ছিল তিল তা এখন তাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন মরণ কামড়ে পড়েছেন—!'

গিন্নীমা হেসে বললেন—'টাকার লোভ কার নেই বাবা! সবায়েরই সমান, আজ যদি হিমু থাকত!'

হিমাদ্রির এখন নূতন জীবন। 'খেলে যায় বর্ষা ছায়া রৌদ্র আসে বসন্ত,' দিনরাত কোথা দিয়ে ভেসে যায়, রাতের স্বপন প্রাতে ভাঙে, বিগত দিনের প্রতিশ্রুতি নূতন প্রভাতে বিস্মরণের কূলে মিলিয়ে যায়, হিমাদ্রির এখন অখণ্ড অবসর, সেই নিরবচ্ছিন্ন অবসর-সমুদ্রে অবগাহন করে ও স্নিগ্ধ হবার চেষ্টা করে। এদিকে পূজা এসে পড়েছে, ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখগুলোয় পৌঁছতে আর অল্প কয়দিন বাকি আছে।

হিমাদ্রির দিদি এবার পূজা করবেন, তারই আয়োজন চলেছে নীচের তলায়, খুব জাঁক-জমক না হলেও নমো-নমঃ করে দুর্গা পূজা করতেও ত ধুম-ধাম কম নয়, তাই বাড়িটায় একটু সোর-গোল আছে, সবাই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত, যার কোন কাজ নেই সে-ও ব্যস্ততার ক্লেশ জানাতে আরাম বোধ করে, এইভাবে পঞ্চমী এসে গেল, ষষ্ঠীর প্রভাতে বোধন—কাগজের ফুলে, দেবদারু পাতায় ও রঙিন আলপনায় বাড়ির শোভা বেড়ে উঠল।

হিমাদ্রি ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, লাল, নীল, কাগজের পতাকা ও শিকলে সারা ঘর-দ্বার বিচিত্রিত—শাঁখের মুহুর্মুহু আওয়াজ, আর কাউরে ঢোল আর বাঁশি আছে—গ্রাম থেকে পিসিমারা এসেছেন, হিমাদ্রিকে তাঁরা ধরলেন কালীঘাট নিয়ে যাওয়ার জন্মে, কাছেই কালীবাড়ি হেঁটে যাওয়া শক্ত নয়, ও না হয় রিক্সায় যাবে। হিমাদ্রি

রাজী হল না, অবশেষে ওকে রেখেই সবাই গেলেন। নীচের তলায় কলরব। ওপরটা কিঞ্চিৎ শান্ত, হিমাদ্রি বারান্দায় পায়চারি করে, বলরাম বসুর গঙ্গার ঘাট থেকে কলা-বৌ স্নান করিয়ে রিকসায় চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকে, যে-সব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাগ্যবান তারা রঙবেরঙের ছিটের জামা-কাপড় পরে বেড়াচ্ছে, পুণ্য-লোভাতুর বিধবার দল স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে নিচু গলায় স্তব আউড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হিমাদ্রি দেখছে এই দৃশ্য।

বেলা বারোটার পর মেয়েরা ফিরলেন কালীঘাট থেকে, অবসর কিন্তু এতটুকু নেই, এসেই সবাই পূজার কাজ নিয়ে বসলেন. সবায়ের কাজের ভাগ আছে—উৎসবের সকল আনন্দ ও মর্যাদা যেন ওঁদের কর্মব্যস্ততায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা শুচি-শুদ্ধ ভাব। ওঁদের অনুপস্থিতির সুযোগে হিমাদ্রি সারা বাড়িটায় তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে একটি সামান্য অথচ অসামান্য বস্তু—সিদ্ধি বা ভাঙ। হিন্দুর সব কাজের ফর্দই শুরু হয় সিদ্ধিতে, হিমাদ্রিও শুনেছিল সিদ্ধি আসবে, কদিন চলবেও, তাই এত খোঁজা-খুঁজি, যদি লুকিয়ে একটু সংগ্রহ করতে পারে কিন্তু দিদি কোথায় যে রেখেছেন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যার পর দিদির ছোট মেয়ে মালতী একগ্লাস সিদ্ধির সরবৎ এনে হাজির করল, প্রকাশ্যে কি চুপি-চুপি এনেছে কে জানে, হিমাদ্রি বিনা বাক্যব্যয়ে চুমুক দিয়ে শেষ করল,—এতক্ষণে বিষাদভরা মনে একটু আনন্দ জাগে।

বিগত দিনের পূজার উৎসব কি ভাবে কেটেছে, সে-কথা মনে পড়ে, চারদিন হৈ-হল্লা করে, মদ খেয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে কেটে গেছে। এখন ও ভদ্র, সভ্য, চুপে চুপে এক গ্লাস সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে গ্লাস সরাচ্ছে, অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! ওরা যদি হিমাদ্রির আমন্ত্রিত হতেন তাহলে কি ভাবে

এই আনন্দের দিন ফুর্তিতে কাটাতে হয় তা দেখিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু এখানে এক হিসাবে ও-ই আমন্ত্রিত, সুতরাং ভব্য হয়ে থাকতে হবে।

অনেকের অনেক রকম জামা-কাপড় উপহার মিলেছে, অনেকেই আনন্দে উজ্জ্বল, হিমাদ্রির দিদিও একখানি শান্তিপুরী ধুতি এনে বললেন, —'নে হিমু, কাপড়টা ছেড়ে ফেল, বচ্ছরকার দিন—'

হিমাদ্রি পুলকিত হল। সিদ্ধির নেশাটাও একটু করে জমে উঠছে,— হিমাদ্রি সবায়ের সঙ্গে প্রফুল্ল চিত্তে গল্প শুরু করেছে, এঁদের মধ্যে অনেকেই একটু আধটু ভাঙ সেবন করেছেন, তাঁরাও আনন্দ-বিভোর, একটুতেই হেসে উঠছেন। হিমাদ্রিও অট্টহাস্য করছে। সে-হাসি সারা ঘরখানিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ব্যোমকেশের হাসির নকল। পর মুহূর্তেই নীরবতা, ওদের অনেক কাজ, একে একে সবাই সরে পড়ে। ঘরখানি খালি হয়ে যায়,—হিমাদ্রি আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

অতীতের কথা স্মরণ করতে অনেক কথা একসঙ্গে মনের ভিতর ভিড় করে আসে—কত দীর্ঘ দিনের স্মৃতি, সেই সব স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ব্যোমকেশ। ওদের বিচ্ছেদ যেন অসম্ভব, কত দিনের কত আনন্দ-বেদনার ইতিহাস, সবের ভিতর জড়িয়ে আছে ব্যোমকেশ। একটির পর একটি ঘটনা মনে আসে। এইরকম মুহূর্তেই ব্যোমকেশের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠত—নূতন দিনের অনন্ত সম্ভাবনা ওদের মনে আনন্দ ছড়িয়ে দিত, কত স্কীম্, কত তোড়জোড়। তখন অনেক সময় হিমাদ্রি তাকে উপহাস করত, তার 'আইডিয়া'র ত্রুটি ধরে কত শ্লেষোক্তি করেছে,—এখন কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একান্ত একাকী এই নির্জন ঘরে বসে মনে হয়, ব্যোমকেশ যা বলে তাই ঠিক, পার্টির লোকের সঙ্গে যদি বিপ্লব আন্দোলনের যোগ না থাকে, ওপরতলার সমাজের হাতে যদি শাসনের চাবি-কাঠি পড়ে তাহলে প্রলোভন ও ক্ষমতা মত্ততায় অন্ধ হয়ে তারা বিদেশী শাসকের চাইতেও

অত্যাচারী হয়ে উঠবে, পরের হাতের মার সহ্য হয় লোকের, কিন্তু ঘরের লোকের শয়তানি, দেশের লোক হয়ত সইবেনা। ব্যোমকেশ চেয়েছিল নীচের স্তরের লোকজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে দল গড়বে—সময় লাগবে, অর্থের প্রয়োজন হবে, কিন্তু একদিন না একদিন এই পরিস্থিতি ঘটবেই, আর সেই দ্বন্দ্বে যে দাঁড়াতে পারবে তার হাতেই থাকবে রাষ্ট্ররথের রশি। এই সব কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় ফুলে উঠত ব্যোমকেশ, নেতাদের কারো কথা ওর পছন্দ হত না, কাউকেই যেন বিশ্বাস হতনা, কিন্তু তবু ব্যোমকেশ কোনদিন ভোলেনি ও নেতা নয়, কর্মী মাত্র, ওর কাজ হুকুম তামিল করা।

হিমাদ্রি ভাবে ব্যোমকেশ এখন কি করছে কে জানে, কোথায় কি ভাবে দিন কাটায়—হিমাদ্রি সঙ্গে থাকলে পয়সার জন্য ওকে চিন্তা করতে হতনা, কিন্তু সেই বিরাট প্রাণীটির অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত কম,—হিমাদ্রির চোখ করুণা ও প্রেমে আর্দ্র হয়ে ওঠে—আন্তরিক অনুভূতিতে মন আকুল হয়। ওদের পারস্পরিক কলহ ও শেষ সংঘাতের কথা যেন মনেই পড়ে না। যা মনে আসে, তা অনুরূপ মুহূর্তে সেই অন্তরঙ্গ সাথীটির কথাই মনে পড়ে, যার সারল্যকে চিরদিন নির্বোধের মূঢ়তা বলে মনে হয়েছে, এতদিন এই ছিল হিমাদ্রির বদ্ধমূল ধারণা, ব্যোমকেশ বক্তার, বাজে বকে, এর ওর কথা শুনে এসে আওড়ায়, বই-এর পড়া কথা উগরোয়—আর বিপ্লবের বিলাসে বিভোর হয়ে থাকে।

আজ সহসা সে দৃষ্টি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, আজ যেন সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই ভারি পদক্ষেপ, সেই কলরব, সেই চঞ্চলতা, সিঁড়িতে যেন তারই পদধ্বনি। হিমাদ্রি নীরবে অপেক্ষা করে—পদধ্বনি আরও কাছে আসে, হিমাদ্রির বুকটা কেঁপে ওঠে শঙ্কায় ও উত্তেজনায়, নিশ্চয়ই ব্যোমকেশ···তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে হিমাদ্রি, বোমকেশকে সাদরে বুকে টেনে নিতে হবে—কিন্তু···

এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, আর কেউ নয় কমফর্টার বিজড়িত মূর্তিমান অনিলবাবু। নির্বাক বিস্ময়ে হিমাদ্রি লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওঁর উৎসাহ আছে, সন্ধান করে এতদূরে দোকানে এসে খোঁজ নিয়েছেন—অনিলবাবুর মুখেও কথা নেই। উনি হাঁপাচ্ছেন, দম নেই, কথা বলার চেষ্টা করছেন আবার সেই সঙ্গে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গিও করছেন। হাতের লাঠিটি সামলে, গলার কমফর্টারটি একটু সরিয়ে, খানিকটা আত্মস্থ হয়ে হিমাদ্রির দিকে চেয়ে খানিকটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, সত্যি ওর তোবড়ান গাল বেয়ে গড়িয়ে জল পড়েছে, ওর মুখে কথা নেই।

অসহিষ্ণু হিমাদ্রি শেষে বলে—'ব্যাপার কি অনিলবাবু? ওরকম করছেন কেন?'

অনিলবাবু বিড বিড করতে করতে সিঁড়ির পাশে রাখা চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন।

হিমাদ্রি বেশ ঠাণ্ডা গলায় বিনীত ভাবে বলে—'বলুন· ·বলে ফেলুন, কুণ্ঠা কিসের?

এই সহানুভূতির প্রকাশে অনিলবাবুর মনের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি সহসা বলে উঠেন, প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে—'সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই, সব গেছে, মায় পাই-পয়সাটি পযন্ত। আর ওর জন্যে দায়ি ত তুমি। প্রথমটা সবই ঠিক ছিল। টাকাও ত পেয়েছিলুম ঢের, একটা স্ফূর্তি ছিল, এখন একটি আধলাও নেই। এক-রকম সচ্ছল অবস্থাই ছিল, আর তোমার কথায় জুয়ো ধরে আজ পথের ভিং

অতীতের গহ্বর থেকে যেন এক বি… প্রতিধ্বনিত হয়ে এল। ক্রুদ্ধ হিমাদ্রি চীৎকার করে ওঠে—'কি বলতে চান আপনি··?'

বাধা দিয়ে অনিলবাবু বলেন—'ডুবে গেছি ভাই, একদম ডুবে গেছি। আর তুমিই ডোবালে।' কি ভেবে হিমাদ্রি একটু নরম হয়ে বলে—'কিন্তু,

আমার কোনই দোষ নেই। আপনি যা দিয়েছিলেন, সব টাকাটাই আমি লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ব্যোমকেশ অর্ধেক নিয়ে নিয়েছে। সেই অবধি আমি আজ পর্যন্ত এই জায়গা থেকে এক পা-ও নড়িনি। নইলে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিতাম। আমি হাঁসপাতালে ছিলাম।' একগাল হেসে অনিলবাবু বললেন—'তা আর জানিনা? সব জানি। ব্যোমকেশের কাছ থেকে টাকা আমি সব পেয়েছি। তার মতন আমিও তোমাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি। দু'একটা পরামর্শ ও টিপ্‌স্ পেলে আমার দুর্দশা হতনা। কিন্তু তুমি আমাকে জব্দ করেছ। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছ। এখন আমায় যথাসর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি।'

এইটুকু বলে অনিলবাবু আবার হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে বসলেন। হিমাদ্রি কিছুই বলল না, কারণ ও জানে যে, এ অবস্থায় কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা।

অনিলবাবু চীৎকার করে বলে ওঠেন—'তুমি একটি শয়তান। আমার কাছে বাবা স্পষ্ট কথা। ঐ ব্যোমকেশটা আর এক শয়তান। দু'টিতে যেন ধূমকেতু, মানিকজোড়। বেশ ত ছিলে বাবা। আমার সর্বনাশ করবার কি দরকার ছিল? ইচ্ছে করলেই ত গরীবকে দয়া করতে পারতে। এখন কি করে টাকা ফেরৎ পাব একটু হদিস দাও না।' শেষের দিকটা গলার স্বর অনেকটা নিচু হয়ে এল। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।—'একটু দয়া কর ভাই। গরীব বামুন, ধ্বংস হয়ে যাব। টাকা জেতবার তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা। কিসে আমি টাকাটা ফেরৎ পাই তার একটা সুবাহা করে দাও। শুধু এ-টুকু কর। তারপর আর আমি জ্বালাতন করব না। পায়ে ধরছি ভাই, আমাকে বাঁচাও।

হিমাদ্রি কুণ্ঠাভরে বলে—'ঘোড়দৌড়ের সীজ্‌ন্ এখন সেই টালিগঞ্জে,

ওটকামণ্ডে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, তবে তাতে কি ফল হবে ?'

হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল লোকটির মুখে একটা আশা ও অবিশ্বাসের ছাপ। সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠছে ওর অন্তর্নিহিত নীচ-প্রকৃতি। হিমাদ্রি শিউরে উঠল, বলল—'আমি বলছি অনিলবাবু, আপনি যা বলছেন, তা হয় না।'

অনিলবাবু তবু ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেন—'মরে যাব বাবা, মরে যাব, গরীবকে আর মেরনা ভাই। দয়া করে একটু আমায় দাঁড় করিয়ে দাও। বামুনের ভাল করলে ভগবান তোমার ভাল করবেন।'

হিমাদ্রির হাত কাঁপতে লাগল। সে ধীরে ধীরে ভেতর-পকেট থেকে ব্যবহৃত একখানি খামে-মোড়া চিঠির মত কি বার করল। সেদিনের সেই রেসের মাঠের যে ক'টি টাকা ও পেয়েছিল, তা সবই সেই অবধি সযতনে ও-র কাছে লুকোন ছিল। পকেট থেকে বার করে ও-র হাতে দিয়ে দিল। বলল—'নিন; বামুন মানুষ! কিন্তু ঘোড়ারোগ বড সর্বনেশে জিনিস। নাটকীয় ভঙ্গীতে অনিলবাবুর হাতে দিয়ে হিমাদ্রি বলে উঠল—'এই নিন, রেখে দিন। এ নিয়ে আর জুয়া খেলবার চেষ্টা করবেন না। আর কোনদিন এ-ভাবে এ-বাড়ির চৌকাট পেরিয়ে আমার কাছে ছুটে আসবেন না।' লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই টাকাগুলি সন্তর্পণে গুনতে গুনতে অনিলবাবু বলতে লাগলেন—'জানতাম তুমি দেবে, আগাগোড়াই জানতাম। কত বড বংশের ছেলে!' হিমাদ্রি তাঁকে টেনে সিঁড়িতে নামিয়ে দিয়ে বলে—'বংশ এখন কল্কিতে ঠেকেছে। আপনি এখন পথ দেখুন। আর কোন দিন জুয়ো খেলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।'

সন্তর্পণে টাকাগুলি গুনে ভিতরের পকেটে রাখতে রাখতে অনিলবাবু

বললেন—'আমি জানতুম, চিরদিনই জানতুম তুমি বিমুখ করবে না। তোমার মত—'

লোকটির চোখ মুখ দিয়ে আনন্দ উপছে উঠছিল। হিমাদ্রি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে—'আচ্ছা ঠিক আছে। আবার নূতন করে শুরু করুন।'

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন অনিলবাবু। হিমাদ্রি দেখল। তারপর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। যেন অনিলবাবু আর না এসে ঢুকতে পারে। সারা শরীর বেয়ে কেমন একটা শীতল শিহরণ, অনিলবাবু কি বলেছেন সে-সব কথা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে। তাঁর কথাগুলি সত্যই ওকে পীড়িত করে তোলে। নিজেকে কেমন দোষী মনে হয়। কিন্তু একটু পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে সে হেসে উঠল। হাতে কোন কাজ নেই, তাই হিমাদ্রি ডেক-চেয়ারটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

পূজার পরই শীত পড়ল, এবার একটু তাড়াতাড়ি শীতের হাওয়া বইছে, আলোয়ান গায়ে না জড়ালেও সন্ধ্যা ও সকালে চাদর গায়ে দিতে হয়। কোন কোন সন্ধ্যায় বেশ কুয়াশা জমে।

হিমাদ্রি একটু করে সেরে উঠছে, এইবার থেকে সকাল বিকেল একটু করে বেড়াতে বলেছে ডাক্তারে, হাজরা পার্ক পর্যন্ত যেতে পারবে। ভ্রমণান্তে বাড়ি ফিরলেই দিদি তাড়াতাড়ি এসে আগ্রহভরে প্রশ্ন করেন—'কেমন, কোন কষ্ট হয়নি ত? হাঁপিয়ে পড়েছিস, একটু বোস, আমি দুধ নিয়ে আসছি।' প্রতিদিনই এই একই কথা। হিমাদ্রি অবশ্য বলে—'না কষ্ট হয়নি মোটেই'—মনে মনে বোঝে দিদির কোথায় ভয়। হিমাদ্রি যখন আরও দূরে যেতে পারবে, তখন না শিকল কাটে।

তাই একদিন সন্ধ্যার পর দিদি বললেন—'হিমু, উনি বলছিলেন কাল থেকে তুই না হয় দোকানে একটু করে বোস্না. বিশেষ কোন খাটুনি নেই, ক্যাসটা দেখবি—।'

হিমাদ্রি মনে মনে হাসে, কার হাতে ক্যাস দেবে, দিদি ওকে একটা কাজে জড়িয়ে রাখতে চায়। এখানে অবশ্য সময় কাটাতে আপত্তি নেই, কিন্তু কোন কাজ করাব মত মনের অবস্থাও নেই। কিন্তু দিদি একদিন বললেন—'একশ টাকা করে পাবি, বসে বসেই কাজ, কেন ছেড়ে দিবি ?'

দিদির কথাটা মনে ধরল, এই রকম শারীরিক অবস্থায়, কে ওকে একশ টাকা দেবে ? সুতরাং অবশেষে হিমাদ্রি রাজী হয়ে গেল।

কাজটা সহজ, এতদিন কাজ করতেই হিমাদ্রি বুঝল, প্রকৃতপক্ষে ও-র সাহায্যেব তেমন প্রয়োজনই নেই। যে টাকাটা ওকে মাহিনা দেওয়া হবে, তা এই মন্দাব বাজাবে কিঞ্চিৎ বেশি। হযত ওদের সাধ্য ও সামর্থ্যেরও বাইবে, কিন্তু ওকে আটকানোর জন্য ওঁরা বোধ হয সব কিছু করতেই রাজী। ভদ্র ও ভব্য ভাবে সমাজে চালাবার জন্যই ওঁদের এই কৃচ্ছ্রসাধন। জীবনটাকে সংস্কৃত ও সভ্য করে তুলতে চান। ওঁবা যদি এমন কোন কাজ দিতেন, যাব ভবিষ্যৎ আছে, সম্ভাবনা আছে, তা হলে হিমাদ্রি অবশ্য খুশি হত। কিন্তু দোকানের এই কাজটুকু ছাড়া ওঁদেব হাতে এখন উপস্থিত আর কোন কাজ নেই।

বাতের পর রাত, দোকান বন্ধ করে ফিরে হিমাদ্রি লক্ষ্য করেছে ওব সম্বন্ধে ওঁবা কেমন বিব্রত হয়ে উঠছেন, হিমাদ্রি এখন ওঁদের কাছে একটা সমস্যা। কাবণ ওঁরা বুঝেছেন হিমাদ্রির ভবিষ্যৎ ওঁদেরই হাতে, ওঁদেরই সামর্থ্যেরই উপর তা নির্ভব করে। ওকে নিয়ে চলেছে জুয়া খেলা। ও যে অনিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য নয় তা ওঁরা বোঝেন। কিন্তু তবু আশা রাখেন হয়ত এক সময় ও-র তরফ থেকে সাড়া মিলবে।

ওঁদের সুসংবদ্ধ জীবনের মধ্যে ও ক্রমশঃই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এখন ওঁদের তরফ থেকে নিজেদের মত করে মানিয়ে নিতে পারলেই হয়। দিদি মাঝে মাঝে এসে চুপে চুপে বলেন—'ওঁরা তোকে বিশ্বাস করেন, ভরসা রাখেন, তুই যেন হতাশ করিস নি।' ওর আর কি বলার আছে? তাই চুপ করে থাকে। শুধু ভাবে, এমন করে ওকে নিয়ে জুয়ো না খেললেই ভাল করতেন।

হিমাদ্রি হয়ত দোকানের কাজে মনস্থির করে বসত, যদি মা ওর শরীরটা ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠত। যখন ও অসুস্থ ছিল এবং পরে যখন সারবার মুখে রোগশয্যায় শুয়ে ছিল তখন এ-বাড়ির একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ও হাসিমুখে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। খুশিও ছিল। সেই ঢিমে-তেতালার জীবন ওর ক্ষতে যেন প্রলেপ দিয়েছিল। শারীরিক ও মানসিক সকল অবসাদ ধুয়ে দিয়েছিল। এমন দুর্বলতামুক্ত হয়ে দোকানেব দৈনন্দিন কাজেব ভেতব ব্যস্ত থেকে ও বোঝে, যে, পূর্বতন সামর্থ্য ফিরে এসেছে। অথচ খাটুনি এত কম, কেমন বিশ্রী লাগে। এবার হিমাদ্রি অস্বস্তি বোধ করছে। শান্তিটাই এখন অশান্তি হয়ে উঠেছে। বৈচিত্র্যহীন শান্তি, একই দৃশ্য ও সেই পবিচিত মুখেব মেলা —ও র কেমন বিশ্রী লাগে। মেজাজ বিগড়ে যায়। ও চায় বেডাতে, কথা কইতে, হাসতে, আগের দিনের মত মদ্যপান করতে, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঝিমিয়ে পড়তে। পুরাতন জীবনের সেই অপূর্ব স্বাধীনতা ও উদ্দাম চাঞ্চল্য, তার তীব্র গতিবেগ, তাব সম্ভাবনা মনে এক অপূর্ব স্বপ্ন রচনা করে. অথচ মনের গভীরে এই সব কিছুর তলায় যেন একটা অন্য কিছু উঁকি দেয়, ও-র চেতন মনে ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরাতন জীবন হাতছানি দেয়; ব্যোমকেশ ও ও-র সেই অবিচ্ছেদ্য জীবনঃ সেই পুরাতন ঈর্ষা ও ঘৃণা মনে জাগে। কিন্তু এবার যেন তা সমাপ্তির দিকে, সব মিশিয়ে এমন এক মানসিক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ও-র

কাছে অভূতপূর্ব। সেই দুটি পাঁজরা ভাঙার বেদনা অপমান ও পরাজয়ের গ্লানি অন্তরে উত্তাপ ও জ্বালা এনে দিয়েছে।

কিন্তু সেই আকস্মিক পুরাতন জীবন যেন আবার চোখের সামনে এসে পড়েছে। আর কিছুর অবশ্য তেমন জোর নেই। পাশে ব্যোমকেশকে না নিয়ে, তার সেই বিরাম-বিহীন বিপ্লবের পরিকল্পনা কিংবা তার থেমে থেমে বলা বক্তৃতা ব্যতিরেকে পুরাতন জীবনের আকর্ষণ কই? সেই ব্যোমকেশ! অথচ এই বন্ধুত্বমূলক মনোভাবের সঙ্গে মারাত্মক কথাও জড়িয়ে আছে—তা সহজে মিলিয়ে যাবে না, যতদিন না উভয়ের মধ্যে ঘৃণা ও সখ্যতার একটা হিসেব-নিকেশ হবে। এ অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝে হিমাদ্রি, সত্যি একটা কিছু করার সময় এসেছে।

দিন কেটে যায়—শীতের দিন এগিয়ে আসে, বিকাল হতে না হতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কলকাতার ধূলি-ধূসরিত জঞ্জালাকীর্ণ শহরে কত মানবীয় নাটকের যবনিকা ওঠে পড়ে। এই ভাবেই একদিন অঘটন ঘটে যায়, ঝোড়ো হাওয়ায় যেমন দীর্ঘদিনের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তেমনি আবার দু'টি বিভিন্নমুখী বস্তু সম্মিলিত হবার সুযোগ পায়। এমনি দু'টি ধূলিকণা, হিমাদ্রি ও ব্যোমকেশ, যেন দক্ষিণের মদির হাওয়ায় একদিন মিশে গেল। হিমাদ্রি একদিন সকাল দশটায় খাওয়া সেরে বড়বাজার যাচ্ছিল। সুতোপটির মোড়ে রাস্তা পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়াতে হল। অতীতের মধুর স্মৃতি মনে ভেসে আসে, দীর্ঘদিন পরে সে যেন পুরাতন তীর্থে ফিরে এসেছে। কি যে ও-র কাজ— সব ও ভুলে গেল। লোভনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘূর্ণিতে সব মুছে গেল। রাস্তাটি পার হয়ে ও-ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি চারদিকে দেখতে লাগল।

শহরের অত্যন্ত জন-বহুল অঞ্চল। স্বল্প-পরিসর রাস্তা আর দু'পাশে

বাড়ি! যেন একটি কলরব-মুখরিত তীর্থক্ষেত্র। হিমাদ্রি ধীরে ধীরে পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

সূর্যকিরণ ও-র মুখের ওপর এসে পড়েছে। জনতার কোলাহল আশপাশের ভীড় যেন একটা সুমধুর সঙ্গীতের মত ওর কানে গুঞ্জরিত হতে লাগল। এই কর্মমুখর অঞ্চলে ও দীর্ঘদিন আসে নি। বুভুক্ষিত নয়ন এতদিনের তৃষা মেটায়। দু'একটি পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। লোয়ার চিৎপুর রোডের মোড়ে এসে হিমাদ্রি সহসা একটা এস্‌প্লানেড-গামী চিৎপুরের ট্রামে উঠে বসে। সেই সকাল এগারটাতেও এস্‌প্লানেডে জনসমুদ্রের স্রোত···কাগজওলা, কাটা ফলের ব্যাপারী, চানাচুরওলা—সবই পরিচিত, তারা হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। যেন ও যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছে। চৌরঙ্গির বাঁ পাশের ফুটপাথ দিয়ে ছোটখাটো হোটেলের পরিচিত বয়-বেয়ারাদের সঙ্গেও দেখা হয়। সবাই খুশি।

এ এক প্রত্যাবর্তন। এই পথ বেয়েই ত ওর জীবনধারা প্রবাহিত হবে। এই পথেই ত ও আর ব্যোমকেশ দীর্ঘ দিন ধরে নানা জ্ঞান আহরণ করে বেড়ে উঠেছে। আর হিমাদ্রি জানে এইখানেই কোন পথের বাঁকে অথবা ছোটখাটো দোকানের সামনে ব্যোমকেশকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে গেল, ম্লান হয়ে এলো সূর্যের আলো। ম্যাটিনী-শোর সস্তা দরের টিকিট-ক্রেতারা লাইন বেঁধে দাঁড়াল। বেশ ভীড় চারিদিকে। হিমাদ্রিও নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই রকম একটা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সিনেমা যখন ভাঙল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তার দোকান-পাটের আলো জ্বলে উঠেছে। পথে মোটরের ভীড় আরো বেড়ে গেছে। বার ও হোটেলের সামনে ভীড় বাড়ছে। এই

হট্টগোলের ভিতরেও সেই মলিন সন্ধ্যায় হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে আবিষ্কার করল। বিশালাকায় ব্যোমকেশ আধখানা চুরুট মুখে দিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে একমনে একটি পুরানো বই-এর পাতা ওলটাচ্ছে। ও-র মুখেতেই ও-র চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। হিমাদ্রি ধীরে ধীরে এসে ও-র পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এই অপেক্ষমান মুহূর্তে প্রথম দর্শনের উত্তেজনা ও আনন্দ ক.ম গেল। সহসা বইখানা রেখে দিয়ে পাশের লোকটিব দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে ব্যোমকেশ দেখল হিমাদ্রি ও-র দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে ও যেন হিমাদ্রির স্থূল দেহটাকে দেখল না, দেখল তার অন্তর্নিহিত আত্মাকে। তার ভিতরেই যেন তাব যা কিছু বক্তব্য স্পষ্ট হযে রয়েছে। ওদেব মধ্যে যা বৈপরীত্য তা কোনদিনই বন্ধুত্বের বাঁধনে বিদূরিত হবে না। কারো মুখে কোন কথা নেই। তবু ব্যোমকেশ যা বুঝল তাব তীব্রতা বড কম নয়। অবশেষে অতিকষ্টে তাব মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'আরে হিমু···। হিমাদ্রি !' ব্যোমকেশ কিছুতেই নিজের ভ্রুকুটি চাপতে পারে না। এই ভ্রুকুটির ভিতবেই রয়েছে হিমাদ্রির বক্তব্যেব জবাব। ব্যোমকেশের কোন উচ্ছ্বাস নেই। কণ্ঠে আবেগ নেই, আন্তরিকতা নেই। কারণ ও জানে হিমাদ্রি ও-র বন্ধু নয়, শত্রু। ও-ব ভ্রুকুটি হিমাদ্রির এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনজডিত উদ্বেগ। কেমন যেন অবিশ্বাসযোগ্য। এতদিন যাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, সে আজ একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হিমাদ্রির প্রত্যাবর্তন যেন ইন্দ্রজালের খেলা। প্রাথমিক বিস্ময়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘোর কাটিয়ে শান্ত গলায় ব্যোমকেশ বলে—'কেমন আছিস হিমু?' তারপর হিমাদ্রি কিছু জবাব দেবাব আগেই নিভন্ত চুরুটে ক'টা টান দিয়ে নেয়। তাবপব আবেগাপ্লুতকণ্ঠে বলে—'আমি জানতুম না হিমু সেদিন সত্যি আমি জানতুম না তোর আর অনিলবাবুর বন্দোবস্তের কথা। সে রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পর ও-র মুখে

শুনলাম, দুঃখের অবধি রইল না, ছি ছি, এ আমি কি করে বসেছি! তুই আমাকে জানিস, বুঝতেই পারছিস কি আমার অবস্থা!'

হিমাদ্রির কাছেও এ এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল। ব্যোমকেশ যে একদিন এভাবে অনুতপ্ত হয়ে এসে দাঁড়াবে কে জানত? তাহলে সত্য জানতে পেরেছে। হিমাদ্রির মুখে হাসি ফুটে উঠল। ওর পিঠে একটা সস্নেহ চাপড় মেরে বলে উঠল ব্যোমকেশ—'কি ভাবেই না দিনগুলো কাটল…? তুই কোথায় ছিলি হিমু? কি হয়েছিল তোর? আমি একটা চাকরি পেয়েছিলাম এখন আর নেই। কিন্তু তোর?'

হিমাদ্রি হেসে জবাব দেয়—'আমারও দিন কেটে গেল ব্যোমকেশ। চাকরিও একটা পেয়েছিলাম। কিন্তু সে চাকরিও আর নেই।'

সহসা দিদির কথা মনে হয় হিমাদ্রির। তিনি হয়ত অপেক্ষা করে আছেন। যে কাজে ও বেরিয়েছিল তার কথা মনে পড়ে। এই রকম বহু বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্র মনের মধ্যে উঁকি দেয়। হিমাদ্রি বলে—'চাকরিটায় লেগে থাকা যেত ভাই। কিন্তু আব ভাল লাগল না। তাই ছেড়ে দিলুম। তোকে দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে। আর কখনও এত আনন্দ পাই নি।'

ব্যোমকেশের কাছেও এক অপূর্ব অঘটন। ব্যোমকেশ বলে—'যাক তুই ফিরে এলি।. আবার তুই ও আমি। চল কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক।' দু'জনে গ্লোব সিনেমার বারের দিকে ছুটল। হট্টগোল, মোটরের আওয়াজ, গ্রামোফোনের দোকান থেকে ভেসে আসা সুর, সব ছাপিয়ে ওদের হাসি যেন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সেই রাত্রেই পুষ্পময়ীর কাছে সংবাদ পৌছল। পুষ্প বাড়ি এসে দিদির কাছে সব কথা শোনে, কথা সামান্যই, ব্যথা অনেক বেশি।

—দিদি সব কথা বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জবাবের আশায়, ভাবেন সে একটা কিছু মতলব দিতে পারবে।

পুষ্পর মনটা কেমন বিপন্ন হয়ে গেল। এই সংবাদটি সে এতকাল আশা করছিল। এখন কিন্তু মনে জাগল ক্রোধ মিশ্রিত ভয়। এ বাড়ির মসৃণ জীবনধারায় সহসা একটা ওলট-পালোট ঘটে গেছে, ভাবে পুষ্পময়ী। এরা সবাই আর সেই সঙ্গে পুষ্পও যে হিমাদ্রির পরিবর্তনের জন্য এতদিন চেষ্টা করেছেন, এইটাই এখন মনে অনুশোচনা জাগায়।

সবাই বলতে লাগল—'ও আর কিছু নয়। নিশ্চয়ই সেই বোম্বেটে ব্যোমকেশটার সঙ্গে আবার জুটেছে।'

পুষ্পময়ী বোঝে এ কথাই সত্য, সে-ও বিনা প্রতিবাদে কথাটি গ্রহণ করে। কিন্তু এর পিছনে গভীর অর্থ রয়েছে, সে বোঝে ওদের পুনর্মিলনের পিছনে হিমাদ্রির মনে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা আছে, নিছক বন্ধুপ্রীতি নয়। একটা হেস্ত-নেস্ত হবে এবার। এই চিন্তার পীড়নে পুষ্পময়ী স্পষ্ট দেখতে পায় এদের সংঘর্ষের দানবীয় আকৃতি। এ যেন সুপরিকল্পিত অভিযান—ওর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কিসের সঙ্গে যে এ বিষয়ের তুলনা চলে ভেবে পায় না।

ওদের মেলামেশার ভিতর এইটাই আসল উদ্দেশ্য। কথাটা ভাবতেও কেমন দ্বিধা জাগে মনে। এই ধারণাটা ওর মনে নূতন হয়ে জাগে, কেমন একটা আপোষহীন মনোবৃত্তি নিয়ে দু'জনে একত্রে থাকবে, পরিণামে কে কাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে পারবে তারই প্রচেষ্টা—একটা উদ্দাম ও উৎকট খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য দু'জনেই উদগ্রীব আর সেইখানেই ওদের মিল,—ওরা নাকি বিপ্লব আনবে!

দিদির সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করা চলেনা, উনি ভালমানুষ, অতশত বোঝেন না, ভিতরকার রহস্য বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন, আসলে

ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রি উভয়ে কি বোঝে উভয়ের অন্তর্নিহিত মনোভাব—যদি কেউ কিছু বোঝে ত সে বকুলরাণী।

পরদিন প্রাতে পুষ্পময়ী বকুলরাণীর সঙ্গে দেখা করলেন। বকুলরাণী বলে ওঠে—'যা, তা কি কথনো হয়, ভুল শুনেছ··কেবলই ত ওদের ঝগড়া আর বিবাদ—সব একেবারে চুকেবুকে গেছে!'

পুষ্পময়ী বললেন—'সত্যি কি মিথ্যে তুমি বুঝে দেখ, ঝগড়াই হোক আর মারামারি হোক ওরা কেউ কাউকে ছাড়বে না, ছাড়লে ওদের চলবে না, তুমিই ত সেদিন বলছিলে, ব্যোমকেশ হিমুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—'

—'তা জানি বটে, কিন্তু ভাই তুমি যা বলছ, তা যেন বিশ্বাসের বাইরে—'

—'না, সব সত্যি, পাকা খবর।'

—'মরুকগে, যা খুশি করুক, আমাদেব কি! ওরাই বুঝবে ওদের কাণ্ড!' উত্তেজিত হয়ে বকুলরাণী বলে।

—'আমাদেব একটু মাথাব্যাথা আছে বকুল, আমরা জানি যে ওরা কি, কি ওদের মতলব।'

—'নিজেরাই বুঝবে, ওরাই মরবে।'

—'না বকুল, 'আমাদের একটু যোগ আছে ওদেব সঙ্গে, ওদের ভালমন্দের সঙ্গেই ত আমরা জড়িত।'

—'কিন্তু আমি বুঝি না···কেমন যেন বিশ্বাস হয় না, পুরুষরা যে সর্বদাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লড়ে, শেষ পর্যন্ত ওদের রাগ থাকে না—পুরুষরা পারে না—ঘৃণা বা রাগ ওদের হৃদয়ের গভীরে থাকে না, ওবা কেবল চায় টাকা, সম্মান, আর স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের ভালবাসা নয় তার দেহটুকু,—জীবনটা পুরুষদের কাছে একটা জুয়া খেলা, একটা বিরাট ধাপ্পা। এই আমার ধারণা, এদের দু'জনের জীবনেও তাই হচ্ছে,

ওরা যে ঠিক প্রতিহিংসার লোভে আবার মিলেছে তা হয়ত ঠিক নয়।

পুষ্পময়ী বললেন—'কিন্তু ওদের জীবনে এই পারস্পরিক ঈর্ষা ও ঘৃণাটাই যেন সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে, নয় কি? মনে হয় ওরা শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই লড়ে যাবে।'

বকুলরাণী বাধা দিয়ে বলে—'পুষ্পদি এ ঠিক তোমার মতই কথা, তুমি যে বসে বসে কত কি ভাব অনেক দূরে চলে যাও, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারি না, পিছিয়ে পড়ি। আমি ব্যোমকেশকে বহুবার প্রশ্ন করেছি, ওর মনোভাব জানার চেষ্টা করেছি, কিছুই বলেনি, জানি ওরা ঝগড়া করে, কত বোঝাবার চেষ্টা করেছি ওদের দু'জনের বন্ধুত্বের বাঁধন পল্‌কা, এই ঠুন্‌কো বন্ধুত্ব চলতে পারে না, কিন্তু কোথায় একটা এমন যোগসূত্র আছে যা ওদের বেঁধে রেখেছে। তুমি যতটা ভাব ততখানি শত্রুতা ওদের মধ্যে নেই...'

—'ওরা নিজেরাই হয়ত ঠিক বোঝে না বা বুঝতে পারে না—কিন্তু, এ যে সত্যি বকুল, এই ওদের আসল রূপ। ওরা চায় বন্ধুত্বতা করতে, বন্ধুভাবে থাকতে, কিন্তু সে বন্ধুত্বের অর্থ একজন অপরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে নিঃস্বার্থভাবে—আর যদি না তা পারে তাহলেই বাধবে বিরোধ।'

বকুলরাণী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলে উঠল—'না না, সে হবে না পুষ্পদি, তুমি দেখে নিয়ো তুমি যা ভয় করছ তা হবে না, পুরুষদের মধ্যে এভাবের দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল থাকে না, শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিরোধের ফলে বিচ্ছেদ না ঘটতেও পারে।'

পুষ্পময়ী শুধু বললেন—'ওদের মত লোক সবাই পারে।

বকুলরাণী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। কিন্তু ওর মনে একটা

সন্দেহের বীজ রয়ে গেল। শুধু অনুকূল আবহাওয়া ও জলবৃষ্টির ফলে তা একদিন পত্র-পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে বিশাল হয়ে। একটা বোমার মত ভারি হয়ে এই চিন্তাটাই ওর মনের ভিতর রইল। কিছুতেই আর মনোভাব ঘুচে না।

সেই রাত্রে বকুলরাণী পদ্মপুকুরের যে অঞ্চলে ওরা থাকত সেই দিকে চলল ওদের সন্ধানে। পুষ্পময়ী সকালে যেসব কথা বলেছিলেন এখন মনের ভিতর সেই কথাগুলিই প্রবল হয়ে উঠেছে। সরু গলি-পথটার ভিতর ঢুকতে কেমন একটা আতঙ্কে মনটা ওর ভরে উঠল, যতই ওদের দু'জনের কাছাকাছি এসে পড়ছে—পুষ্পময়ীর আশঙ্কা ততই সত্য বলে মনে হয়। বাড়ির সামনে এসে বকুল চুপ করে দাঁড়াল, একবার ভিতরে ঢোকার জন্য একটু এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে অপর ফুটে দাঁড়াল। ওদের ঘরে আলো জ্বলছে, অর্থাৎ ওরা আছে, দু'জনেই হয়ত আছে—বকুল অপেক্ষা করতে লাগল, মাঝে মাঝে পায়চারি করে, আশা আছে ওরা কেউ বা দু'জনেই হয় ত এখনই বেরিয়ে আসবে। যে কষ্টকর সন্দেহ ওর মনে জেগেছে এখনই হয়ত তার অবসান হবে।

অনেক পর দরজা সত্যই খুলল, বকুল তাড়াতাড়ি চলতে লাগল, যেন সে এখনই এ পথে এসে পড়েছে। হিমাদ্রি ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দেখা গেল,—সে ফুটপাথেই পায়চারি করতে লাগল, হয়ত ব্যোমকেশের অপেক্ষা করছে, কিন্তু বেশিক্ষণ ওকে নিরীক্ষণ করার অবসর পাওয়া গেল না—হিমাদ্রি ওকে দেখেই এগিয়ে এসে ওর হাতটি ধরল, যেন পূর্বাহ্নেই ওদের দেখাশোনার ব্যবস্থা স্থির করা ছিল।

হিমাদ্রি বেশ আন্তরিকতার সুরে বলল—'বকুল! কেমন আছ?'

বকুল শুধু বলল—'ব্যোমকেশ কোথায়?'

না থেমে হিমাদ্রি বলে চলল—'কি জানি, আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, ফেরার নাম নেই। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম।'

ধীরে ধীরে হাতখানি হিমাদ্রির হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে বকুল গতি মন্থর করল। হিমাদ্রির মনে তাতে কোন বৈলক্ষণ্য নেই, সে বেশ সহজভাবেই ওর সঙ্গে চলতে লাগল। এখন আর তত দ্রুত পদক্ষেপ নেই।

বাড়ির রাস্তা পার হয়ে গিয়ে হিমাদ্রি বলল—'এস না বকুল একটু চা টা খাওয়া যাক, কতদিন পবে দেখা।'

বকুল জানত হিমাদ্রি ওকে কোন নোংরা, ভীড বোঝাই হোটেলে নিয়ে যেতে সাহস করবে না। তবু বলল—'আজে-বাজে রেস্তরাঁয় যেতে রাজী নই—'

হিমাদ্রি বলল—'না না আজে-বাজে কেন, 'মিড্ল্যাণ্ডে' যাওয়া যাক—'

ওযাটগঞ্জেব শেষ প্রান্তে হোটেল, সাধাবণতঃ বিদেশীদেরই ভীড। বকুল বোঝে ব্যোমকেশকে এডানব জন্যই হিমাদ্রি অতদূরে যেতে চায়।

এটা একটা সুযোগ তার সঙ্গে নিবিবিলি কথা কইবার। এ সুযোগ বকুল ছাডবেনা। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই সে বাজী হয, ওকে জানতে দিতে চাযনা যে এই স্বীকৃতিব পিছনে ওর একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে। বেশি কথাবার্তা না কযে উভযেই 'মিড্ল্যাণ্ডে'ব দিকে চলেছে ভীড ঠেলে—রাস্তাব ভীড়ে ওব পক্ষে হিমাদ্রির কথাব জবাব না দেওয়াব বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ জুটেছে।

'মিড্ল্যাণ্ডে' ঠিক অত বাত্রে চাযেব সময় নয, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আইসক্রীমেব অর্ডার দিল হিমাদ্রি।

চামচ দিয়ে আইসক্রীম একটু তুলে নিয়ে বকুলের দিকে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ কবে হিমাদ্রি বলে—'তারপর—!'

বকুল সংক্ষেপে প্রশ্ন করে—'আপনাদের শুনলাম আবার মিলন হল ?'

হিমাদ্রির মনে মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, বকুল ঠিক এই প্রশ্নটাই করবে—এই প্রশ্নে বিরক্ত হয় হিমাদ্রি। এ-বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিলনা মোটেই, সুতরাং সে একটু হাল্‌কা ভাবেই জবাব দেয়, ইচ্ছাটা যদি ওব প্রশ্ন আরও গভীরে যায় তাহলে সেই মুহূর্তে আলোচ্য বিষয়ের মোড ফিরেয়ে নেবে।

তাই বোকার মত হেসে বলে—'হ্যাঁ—তাই হল বৈকি, মিটমাট হয়ে গেল—।'

হিমাদ্রি লক্ষ্য করল—বকুলের চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ চাউনি। তাই হিমাদ্রি ধীরে ধীরে আবার বলে—'ব্যাপারটা একটা ভুল বোঝাবুঝির ওপর ঘটে গেল আর কি—'

—'ব্যাপারটি কি ?'

হিমাদ্রি একটু বিরক্ত হয়ে বলে—'যা নিয়ে এই ঝগডাটা হল ?'

বকুল মাথা নেডে বলে—'না হিমুবাবু তা নয়, এর ভেতর কোনও ভুল বোঝাবুঝি ছিলনা।' পরিষ্কার গলায় বেশ থেমে থেমে অথচ জোব দিয়ে বকুল বলে চলে—'মারামারিটা যখন হয়েছিল তখন ত দু'জনেরই মন ভালভাবেই জানতেন !'

—'না বকুল, তুমি ভুল করছ।'

বকুল বলল—'কি বলবেন আমি জানি, ব্যোমকেশ আমাকে বলেছে, কি জন্যে যে ঝগড়া বাঁধল ও পরে কি হল সবই শুনেছি। ব্যোমকেশ একটা ভুল করেছিল…'

আগ্রহ ভরে হিমাদ্রি বলল—'ঠিক বলেছ—ভুল হয়েছিল ওব, একদম ভুল ধারণা—'

বকুল একটু জোর গলায় বলে উঠল—'কিন্তু যে কোন কারণেই হোক

তোমরা একদিন না একদিন এইভাবেই একটা হেস্ত-নেস্ত করে নিতে— টাকাটাই আসল কারণ নয়।'

—'নিশ্চয়ই, এই টাকা নিয়েই ত গোল বাধল।'

—'ঝগড়া করার জন্য সব কিছুই অছিলা হয়ে উঠতে পারে।'

হিমাদ্রি মৃদু গলায় বলে—'কিন্তু ব্যোমকেশ আর আমি দু'জনে বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'

—'বন্ধুত্ব! কিসের বন্ধুত্ব? নিজেদের কাছেও আপনাদের এতটুকু সততা নেই, একসঙ্গে ঘোরেন তার ভেতর লড়ায়ের সন্ধানেই থাকেন, আপনি চান ওকে হাত করতে ও চায় আপনাকে হাত করতে—এই সংঘর্ষ নিয়তই চলছে, আর যে কোন অস্ত্রেই অপব পক্ষকে ঘাল করতে আপনারা কেউই কুণ্ঠিত নন।'

হিমাদ্রি বেশ চটে গেছে, এই কচ্ কচি ওর ভাল লাগেনা, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—'তুমি আমাব সম্বন্ধে কি ভাব বকুল, তা জানি, একদিন ব্যোমকেশের কাছেও কিছু কিছু শুনেছি, তোমার ধারণা আমি ঠক, জুযাচোর ও বদমাযেস।'

বকুল তার চশমাটি খুলে নিযে শাড়ির প্রান্ত দিয়ে মুছছিল, ওর কথা যেন তার কানেই গেলনা।

বকুল কোন উত্তর করল না, যেন হিমাদ্রির উক্তিটাই নীরবে সমর্থন কবল, মাথা নিচু করে চশমা নিয়েই ব্যস্ত বইল—হিমাদ্রি তাই একটু নবম গলায় বলে—'ঐ ত, আমি জানি বরাবর এই তোমার ধারণা। কিন্তু যা সত্য, তাতে তোমার বিশ্বাস নেই, কেমন বিশ্বাস কববে—?'

বকুল বেশ নির্লিপ্ত ভাবেই বলে—'আপনার সত্যটা কি ও কোথায়, শোনা-ই যাক।'

হিমাদ্রি কিন্তু বলতে পারেনা, কেমন যেন খেই হারিয়ে গেল, যেন

ইতিমধ্যেই ওর বলা হয়ে গেছে কোথায় ওর সত্য, যা কিছু বলার ছিল সব কথাই ফুরিয়ে গেছে, আর তার পরিবর্তে বকুল ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ও কি, এতদিন ওর যা ধারণা ছিল বকুলের ছবি তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অথচ নিখুঁত—আর যেন তারই প্রতিকৃতি। হিমাদ্রি তাই নিষ্প্রাণ গলায় বলে—'কিন্তু আমাদেব বিরোধ মিটে গেছে, সেদিনের ঘটনা আমরা দু'জনেই মন থেকে মুছে ফেলেছি।'

আইসক্রীমের তলানিটুকু চামচ দিযে কায়দা করে তুলে নিয়ে কাপটি একটু সরিয়ে রেখে, রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বকুল বলে—'কিন্তু হিমুবাবু —আপনি আমাদের ছেডে দিন না একেবাবে, ওকে আর আমাকে একা ছেড়ে দিন—আমরা দু'জনে আমাদের নিজেদের মনোমত জীবন গড়ে তুলি, আপনাদের এই মন কষাকষির চাইতে কি তার মূল্য বেশি নয়?'

—'মন দেয়া নেয়া নিশ্চয়ই মূল্যবান, আমিও মানুষ বকুলরাণী, কেন আমি আসব বাধা দিতে তোমাদের সুখের দিনে—'

—'ব্যোমকেশ আর আমি কাবখানা আর মজুব নিয়ে দিন কাটিযে দেব, আপনাদের ওসব শৌখিন বাজনীতি আমাদের চলবে না, আমাদের গতর দিযে রাজনীতি করতে হবে, শুধু মগজ নিয়ে নয। আমরা একেবারে মাটির লোক, আপনাবা কিন্তু ওপরদিককাব মানুষ, তাই মগজ নিয়েই কাববার। আপনি ভাবতে পারেন, বেশ ভালভাবেই পাবেন, চতুব লোকেব মতই কাজ করে যান। আপনি ত আমাদের শ্রেণীর নন। আমরা বিভিন্ন প্রাণী। আপনি মোটর কিনেছেন, যত দিন যাবে ততই আরও বড হবেন, আপনি আপনার কাজ করুন। আমরা আমাদের জীবন নিয়ে যতটা পাবি কবি, এর ভিতব আব আপনি এসে ভীড় বাড়িয়ে লাভ কি? আপনাবা মিত্র নন, পরস্পরের শত্রু—আপনারা যদিও ঝগডা মিটিয়ে থাকেন, তাহলে এখন করবেন কি?'

হিমাদ্রি শুধু বলল—'একবার ভাগ্যটা পরীক্ষা করব!'

বকুল বলল—'পরীক্ষার এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সে কোথায়? জানেন কিছু?'

হিমাদ্রি মুখখানি কাঁচুমাচু করে বললে—'কি জানি, কিছুইত বলেনি—'

হিমাদ্রি সবই জানে, অথচ বকুলকে বলতে চায়না, তা জানালে ওদের জীবনের যে ছবি বকুল এঁকেছে তা আরও সার্থক ও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

বকুল অপেক্ষা করেছিল ওর মুখে কথাটা শোনার জন্য---অনেকক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে হিমাদ্রি বলল---'হয়ত ব্রিজের ওপর গেছে, সেখানে বোধ হয় কিছু মিটিং-এর ব্যবস্থা আছে।'

—'আপনি যাবেন না? আপনাকেও ত যেতে হবে?'

—'হয়ত যেতে পারি, তবে আমি কিছু কথা দিইনি।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল বকুলরাণী, বলল—'বিপ্লব! একদল পাগল ও দেউলে-লোক নিয়ে বিপ্লব আনার চেষ্টার মত বাতুলতা আর কি হতে পারে? পুলিসও তাই আজ আর আপনাদের ভয় করে না, তারা জেনে গেছে কি আপনাদের মূল্য, রেসের মাঠে বা হংকং-এর পরেও ওদের চর নিশ্চয়ই থাকে। আপনারা কি চান ওরা জানে।'

হিমাদ্রি এ-কথার কোন জবাব দেয়না, সে নীরব থেকে বকুলরাণীর সকল প্রশ্নেরই উত্তর এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, পাছে ওর মুখভঙ্গীতে মনোভাব প্রকাশ পায়, ব্যোমকেশের নূতনতম 'আইডিয়া' ফাঁস হয়ে যায়, তাই এই প্রচেষ্টা।

কিন্তু বকুলরাণী সহসা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাল হয়ে বসে, হিমাদ্রি ওর কাছ থেকে কি গোপন করছে তা বোঝার চেষ্টা করে।

বলে ওঠে—'হিমুবাবু, ব্যাপারটি কি, কি মতলবে ও ঘুরছে কিছু জানেন ?'

হিমাদ্রি আইসক্রীমের শেষাংশটুকু নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল, বলল —'চল একটু হাঁটা যাক, গল্পও চলবে—'

বাইরে বেরিয়ে এসেও পীড়াপীড়ি করে বকুল, বলে—'বলুন না হিমুবাবু। নতুন খবর !'

হিমাদ্রি মৃদু গলায় অন্তরঙ্গতার সুর এনে বলে—'আমি ত ওকে বার বার বললাম, এ নিছক পাগলামি, উল্‌টে বিপদ ডেকে আনা হবে…'

—'কিন্তু, আপনিও ত ওর সঙ্গেই আছেন, এর ভিতরেই আছেন, কেমন নয় ?'

—'না আমি সত্যি বলছি, ওকে আমি বারণ করেছিলাম, ও শুনবেনা কিছুতেই, এবার একটা কিছু করার জন্য ও পাগল হয়ে আছে—!'

—'হিমুবাবু, আপনাকে বাদ দিয়ে, আপনার সাহায্য না নিয়ে ও কিছু করবে বলে ত আমার মনে হয়না, ও যে এতদিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার ভিতর এই সবও একটা কারণ নিশ্চয়। আপনি এর ভিতর মাথা না দিলেই সব বান্‌চাল হয়ে যাবে।'

—'সব জানি বকুল, আমি ওকে বলেছি এখনও সময় হয়নি, বড় পার্টি আমাদের কোন সাহায্য করবেনা, স্পষ্ট বলে দিয়েছে, যা কিছু করবে সবই ব্যোমকেশের নিজের দল, কি তাদের শক্তি—কিন্তু ও শুনতে চায়না—'

নীরবে ওরা পদ্মপুকুরের দিকেই অনেকখানি হেঁটে এল। বকুলের মনে নানা চিন্তা, আর হিমাদ্রি কি ভাবছে কে জানে। দোকান পসারের আলো ও ব্যস্ততা, ট্রামের আওয়াজ, বাসের কনডাক্‌টারের চীৎকার সব জড়িয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে এটা শহর, কলকাতার একটা বৃহৎ অংশ। নগরীর স্নায়ুশিরা তাই এত রাত্রেও প্রাণ-চঞ্চল।

হিমাদ্রি সহসা বলে ওঠে—'এই সব থামিয়ে ও জয়ী হবে এ-কথা চিন্তা করাও নির্বোধের কাজ, কিন্তু ব্যোমকেশ এঁচে আছে 'জেনারেল স্ট্রাইক' বাঁধিয়ে ও কাজ সারবে।

সহসা বকুল হিমাদ্রির হাতখানি ধরল, প্রথমটায় হিমাদ্রি ভেবেছিল ফুটপাথে ওঠার জন্যই এই অন্তরঙ্গতা, নইলে বকুল চিরদিন ওর কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, একটা বি াট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে হিমাদ্রিব সঙ্গে—সেই বকুলই আজ মিনতির স্বরে বলে—'সবই বুঝলাম হিমুবাবু, কিন্তু আপনিই পারেন ওকে ঠেকিয়ে রাখতে, এভাবে আগুনের ভিতর ওকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবেন না। আপনি সঙ্গে না থাকলে ও কিছুই করতে পারবেনা। ওকে এতটুকু উৎসাহ দেবেন না।'

তাবপর একটু দাঁড়িয়ে হিমাদ্রির মুখের দিকে আকুল ভাবে তাকিয়ে বকুল বলে ওঠে—'হিমুবাবু, বলুন ওকে থামাবেন, আপনি ওব 'প্ল্যানে' যোগ দেবেন না! বলুন—'হিমাদ্রি বকুলের আকুলতা বোঝে, কিন্তু সে অত সহজে বিগলিত হবার ছেলে নয়—তাই শুধু বলে—'আমার ত আর খেয়ে বসে কাজ নেই, ও পাগলামী করার অবসর আমার নেই।'

—'আমি তা জানি, তবু কথা দিন যে আপনি ওকে থামাবেন, উৎসাহ দেবেন না। যদি প্রকৃতই ওব বন্ধু হন, তাহলে কথা দিতে আপত্তি কি ?'

হিমাদ্রি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে—'বেশ বকুল আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কথা আমি রাখব—'

উভয়ে এগিয়ে চলে, বকুল বলে—'হিমুবাবু! আপনাকে কিছু বলার আমাব ভাষা নেই।'

বকুল বিশ্বাস করল হিমাদ্রিকে—সে ভাবল ওদের এই সন্ধ্যার সাহচর্য অবশেষে ফলপ্রসূ হয়েছে। একটা সংঘষের হাত এড়িয়ে যাওয়া গেছে,

হিমাদ্রির সঙ্গে আজ একটা বোঝাপাড়া করবে ঠিক করেছিল বকুল, তার পরিণতি হল অন্যভাবে।

পরিবর্তে সে হিমাদ্রির আত্ম-বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলল আর তারই নিরাপদ আশ্রয়ে ব্যোমকেশকে ছেড়ে দিল, তার ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণের ভার হিমুর হাতেই তুলে দিল। বকুলরাণী আজ হিমাদ্রিকে স্বীকার করে নিয়েছে। কি যে ব্যাপারটি ঘটল তার বিশ্লেষণ করতে চায় না হিমাদ্রি, চায় বহুমূল্য রত্নের মত নিরাপদ স্থানে তাকে সযত্নে তুলে রাখতে, বা সামর্থ্য-বর্ধক হাতিয়ার হিসাবে বিপদের দিনে ব্যবহার করবে।

দীর্ঘকাল পরে আজ সর্ব প্রথম হিমাদ্রি অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করল।

হিমাদ্রি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই সে এবার ব্যোমকেশকে সাহায্য করবে না, বকুলরাণীর কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছে তা ভাঙবে না। তাই ব্যোমকেশ যখন ওর পাশে বসে কখনও রাগ দেখিয়ে, কখনও অনুনয় করে, কখনও উদ্বেগভবে মিনতি করে কথা বলছিল, তখন হিমাদ্রি নীরব।

ব্যোমকেশ বলছিল—'শোন হিমু! আমার কথাটাই আগে শোন, সমস্ত ব্যাপারটি আমি ছকে রেখেছি, কিছুই এর মধ্যে ভয়ের নেই, কেন যে তুই এত ভয় খাচ্ছিস বুঝি না। একেবারে জলের মত সোজা—'

হিমাদ্রি বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। হিমাদ্রির হাই উঠছে, ব্যোমকেশ ওদিকে বকে চলেছে, ওর সেই প্রকাণ্ড মুখখানা উত্তেজনায় কাঁপছে, কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, হাত নেড়ে অঙ্গ-ভঙ্গী করে হিমাদ্রির ক্ষীণ প্রতিবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করছে।

ব্যোমকেশ বলে—'আমি যে তোকে কোন পার্ট নিতে বলছি তা নয়। আমি বললে তুই না বলতে পারবি না জানি, তাই তোকে আমি 'ইমপসিবল রিকোয়েস্ট' করছি না, আমি চাই তুই শুধু তোর গাড়িটা ধার দিবি, নিজে চালিয়ে সোজা ব্যাঙ্কের দরজায় হাজির করবি—বড় জোর দু'চার মিনিট 'ওয়েট' করতে হবে।'

—'না ভাই, আমি পারব না।'

—'আরে শোনই না সবটা, আমার জন্য তুই একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি কাজ সেরেই বেরিয়ে আসব, তারপর আর কি—গাড়িটা কিন্তু ল্যাম্প-পোস্টের ধারে রাখবি। আর কিছু ত চাই না আমি, এইটুকু পারবি না, এর মানে নয়, যে, তুই এর ভেতর আছিস।'

হিমাদ্রি দৃঢ় কণ্ঠে বলল—'আমি ত বলেইছি—আমি পারব না—'

হিমাদ্রি তার সেই প্রতিজ্ঞাকে বর্মের মত ব্যোমকেশ ও তার মধ্যে তুলে ধরল। বকুল ওর সম্বন্ধে কি ভাবে, সে কথা মনে হল—ও বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, প্রতিশোধপরায়ণ। এখন এ সবের অবসান ঘটিয়ে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। বকুলকে দেখিয়ে দেবে যে তার ধারণা ভুল। বকুল দেখবে হিমাদ্রি যা বলে তা রাখে, আর তার চরিত্রের এইটুকু সততা থেকে কোনমতেই কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না।

ব্যোমকেশ কিন্তু সর্ব শরীর ও মন দিয়ে ওকে জয় করবার জন্য লেগেছে, তার মনে এক আত্ম-বিশ্বাস জেগেছে, কারণ মাত্র কিছুদিন পূর্বেই শারীরিক শক্তিতেও সে হিমাদ্রিকে জয় করেছে—সেই ত' একটা সুবিধা। সেই দিনের ঘটনায় ওর মনে সাহস এসেছে। নিজেকে নূতন দৃষ্টিতে দেখছে—আর এই পরিকল্পনা ওর দীর্ঘদিনের চিন্তার ফলে এমন রূপ পেয়েছে। কতদিন, কত ভাবে ও সমস্ত জিনিসটি ভেবেছে—আজ তার সাফল্যজনক পরিণতির ভার ওরই হাতে।

ব্যোমকেশের এই মনোভাব নূতন, হিমাদ্রির চোখে তা ধরা পড়ল, যেন একটা দম্ভের অভিব্যক্তি। বিছানায় টান হয়ে শুয়ে ব্যোমকেশের পানে চোখ মেলে তাকায়, ভাবে কোথায় তার দম্ভের উৎস। হিমাদ্রি বুঝেছে কোথায় পেল ব্যোমকেশ এত শক্তি, এত সাহস, এই আত্ম-বিশ্বাস।

হিমাদ্রি বিছানা থেকে উঠে বসতে চায়, এই ভাবে শুয়ে থাকা কেমন যেন বিশ্রী লাগে, তবু উঠতে ইচ্ছা করে না। হিমাদ্রির, সে ব্যোমকেশের মুখের দিকে আবার তাকায়, সে মুখে যেন গর্ব ও বিজয়ের আনন্দ প্রতিভাত। ওর দম্ভভরা নির্বোধের মত কথা সবই হিমাদ্রির কানে যায়। ওদের অতীতের আনন্দ ভরা দিনের কথা, সাম্প্রতিক বিরোধ ও পুনর্মিলনের কথাও হয়।

সহসা হিমাদ্রির অত্যন্ত রাগ হয়। ব্যোমকেশকে একটা ধাক্কা দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা ওর মুখের পানে তাকিয়ে বলে—'আমি ভাই তোমাকে স্পষ্টই বলেছি পারব না, আবার বলছি পারব না।'

কিন্তু ব্যোমকেশ এই প্রত্যাখ্যান গ্রহণ করে না। ভাবে এ বুঝি ওকে লক্ষ্য করে সামান্য ধাক্কা—এতে ওর লাগে না, কারণ ধাক্কাটা লক্ষ্যস্থলে লাগে না। ওর গায়ে সেটি একটু মৃদু টুস্‌কি, ওর মনেও ধাক্কা লাগে না। সে আরও এগিয়ে এসে নূতন করে বলে—'দেখ হিমু, ড্রাইভ করার লোক পাওয়া যায়। গাড়িও পাওয়া যায়, আগে যা করা হত সেইভাবে—অপরের গাড়ি চুরি করে নিয়ে কাজ সারা যায়। সেটা নিরাপদও বটে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুই আমাদের সাহায্য করবি। তুই 'লাকি', এমন পয়মন্ত লোক আমি দু'টি দেখিনি। তুই যা ভাবিস তাই হয়। সেই জন্যই তোকে আমি চাই হিমু! তোকে সাহায্য করতেই হবে।

হিমাদ্রি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে—'আমি কি বলছি এতক্ষণ?'

ব্যোমকেশ কাছে এগিয়ে এল—এখন ব্যাপারটি উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ এনেছে, ব্যোমকেশের সর্ব দেহ-মনে ঐ এক চিন্তা, তাই সে কথাও বলছে সর্বশরীর দিয়ে—হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে, অঙ্গ-ভঙ্গী করে, মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অবশেষে বলল—'তোকে সাহায্য করতেই হবে।'

হিমাদ্রি একরকম জোর করে ব্যোমকেশকে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে —'কতবার বলব, বলেছি ত আমি পারব না, পারব না—পারব না—'

ব্যোমকেশ কিন্তু চটে না, হিমাদ্রির মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অট্টহাস্য করে ওঠে, বলে—'তোর যা আছে বলে যা, যা গাল দেবার দে— তারপর কথা হবে।' এই বলে সে হিমাদ্রির পিঠ চাপড়ে দেয়।

হিমাদ্রির রাগে সর্বশরীর জ্বলে যায়। ব্যোমকেশের কথায় আর কোনদিন এত রাগ হয়নি তার। সে অবসন্ন চিত্তে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে থাকে। শুনতে পেল ব্যোমকেশ বলছে— 'আমি জানতুম তুই আমার সঙ্গে থাকবি, তুই আমাকে ছাড়তে পারবি না।'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হিমাদ্রির কানে ভেসে আসে ব্যোমকেশের অনুনয় —'হিমু, তুই হলি 'জন্ম জুয়াড়ি', জীবন নিয়েই এতদিন আমরা জুয়া খেলে এসেছি, এবার খেলা নতুন পথে। তুই বলেছিলি, টাকা না হলে কিছু হবে না ব্যোমকেশ, পার্টি গড়তেও টাকা চাই, চালাতেও টাকা চাই— হাজার হাজার টাকা—সে টাকা আমি পাব কোথায়, আমার প্ল্যান সব রেডি। টাকা কি ভাই উড়ে আসবে—টাকা পেতে গেল বিপদ আছে, সে বিপদের ঝুঁকি তুই-ই নিতে পারিস, তুই সঙ্গে থাকলে তবে ত আমার ভরসা—তারপর দেখ, টাকা পাবলিকের, কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। ব্যাঙ্কের টাকা নিলে ক্ষতি কারোই হবে না, অথচ আমাদের কার্যসিদ্ধি—ভেবে দেখ কতদিন কতবার আমরা বলেছি, ভালমন্দ সব কিছু কাজই দু'জনে করব—'

হিমাদ্রির মনের কোণে একটা ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে আসে, সত্যই যেন কবে এই রকমই একটা প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল—ব্যোমকেশের যুক্তি ধারালো না হলেও হৃদয়ে বাজে—বকুলের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আছে—বকুলরাণীকে দেওয়া কথা বুঝি আর রাখা যায় না। হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল, তারপর কি ভেবে বলল—'এর ভেতর আর কে কে আছে?'

তার মুখ ম্লান, বিবর্ণ। কপালে স্বেদবিন্দু, গলার স্বর কাঁপছে। কেমন একটা দুর্বলতা!

ব্যোমকেশও লক্ষ্য করল এই বিকৃতি। ভাবল হিমাদ্রি হয়ত এতক্ষণ সমস্ত বিষয়টি বিচার করছিল, তলিয়ে দেখছিল, তাই এই ক্লান্তি। সে উৎসাহিত হয়ে বলে—'হিমু, সব কথাই তুই তলিয়ে দেখিস, ভাবিস। বেশ ত যদি কিছু সাজেসন থাকে ত বল—'

হিমাদ্রি পুনরায় বলে—'আর কে কে আছে এর ভেতর?'

—'শুধু তুই আর আমি।'

—'আর কাউকে বলিস নি ব্রিজের আড্ডায়?'

—'ওঃ ওদের? না, ওদের শুধু বলেছি তৈরি থাকতে, একটা বিরাট কাণ্ডের অপেক্ষায় বসে থাকতে।'

হিমাদ্রি বলে—'ও, তাহলে শুধু আমরা দু'জন?'

—'হ্যাঁ, তুই আর আমি হিমু, আর কেউ নয়।'

হিমাদ্রি ঘরটিতে পায়চারি করে, ব্যোমকেশ উৎসুক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রত্যাশাভরা চোখে। হিমাদ্রিকে অতীতের সেই শক্তিমান তীক্ষ্ণধী পুরুষ বলেই মনে হয়। পুরানো দিনের হিমু আবার যেন ফিরে এসেছে। ব্যোমকেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

হিমাদ্রি অবশেষে ব্যোমকেশের দিকে ফিরে বলে—'লোকেশনটা একটু বুঝিয়ে দে ত—'

ব্যোমকেশ টেবিলের ধারে হিমাদ্রিকে টেনে নিয়ে হাতে আঁকা

ম্যাপ দেখায়—বোঝাতে থাকে—'সকালের দিকে এই অঞ্চলে তত ভীড় থাকে না, ব্যাঙ্কটায় টাকা আসে ঠিক সাড়ে নটায়—পিছনেব রাস্তার এই বটগাছ—এই হল ল্যাম্প-পোস্ট—।'

হেমন্তের শেষ সপ্তাহ, পৌষ আসন্ন, শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে, উত্তরে হাওয়ায় গায়ে কাঁপন লাগে, সকাল সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়ে, তখন আর কাছের লোককেও অনেক সময় চেনা যায় না, নদীতে জাহাজ ঘাটায় জাহাজেব মাস্তুল ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আকাশেব সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, এই সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, ফলে শীতও একটু বাড়ল, আকাশও মেঘ ভারাক্রান্ত হয়ে রইল, পরদিন প্রাতেও সূর্য উঠল না, আকাশ মেঘ-মলিন রইল, যেন রাতের ছায়া প্রাতে নেমে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, এমনি থমথমে ভাব শহবের ওপব, এর ভেতর দিযেই চলেছে ট্রাম ঘন্টা বাজিয়ে, গ্রাম ও সহবতলি থেকে কেবানী কুড়িয়ে নিয়ে আসছে শহরেব মর্মকেন্দ্রে, ছুটে চলেছে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ট্যাক্সিওলার দল। চীৎকার করে হাকছে বাসেব বিদেশী কনডাক্টর, পথচাবীকে প্রলুব্ধ করছে খালি গাডিতে উঠে আসাব জন্য। কুযাশাব জড়িমা সত্বেও কর্মব্যস্ত শহবের প্রাণ দ্রুতস্পন্দিত।

গঙ্গার ধার দিয়েই পাশাপাশি চলে গেছে স্ট্র্যাণ্ড রোড। খিদিরপুর থেকে হাওড়া টানা রাস্তা। জাহাজের ধোঁযা ও আকাশের মেঘ একাকার হয়ে গেছে। সেকালের মেটকাফ হল আর একালের রেলিব্রাদাসের অফিসের মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে হেযার স্ট্রীট। এই রাস্তাটি চিরদিনই কেমন বিষাদাচ্ছন্ন, না আছে জমকালো দোকান, না আছে আলোর বাহার, পথও তেমনি দৈর্ঘ্যে ছোট্ট। এরই এক পাশ

দিয়ে বেরিয়েছে চার্চ লেন। এ রাস্তাটিও তেমন জনবহুল নয়, সকাল বিকাল কেরানীদের আসা-যাওয়ার সময় যা কিছু লোকজন দেখা যায়, অন্য সময় ঘুরে বেড়ায় উর্দী পরা পিয়ন চাপরাসী আর বিদেশী ফেরিওয়ালার দল। এই রাস্তাতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক বিরাট বাড়ির নীচের তলার তিনখানি ঘর নিয়ে বাঙালী ব্যবসায়ীর দল বঙ্গজননী ব্যাঙ্ক খুলেছেন। নূতন হলেও পরিচালকদের ব্যবস্থার গুণে ব্যাঙ্কটি অল্পদিনেই একটু একটু করে উন্নতি করছে। আশপাশের আপিস আদালতের লোকজন, ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা এইখানেই টাকা গচ্ছিত রেখেছেন। আর আছে ম্যানেজিং-এজেণ্ট কর মণ্ডল কোম্পানিব পরিচালিত অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোটা মোটা টাকা। ব্যাঙ্কটিতে ঢোকবাব পথ বড সংকীর্ণ, নোঙরাও বটে। অপর দিকটায় দুপুরে দরওয়ানদের ছেলেমেয়েবা শুয়ে থাকে, বৌ-এরা রোদ পোহায় আব পরস্পরেব উকুন বাছে। আর এদিকে কাউণ্টারে পেয়াদা চাপরাসী প্রভৃতির ভীড জমে। কাউণ্টারে বসে তিনটি কেরানী। আর একটু দূরে বসে অধিকতর দু'জন পদস্থ কর্মচারী নোট গোনেন, টাকা বাজান, সই করেন। লেনদেনের ভার হয়ত তাঁদেবই হাতে। আর একটু দূরে ভেনেস্তা কাঠের পার্টিশান ঘেরা ঘরটিতে বসেন ব্যাঙ্কেব ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের দু'টি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে দু'টি প্রহরী। একজন কোমরে ভোজালী আঁটা নেপালী আর একজন বৃদ্ধ শিখ, হাতে তার এক নলা বন্দুক, বুকে তার কার্টিজের মালা পৈতের মত ঝুলছে। ছোট ব্যাঙ্ক হলেও লেনদেন হয় অনেক টাকার। বিশেষতঃ প্রতিমাসের চোদ্দ তারিখে অনেক টাকা আসে। ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলের ও ভারতী কেমিক্যালসের মাইনে হয় পনের তারিখে, চোদ্দ তারিখে তাদের লোক এসে টাকা উঠিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং চোদ্দ তারিখের দু'একদিন আগে থেকেই ব্যাঙ্কে টাকা এসে জমে। প্রতিদিন প্রথমেই

শিখ দরোয়ানটি কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ দরজা টেনে খোলে, নেপালী ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ভিস্তি সামনের ফুটপাতে জল দিয়ে যায়। ঠিক ন'টায় একে একে কেরানীরা আসতে আরম্ভ করে। চোদ্দ তারিখে কেরানীদের অনেকেই একটু সকালে আসে। বারোটা থেকে একটার মধ্যে মিলের বা কেমিক্যাল কোম্পানির কেশিয়াররা এসে টাকা নিয়ে যান।

কর মণ্ডল কোম্পানির চেষ্টায় এই ব্যাঙ্কটি ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের কিছু পরে খোলা হয় একজন লাঞ্ছিত দেশকর্মীর প্রচেষ্টায়। সেই কারণেই বহু ছোট-খাটো স্বদেশী প্রতিষ্ঠান এখানে কিছু না কিছু টাকা রাখেন। কর মণ্ডল কোম্পানির যথেষ্ট সুনাম। বহুবিধ অর্থনৈতিক সংকট ও দুঃসময়ের ঘোর কাটিয়েও তারা দাঁড়িয়ে আছে আর এই কারণেই তাদের সুনাম অটুট আছে। কিন্তু আজ এই চোদ্দই নভেম্বরের অন্ধকার বিমলিন সকালে বঙ্গজননীর ব্যাঙ্ক বিপন্ন, অর্থনৈতিক জগতের কোন আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার ফলে নয় কিন্তু।

হেয়ার স্ট্রীটের দিক থেকে একখানি ছোট কালো গাড়ি এদিকেই এগিয়ে আসছে আর অপর দিক থেকে এক দীর্ঘকায় পুরুষ চার্চ লেনের এই ব্যাঙ্কটিতে এসে ঢুকছে। তার পরণে পায়জামা, গায়ে একটি মলিন পাঞ্জাবি, মাথায় একটি পেশোয়ারী টুপি। বোঝার উপায় নেই লোকটি কোন জাতের।

সময় তখন ঠিক ন'টা চার। আর এক ঘণ্টা পরেই কোলাহল ও কলরবে এই ছোট্ট ব্যাঙ্কটি মুখরিত হয়ে উঠবে। হাজার হাজার টাকার লেনদেন হবে। করকরে নূতন নোটগুলি আগামী দিন হাটবাজারের সাধারণ লোকদের হাতে গিয়ে পড়বে। টাকা সাজান রয়েছে। সুদৃশ্য কাগজের বাণ্ডিল। কিছুক্ষণ পরেই ছোট ছোট থলের ভেতর দিয়ে অন্যত্র চালান হয়ে যাবে। পাশের গীর্জার ঘড়িটা পনের মিনিট অন্তর

বাজে। ঘড়ির আওয়াজ মেঘের জন্য কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। কিন্তু হিমাদ্রি ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে মোটর চালাতে চালাতে সে আওয়াজ শোনে। সে খুঁজে পায়না কোথায় পিছনের রাস্তার বটগাছ আর কোথায় ল্যাম্প-পোস্ট। গীর্জার কাছাকাছি গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হিমাদ্রি গাড়িটিকে পার্ক করে। কেন না এখনও ব্যোমকেশের দেখা নেই। ব্যাঙ্কের তৃতীয় দরজাটি এখান থেকে দেখা যায়না। মেঘলা ভাব যদিও ওদের পক্ষে সুবিধাজনক তবুও হিমাদ্রির কেমন আতঙ্ক হয়। ব্যোমকেশের পরিকল্পনা তখন ওর মাথায় আগুন জ্বেলেছে। ব্যোমকেশকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে ও যখন গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে তখনই দেখা গেল এক বিরাট চেহারা ব্যাঙ্কের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকছে। হিমাদ্রি বোঝে যে লোকটি ব্যোমকেশ। শুধু নিশ্চিত হবার জন্যে গাড়ির দরজা খুলে ফেলে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখে লোকটি ব্যোমকেশ কিনা। গাড়ির এঞ্জিন তখনও চালু।

ব্যোমকেশ চার্চের ঘড়িতে ন'ন'টা বাজতে শোনে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। ভাল করে দেখে নেয় হিমাদ্রির গাড়িটা ঠিক কোনখানে দাঁড়িয়ে। পাঞ্জাবির পকেটে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে। ব্যোমকেশ বোঝে এটি হিমাদ্রির গাড়ি। ব্যোমকেশের ইচ্ছে হয় হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে হিমাদ্রিকে। কিন্তু পূর্বেই স্থির হয়েছিল কোনোরূপ ইশারা ইঙ্গিত চলবে না। তাই ইতস্ততঃ করে ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকে পড়ে। সে হিমাদ্রিকে বিশ্বাস করেছে। সে স্থির নিশ্চয় এ-গাড়িখানি হিমাদ্রির। কিন্তু ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকে পড়ে তার সংশয় জাগে।

গাড়িখানি কি হিমাদ্রির? ওর ভিতরকার ঐ অস্পষ্ট ছায়া কি হিমু? একবার গিয়ে ভাল করে দেখে আসুক না কেন? কিন্তু কেন সে ইতস্ততঃ করছে? এ-রকম ভীত হবার কারণ কি? কেন সে এত ব্যাকুল হচ্ছে? কেন? কেন···তাড়াতাড়ি করে কাজ সেরে নিতে

হবে। যাও হাতিয়ে নাও। সাহস করে এগিয়ে যাও। এখুনি জায়গাটি ভিড়ে বোঝাই হয়ে যাবে। এইত সময়। ন'টা পনেরতে ত হিমাদ্রির গাড়ি নিয়ে আসার কথা। ন'টা কুড়িতে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। হিমাদ্রি আর এক মিনিটও অপেক্ষা করবেনা। চার্চের ঘড়িতে সুরেলা আওয়াজ করে স'নটা বেজে গেছে কখন।

কাউণ্টারের কাছে পৌঁছে যুক্তি যেন ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বলে, যাও ভাল করে দেখে এস হিমাদ্রি এসেছে কি না। বিবেক আতঙ্কে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অপবাধের গুরুত্ব মনকে দংশন করে। ওর অশান্ত আত্মা ওকে বাধা দেয়। কিন্তু ও ত এসে গেছে। এই কাউণ্টার, ওপারে টাকা। এত কাছে, এত সহজ...একটু এগিয়ে গিয়ে রিভলবাবের ভয় দেখিয়ে টাকাগুলি হাতিয়ে নিয়ে পালাতে হবে। ব্যোমকেশ এগিয়ে চলে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়। হিমাদ্রির গাড়িতে ও গায়ে এসে জল লাগে। ঠাণ্ডায় তার গায়ে কাঁপন লাগে। একটা দীর্ঘ পুরুষকে সে যেতে দেখেছে। এখন সে পুতুলের মত স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে। ব্যোমকেশ দৌড়ে এলেই স্টার্ট দিয়ে পালাবে। স্টীয়ারিং হুইলে আর ক্লাচে ওর দু'টি হাত লাগান। এঞ্জিন ধিকি ধিকি করে চলছে। অসহিষ্ণু হিমাদ্রি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সে লম্বা লোকটা ব্যোমকেশ ত ?

এরপর বোধ হয় দশ সেকেণ্ডও কাটে নি কিন্তু হিমাদ্রি স্বাভাবিক সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সেই কয়েকটি মুহূর্ত যেন দীর্ঘ দশ মিনিট বলে মনে হল। আব উদ্বেগ ও বিপদাশঙ্কা তার স্নায়ুকে আঘাত করল। সে আর সতর্ক হয়ে থাকতে পারে না। সহসা তার মনে পবিবর্তন জাগে। ব্যোমকেশের সকল পরিকল্পনা ও চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার সে চেষ্টা করে। এইত নিজেকে মুক্ত

করার অবসর। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার এই সুযোগ। পথ ওর উন্মুক্ত। কিন্তু সে সুযোগ যেন ও নিতে পারে না। সে যে ব্যোমকেশেরই একজন। তাই ব্যোমকেশের কথাই ভাবতে হবে। তার চিন্তা আতঙ্কে পরিণত হয়। আর কিছুতেই তা মন থেকে দূর করা যায় না। অন্তরে দারুণ শঙ্কা জাগে। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, যে ব্যোমকেশ নিরাপদে আছে, এখনই এই মুহূর্তে হয়ত এসে পড়বে। কিন্তু ব্যোমকেশ চলে যাবার পর এতখানি সময় কেটে গেছে যে ও কিছুতেই ভাবতে পারে না যে ব্যোমকেশ এখনও নিরাপদ। তার আতঙ্ক তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তার ধারণা হয় ব্যোমকেশের উদ্দেশ্য হয়ত সফল হয় নি। আতঙ্কের পূর্ণ জোয়ারে এই চিন্তাই হিমাদ্রির মাথায় সর্বোচ্চ হয়ে উঠে। ব্যোমকেশকে মনে মনে অভিশাপ দেয়। এইরকম একটা পরিকল্পনা করার জন্য তার মনে একটা নিদারুন অনুশোচনা এল। একটা কেলেঙ্কারি করে তার ভেতর ওকে জড়িয়ে ফেলেছে ব্যোমকেশ এই কথা ভেবে রাগে ওর সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। এই কাজটা সম্পন্ন করবার দুঃসাহস ব্যোমকেশের মত নির্বোধের মাথায় কে প্রবেশ করিয়ে দিল ? সহসা হিমাদ্রির মনে হল ব্যোমকেশের এই দুঃসাহস ও দম্ভের মূলে আছে সেদিনের সেই বিজয়ের গর্ব।

তৎক্ষণাৎ হিমাদ্রি বুঝতে পারে এই মুহূর্ত হল উভয়ের সাহচর্যের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় কাল। এই সেই মুহূর্ত যার জন্য ওর আত্মা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছে। এই সেই মুহূর্ত যে মুহূর্তে উভয়ের বন্ধুত্ব হয় নিবিড়তর হয়ে উঠবে নয়ত চিরন্তন বিচ্ছেদ এনে দেবে। হয় এদিক নয় ওদিক। হয় ব্যোমকেশের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব অটুট রেখে আজকের এই অপরাধের অংশ গ্রহণ করতে হবে নয়ত তাকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। এ এক নিদারুণ জটিল সমস্যা।

কিন্তু কেন ও তাকে উদ্ধার করবে, কেন তার মুরুব্বিয়ানা মেনে

নেবে, কেন তার আস্ফালন শুনবে, কেন তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে? কি তার পুরস্কার? হয়ত কোন পুরস্কারই জুটবে না! হয়ত অবশেষে মিলবে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড!

ও মনস্থির করল। ক্লাচটাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে ছোট্ট গাড়িটি চার্চ লেন অতিক্রম করে হেস্টিংস-এ পড়ল। তার পরেই স্ট্র্যাণ্ড রোড। স্ট্র্যাণ্ড রো .ডর যানবাহনের ভিড়ে মিশিয়ে গেল হিমাদ্রির ছোট্ট গাড়ি। ব্যোমকেশ ব্যাঙ্কের ভিতর ঢোকবার পর মাত্র একমিনিট সময় অতীত হয়েছে।

যে মুহূর্তে ব্যোমকেশ ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকল তখুনি তার কেমন মনে হয়েছিল হিমাদ্রি হয়ত ওকে ফাঁকি দেবে। হিমাদ্রি গাড়ি এনেছে কি আনে নি তা বোঝা যায়নি বলেই এই ভয়ঙ্কর ধারণা তার মনে আরও নিবিড় হয়ে উঠল। সমস্ত অবস্থাটি ও তলিয়ে ভাবে। ভাবে হিমাদ্রি হয়ত আসে নি। যদিও এসে থাকে হয়ত অপেক্ষা করবে না। মনের ভেতর এই কথাটিই ঘোরপাক খেতে থাকল, ওর পরিকল্পনার এই অংশটুকুই অচিন্ত্যনীয় ছিল। একবার এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল ও ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আশার একটা ক্ষীণ সূত্র ওর পরিকল্পনার ত্রুটি ও ভাবাবেগ ছাড়িয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য ওকে সিদ্ধি করতেই হবে। ও ভাবল যে কোন উপায়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ও পালাতে পারবে।

কাউণ্টারের ভিতর দিয়ে ও সোজা কেশিয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এক সঙ্গে অত নোটের তাড়া দেখে তার হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণিত হল। ঝুঁকে পড়ে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রিভলবারটি বার করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে,—'সরে দাড়ান, সব নোটগুলো আমার চাই।'

কেশিয়ার বেচারা বেঁটে খাটো মধ্যবয়সী মানুষ। টেবিলের ওপর

তাঁর হাত ছিল। ব্যোমকেশ যখন কথা বলল তিনি তখন ভাল করে চশমা এঁটে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর সহসা রিভলবারের ওপর চোখ পড়তেই তাঁর মুখখানি ছায়ের মত সাদা হয়ে গেল। লোকটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। ব্যোমকেশ হাতের কাছে যতগুলি নোটের তাড়া পেল তাড়াতাড়ি তুলে নিল। পাশের টুলেতে যে নোটগুলি রাখা ছিল সেগুলিতে হাত পৌছয় না। ব্যোমকেশ তাই আবার বলল—'ও গুলোও তুলে দিন তাডতাডি।' সে বজ্রমুষ্টিতে বাবুটির একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ঠেলে ফেলে আর দু'চারটে বাণ্ডিল তুলে নেয় তারপর তাড়াতাডি বেরিয়ে আসাব চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে সেই ভীত সন্ত্রস্ত কেশিয়াববাবুটি চীৎকার শুরু কবে দিয়েছেন। অন্যান্য কেরানীবাবুরাও ব্যাপাবটা কি না বুঝেই আরও চীৎকার করছেন। বাইরের কাউন্টাবে একটি চশমা চোখে মেরে দাঁড়িয়েছিল সে-ও চীৎকার শুরু করে দেয। ব্যোমকেশ পালাচ্ছে। ভেনেস্তা কাঠের ঘর থেকে উঁকি মেবে ম্যানেজারবাবু বোঝবাব চেষ্টা করেন ব্যাপারটি কি? একজন কেরানীবাবু কাউণ্টার ডিঙ্গিযে নীচে লাফ মেরে ব্যোমকেশের পথ রোধ করে দাঁডায। ব্যোমকেশ তার দিকে রিভলবার দেখাইতেই লোকটি ভয়ে সরে দাঁডায়। ম্যানেজারও এদিকে এগিয়ে আসছেন তাড়াতাডি। সোরগোল পডে গেছে। সেই চশমা চোখে মেয়েটিও এগিয়ে এসে দাঁডায়। সে চীৎকার করে, "চোর, চোর…ধর ধর।" দ্বিতীয় কেরানীটি কি করবে ভেবে না পেয়ে ব্যোমকেশের মাথা লক্ষ্য কবে হাতেব পেপার ওয়েটটি ছোঁডে। ব্যোমকেশের মাথায় না লেগে পেপার ওয়েটটি কাঁচের সার্শি ভেদ কবে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। তীব্র আওয়াজ করে কাঁচখণ্ড চারিদিকে ছডিয়ে পড়ে। বাইরে রাস্তার লোকে বুঝতে পারে ভেতরে কি একটা চলছে। চারিদিকে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ব্যোমকেশ দরজার কাছে

পৌঁচেছে। কিন্তু চারদিক থেকে তারই কাছে লোক দৌড়ে আসছে পিছনে ও সামনে। নোটগুলোকে জামার ভিতর চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে, সবগুলো তার ভিতর রাখা গেল না। তাই দু'চারটে রাস্তায় ছড়িয়ে দিল। তার পর প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়ে এল…। ব্যোমকেশ দৌড়চ্ছে—কোথায় ল্যাম্পপোস্ট, আর কোথায় গাড়ি। ব্যাঙ্ক থেকে ওর পিছনে পিছনে অনেকেই দৌড়েছে, যারা কিছু জানে না তারাও দৌড়চ্ছে। শিখ দরোয়ানটাও একনলা বন্দুক নিয়ে দৌড়চ্ছে। বৃদ্ধ শিখ ব্যোমকেশকে প্রায় ধরে ফেলেছে। ব্যোমকেশ তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এই সামান্য সময়ের মধ্যে কেরানীরাও এগিয়ে এসেছে। ব্যোমকেশ পাগলের মত দৌড়চ্ছে, কোথায় কালো গাড়ি, কোথায় হিমাদ্রি। কেউ কোথাও নেই। ব্যোমকেশ প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। বৃষ্টিও নেমেছে জোরে। ও যেন একটা প্রকাণ্ড কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে। এমন সময় দূরে একটা গাড়ি দেখা গেল, কিন্তু সে গাড়ি হিমাদ্রির নয়। লোকগুলি কিন্তু এগিয়ে এসেছে। আর তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, বিব্রত ব্যোমকেশ এবার তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরা সবাই মিলে ওকে বাধা দিচ্ছে। রিভলবার দেখে সবাই ইতস্ততঃ করছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সেই বৃদ্ধ দরোয়ান একাবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সে কিছুতেই ওকে ছাড়বে না। সে যেই এসে ব্যোমকেশের হাতটি বাগিয়ে ধরেছে, ব্যোমকেশ নিজেকে মুক্ত করবার জন্য রিভলবার টিপল। রিভলবারের মুখ থেকে সামান্য ধোঁয়া বেরুল আর কিছু আওয়াজ। বৃদ্ধ দরোয়ান গোঙাতে গোঙাতে ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল। ব্যোমকেশ কিন্তু আর দৌড়ল না। তার চার পাশে লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ শিখের মৃত দেহটির দিকে সে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। ক্রমেই লোকের ভিড়

বেড়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে পুলিসের লাল পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। কেস অতি সোজা। সশস্ত্র ডাকাতি, তার সঙ্গে কর মণ্ডল কোম্পানির দরোয়ান হত্যা আর এর উপর বে-আইনি অস্ত্র রাখার দণ্ডটাও ফাউ হিসাবে ঘাড়ে চাপবে।

হিমাদ্রি ধীরে ধীরে যেখানে তা'র গাড়ি রাখা হয় সেইখানে এসে পৌছল। অতীতকালের একটি আস্তাবল বর্তমান গ্যারেজে রূপান্তরিত হয়েছে। দরজার চাবি হিমাদ্রির পকেটে রয়েছে। কুড়ি মিনিট পূর্বে যখন সে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল তখন সে নিশ্চিত ছিল যে তার চলাচল অলক্ষিত আছে। এখন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফিরলেও সে পূর্বাপেক্ষা তৎপর ও সতর্ক হয়েছে। চুপি চুপি দরজাটা খুলে গাড়িটাকে নিঃশব্দে ত ব ভেতরে রেখে দিল। তারপর পা টিপে বেরিয়ে এসে বাসার দিকে চলল। গিন্নিমা সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। হিমাদ্রিকে দেখে বললেন—'আজ খুব সকাল সকাল ফিরেছ বাবা।'

সে-কথার জবাব না দিয়ে হিমাদ্রি বলল—'ব্যোমকেশ কোথায় ?'

—'কোথায় আবার, যেখানে রোজ যায় সেখানেই গেছে, ও আর আমায় জিজ্ঞেস করে লাভ কি বাবা '

—'কোথায় গেছে কিছু বলে গেছে ?'

হিমাদ্রি সাক্ষী ঠিক করে রাখছে।

গিন্নিমা মাথা নেড়ে বললেন—'কিছুই বলেনি বাবা, কবেই বা বলে।'

—'ভাবছিলুম ও কোথায় গেল। এত ওকে দরকার ছিল। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছি। কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে।'

হিমাদ্রি ঘরের ভিতর ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে বেতের চেয়ারটিতে

শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর ও উঠে পায়চারি করতে লাগল। তারপর কি ভেবে সোজা এসে নিঃশব্দে শুয়ে রইল। ব্যোমকেশ ভিন্ন আর কোন চিন্তা নেই। ওর বুক কাঁপছে, মনে হচ্ছে যেন ও হাঁপাচ্ছে। যেন অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ে এসেছে।

সারা সকালটি সে এই ভাবেই রইল। পথ দিয়ে কত ফিরিওয়ালা চলে গেল। কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়। আবার শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে একখানি পুরাতন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টায়। খুব একটা সহজ ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেও বেশ বোঝা যায় সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পুলিসের ভয়, নিজের ভয়, মনে নানাবিধ চিন্তাধারা, তার দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলে। কেবলই যেন মনে হচ্ছে কাদের যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ব্যোমকেশ যেন তাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করছে—'তুই আমাকে ডোবালি। কেন একটু দাঁড়ালি না।' দরজায় ধাক্কা কিন্তু পুলিসের বা ব্যোমকেশের নয়। দইওলা প্রতিদিন এই সময় দই দিয়ে যায়। সে-ই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

হিমাদ্রি পাশ ফিরে শোয়। এখনও তার দুর্বলতা কাটেনি। ব্যোমকেশ কেন ফিরল না? কেন সে দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়ল না? কি হল তার? সে নিরাপদ না পুলিসের হাতে পড়েছে? হয়ত পারেনি কিংবা হয়ত ব্যাঙ্কে একেবারে যায়নি!

অসহিষ্ণু হিমাদ্রি অপেক্ষায় থাকে। তার নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা তাকে পীড়িত করে তোলে কিন্তু তার সমর্থনে নানাবিধ ছলছুতা খোঁজে। যে তীব্র ঘৃণার ফলে ব্যাঙ্কের দোরগোড়া থেকে ও পালিয়ে এসেছিল সে সব কথা এখন আর মনে সায় দেয় না। এখন উদ্বেগ ও অসহিষ্ণুতার পীড়নে প্রপীড়িত হয়ে ও নিজের কুৎসিৎ বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবে। ক্রমশঃ ব্যোমকেশকে পুনরায় দেখবার আকাঙ্ক্ষা ওকে উৎসাহিত করে তুলল।

এরপর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু ব্যোমকেশ ফিরল না। হিমাদ্রির সকল উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবসান হয়ে গেছে। সে আর গ্রাহ্য করে না। সে এ সব ভাবনা ছেড়ে দিল তার কাবণ তার ধারণা যে ওর বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থনেই এতক্ষণ ভাবনা জাগছিল মনে। ব্যোমকেশকে যে ও ইচ্ছে করে বিপদে ফেলেনি, তাকে ধ্বংস করবাব জন্য শয়তানি করেনি, কেন সে চলে এসেছিল তারই অজুহাত খুঁজছিল।

কিন্তু এখন আব তার কোন প্রয়োজন নেই। তার জবাবদিহি করবার কিছু নেই। মিছিমিচি ও-কথা ভেবে আব কি হবে? মরুক গে জেলে পচে। গোঁয়ারতুমিব এই পবিণাম। ভালই হয়েছে সব চকেবুকে গেছে। ওদের মধ্যে ভাল মন্দব চূডান্ত নিষ্পত্তি হযে গেল। এখন সবই শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিনের সংঘাত, ঈর্ষা, ঘৃণা যা ব্যোম-কেশের সান্নিধ্যে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত তার চিবন্তন অবসান ঘটল। এখন ও মুক্ত। নূতন ভাবে নূতন করে জীবনটাকে গড়ে তুলবে।

কিন্তু যতক্ষণ না ও প্রমাণ করতে পাববে যে এই ডাকাতিব পূর্বেই ব্যোমকেশেব সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের অবসান ঘটেছে, ততক্ষণ ওব মুক্তি নেই। ওকে এখন চতুব হতে হবে। এখন নিজেকে শক্ত কবে বাখতে হবে, যা বলবে তা যেন পবস্পর বিবোধী না হয। নইলে শেষকালে ব্যাঙ্ক ডাকাতিব ষডযন্ত্রের অপবাধে ব্যোমকেশেব সঙ্গে কাঠগডায গিয়ে দাঁডাতে হবে। আব তার ফলে দশটি বছর জেলে চালান যেতে পাবে। এই ধরণের অপরাধেতে আজকালকাব বাজারে এই রকমই শাস্তি। সশস্ত্র রাজনৈতিক ডাকাতি কি না।

সে জানত না যে ইতিমধ্যেই চার্চ লেনেব ওপর একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হয়ে গেছে। ব্যোমকেশেব রিভলবারের গুলিতে বুড়ো শিখ দরোয়ান নিহত হয়েছে। শহরের উকিল মহলে ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত

হত্যা না আকস্মিক এই নিয়ে আলোচনা চলছে। সে জানত না এই ঘটনা সেদিন মধ্যাহ্নে কি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। অপরাহ্নের সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। চারিদিকে টেলিগ্রাফ ছুটছে, সংবাদপত্রের অফিসে আলোড়ন হয়েছে। সকলের মুখে মুখে একই কথা নানা আকারে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে হিমাদ্রি বলে চলে—'আকাট মুখ্যু, সমস্ত ডোবালে! নিশ্চয়ই সে এতক্ষণে কোথাও বসে বীয়ার টানছে, মাথা গরম হয়ে গেলে তাই করে। নয়ত জেলের হাজতে পুলিসের লাথি খাচ্ছে। ওরা যদি ওকে ধরে থাকে ত আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

তবু ওর ভয় নেই। ভয় শুধু ব্যোমকেশকে, সে যদি পুলিসকে বলে দেয় ওরা দু'জনে মিলে এই প্ল্যান করেছিল। হিমাদ্রি এ ব্যাপারে ওরই সহচর—তাহলে? কিন্তু তা যদি হত, তাহলে ত পুলিস এতক্ষণে সোজা এ বাড়িতে এসে খানাতল্লাসী করে ওকে ধরে নিয়ে যেত।

আবার একটা নিষ্ঠুর আতঙ্কের সূত্র ওর মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সেই ভয় আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন সন্ধ্যার সময় ওয়াটগঞ্জের মোড় থেকে একখানি এক পয়সা দিয়ে বিশেষ টেলিগ্রাম কিনল। বড় বড় অক্ষরে চার্চ লেনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

ওর মন সংবাদের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু এখন এই মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগের মুখে সব কিছুই যেন ওর মন থেকে মুছে যায়। অবাধ্য মন যেন কোন সংবাদই গ্রহণ করতে চায় না। তার যেন আর কোন কাজ বা চিন্তা করার শক্তি নেই। সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতর ওয়াটগঞ্জের মোড়ে পঞ্চাননের মন্দিরের সামনে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারপর দৌড়তে লাগল। সেই অন্ধকারে জনবহুল পথের ভেতর দৌড়তে দৌড়তে দু'একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কাও লেগে গেল। ইতিমধ্যে খিদিরপুরের তেমাথায় পৌঁছতে দেখা গেল পর পর তিনখানি ট্রাম এসে

দাঁড়িয়েছে। আলিপুর, বেহালা ও খিদিরপুর। হাঁপাতে হাঁপাতে হিমাদ্রি খিদিরপুরের ট্রামে উঠে বসল। ভিড়ে বোঝাই ট্রাম। একটিও সীট খালি নেই। সকলের হাতে ওই একই কাগজ আর মুখে ঐ একই আলোচনা। তখনকার দিনে কালে-ভদ্রে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটত। সকলেই ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ব্যোমকেশের বীরত্ব ও শিখের মৃত্যু নিয়ে এভাবে আলোচনা করছে যেন ঘটনাটি তাদের স্বচক্ষে দেখা। সহসা ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন হিমাদ্রির নাম করল। অমনি যেন সবগুলি চোখ ওরই মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

হিমাদ্রি আর এভাবে দাঁড়ান উচিত নয় বোঝে। উন্মত্ত জনতা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে কতক্ষণ। নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কেউ ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রিকে জানে। তাই সে পরবর্তী ঘাঁটিতে ট্রাম দাঁড়াতেই ভিড়ের মধ্যে নেমে পড়ে অন্ধকারেশ্যা ঢাকা দিল। কাছেই হংকং—হিমাদ্রির বাসনা হল ভিতরে গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেয়। কিন্তু এ লোভ তাকে সংবরণ করতে হল, হয়ত ওর ভেতরে যারা বসে আছে তারাও এ আলোচনা করছে। কেউ কেউ হয়ত বলছে এইখানে কাল রাত্রে ওরা এই টেবিলে বসে খেয়ে গেছে।

ব্যোমকেশের বন্ধু হিমাদ্রি। 'হংকং'-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি এই কথাটিই ভাবে। সারাজীবন এই কথাটিই ওর মনে দাগ রেখে যাবে। ওদের বন্ধুত্ব ব্যাহত হয়েছে। ছিন্ন হয়ে গেছে দীর্ঘদিনের যোগসূত্র। বন্ধু। বন্ধুত্ব কি? কেন লোকে বন্ধুত্ব করে? ব্যোমকেশ ও তার বন্ধুত্বের যে পরিণতি ঘটেছে সকলের বন্ধুত্বের কি সেই একই পরিণতি? মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিচ্ছেদ।

সে বোঝে কোনদিনই উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয়নি। সে সর্বদাই ওর সঙ্গে লড়েছে। বাক্যে, কার্যে ও বলে। চিরদিনই ত সে সমাপ্তি চেয়েছে। অথচ যখন বিচ্ছেদের মুহূর্ত এসেছে তখন সে ভীত

হয়েছে। কারণ এ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নয়। ওদের পারস্পরিক সাহচর্য অপর জনগণের মনে অবিচ্ছেদ্য ও উদ্দেশ্যমূলক বলে গাঁথা আছে। তারা ভাববে ওদের বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি। কে বুঝবে এ ডাকাতির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক? ব্যোমকেশকে তারা সাধারণ ডাকাত ও খুনে বলে নিন্দা করবে। হিমাদ্রি তাদের কাছে ব্যোমকেশের অনুচর। ওকে এখন প্রমাণ করতে হবে এই অপরাধের সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ নেই।

হিমাদ্রি বাড়ির দিকে দৌড়ল। এতটুকু সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনও তবু ওর বক্তব্য লোক পরম্পরায় প্রচারিত হয়ে কিছুটা লোক রটনা বন্ধ করতে পারবে। সকল সন্দেহ অবসান করতে হবে। ওর বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে? ও যদি বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে তবে? কিন্তু মূর্খ যদি সত্য কথা বলে থাকে তা হলে কি তার ফল হবে?

তবু চেষ্টা করতে ও ছাড়বে না। ওর বুদ্ধি আছে। নিজেকে বাঁচাতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিন্নীমার হাতে কাগজখানি গুঁজে দেয়।

গভীর শোকভরে গিন্নীমা যেন কেঁদে ওঠেন। বললেন—'জানি বাবা জানি, সব শুনেছি। ও-কথা আর আমাকে বলো না। ও-কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।'

অতি কষ্টে যেন হিমাদ্রির মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'কিন্তু ব্যোমকেশ, বেচারা ব্যোমকেশ শেষটা এ-রকম করবে। আমাকে যদি ঘুণাক্ষরেও জানাত হতভাগা!' গিন্নীমার প্রকৃত দুঃখ উপেক্ষা করে হিমাদ্রি নিজের শোক ও অসহায়ত্বের অভিনয় করে।—'আমাকে যদি একটু জানাত, আমি ওকে বাধা দিতাম! আমার কাছে সব কথা চেপে গেছে! কেন এ-রকম করলে! ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী কাণ্ড!"

গিন্নীমা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—'তুমিই, তোমার জন্যে এত কাণ্ড। তুমিই ওকে লেলিয়ে দিয়েছ। যেমন অনিলবাবুকে করেছ। তুমি আর তোমার জুয়াখেলা! টাকা! আরও টাকা পাবার লোভ! তইাতেই ও লোভ পেয়েছে। অনিলবাবু সর্বস্বান্ত হয়েছে, এখন ব্যোমকেশও খসল, সেই সঙ্গে আমিও গেলুম। কিন্তু তুমি বেঁচে রইলে। তোমাব ন্যাজে পা পডল না। দোষ তোমারই। তুমি আর তোমার ঐ টাকা, তোমার জুয়াখেলা আর তোমার ভাগ্য।"

গিন্নীমার সামনেই ছু'হাতে মুখ ঢেকে হিমাদ্রি চেয়ারে বসে পডে। আব গিন্নীমা চীৎকার করে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তিনিও কাঁদতে আরম্ভ করেন—'আমি নির্বোধ হিমু, নির্বোধ। অতি বোকা। কি যে আমার হয়েছে জানি না। কোনদিন আমাব এ অবস্থা ছিল না বাবা, এখন আমার কি যে অদৃষ্টে আছে জানি না।'

হিমাদ্রি মাথা ওঠায না। গিন্নীমার শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কোন কথাই তার নেই। বিষয়টি তাঁর চোখের জলে ধুযে যায় না। পরিবর্তে ও যা স্থির করেছে সেই ভাবেই শোকোচ্ছ্বাস চলুক এই ও চায়। ও তাঁব কাছে সহানুভূতি চায়, তাব মুখনিঃসৃত দিনটির কাহিনীটি ওঁকে গ্রহণ কবাতে চায়। সেই কাবণেই সে মাথা নীচু করে রইল। গিন্নীমা বলতে লাগলেন—'কড়া কথা বলেছি বলে বাবা কিছু মনে কর না। মাথাব আমাব ঠিক নেই। বুঝতে পারছি তোমারও মন খারাপ। যতই হোক তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার জন্যেও দুঃখ হয়। ও যে এত বড় নির্বোধ কে জানত। ও কোনদিনই তোমার ক্ষতি করতে চায়নি। তোমাকে ওর বিশ্বাস করা উচিত ছিল। তা হলে তুমি হয়ত ওকে বাঁচাতে পারতে…'

এই হিমাদ্রির সুযোগ। হিমাদ্রি মাথাটি উঠিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে—

'তাইত ভাবছি—আমাকে বললে পারত। তা হলে ওর গোবর-ভরা মাথায় কিছু বুদ্ধি দিতে পারতুম। কিন্তু একটা কথা কি বলেছে! নিজের মতেই মতগর্ব। নিজেই সব।'

গিন্নীমা বললেন—'হ্যাঁ বাবা তুমিও যেমন লটারিতে টাকা জিতে এসেছিলে।'

গিন্নীমা থেমে গেলেন, বাইরে কাদের গলার আওয়াজ ও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাইরে কে কড়া নাড়ল। গিন্নীমা বললেন—'অঃ আমার পোড়াকপাল, নিশ্চয়ই পুলিস!'

হিমু গিন্নীমাকে মারে' আর কি! তাঁর এই অহেতুক ভীতিতে হিমাদ্রির ঘৃণা বোধ হয়। সে সজোরে চীৎকার করে ওঠে—'দরজাটা খুলে দিন, ও-রকম বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনার ভয় কি? আপনি ত আর মানুষ খুন করেন নি।'

গিন্নীমা তবু গজ গজ করেন—'আমার বাড়ি পুলিস, আমি বিধবা মানুষ, আমার মান সম্ভ্রম সব গেল ..'

তাঁর ভয় করার কিছুই নেই, তবু তিনিই সবচেয়ে ভীত। সামান্যতম প্রশ্নেরও যদি তাঁকে জবাব দিতে হয়। তাঁর মুখে একটা আতঙ্ক মিশ্রিত উৎকণ্ঠার ভাব পরিস্ফুট।

তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হিমাদ্রি দরজাটা খুলে দেয়।

গিন্নীমা অনেকগুলি গলার উত্তেজিত আওয়াজ শুনতে পান, কে একজন চীৎকার করে উঠল—

—'হিমাদ্রি চৌধুরী আপনার নাম?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি।'

—'বুঝেছি। ভিতরে আসুন—'

বৃদ্ধা গিন্নীমা দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘোমটা টেনে দেন—কাঁদতে

কাঁদতে তিনি সকলে-শোনে-এমন-ভাবে বলেন—'আমার পোড়া কপাল…পুলিস কোন দিন আমার বাড়ি মাড়ায় নি, বুড়ো বয়সে তাও হল। কর্তা চলে যাওয়ার পর শত্রুরাও একটা কথা বলতে পারেনি… ছিঃ ছিঃ—'

ইন্‌স্পেক্টর ধমক দিয়ে বলে ওঠেন—'ঠিক আছে, মান ইজ্জত সিন্দুকে তুলে রাখুন, যা জিগ্যেস করব স্পষ্ট জবাব দিন—'

গিন্নীমা নীরব, আতঙ্ক ও ভয়ে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর প্রশ্ন করলেন—'আজ সকালে ব্যোমকেশ কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে?'

—'ঠিক বল্‌তে পারিনা, দশটার কাছাকাছি—'

—'কোথায় যাচ্ছে বলেছিল?'

—'না বলেনি, কখনও বলেও না—'

—'সঙ্গে কে ছিল?'

—'একাই গিছল।'

ইন্‌স্পেক্টর হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনি ত ব্যোমকেশের বন্ধু? কেমন নয়?'

—'হ্যাঁ!'

—'আপনি সকালে ক'টায় বেরিয়েছিলেন?'

—'এই পৌনে দশটা কি দশটা!'

—'ব্যোমকেশ যাওয়ার আগে, না পরে?'

—'পরে!'

—'জানতেন ও কোথায় যাবে?

—'আমাকে কিছু না বলেই চলে গেছে।'

ইন্‌স্পেক্টর ঝাঁজিয়ে ওঠেন—'সোজাসুজি জবাব দিন, আপনি জানতেন কোথায় যাবে ও?'

—'কলকাতার দিকে যাচ্ছে—মনে করেছিলুম। এই পর্যন্ত!'

—'আপনার একখানা ছোট গাড়ি আছে, বেবী কার?'

—'হ্যাঁ।'

—'আজ সেটা বেরিয়েছিল?'

হিমাদ্রি ইতস্ততঃ না করেই বলে—'হ্যাঁ।'

—'কোথায় গিছ্‌লেন?'

—'ভেবেছিলাম ভবানীপুরে আমার দিদির বাড়ি যাব, কিন্তু পথে বেরোতেই বৃষ্টি নামল, গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।'

—'তারপর…?'

—'গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাড়ি ফিরে এলাম।'

—'কেন?'

—ব্যোমকেশ ফিরেছে কিনা দেখার জন্য, তাহলে আমরা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যেতাম—

—'কেন ম্যুজিঅম বা মেমোরিআলে গেলেন না খুঁজতে—ওখানে ত যান আপনারা?'

সহসা হিমাদ্রির মনে হয় ব্যোমকেশ হয়ত সত্য কথা বলে দিয়েছে, ওকেও বেশ জড়িয়েছে—হিমাদ্রি ভীত হয়—তবু সাহস করে বলে—'এখানে প্রথম আসার কারণ, গ্যারেজ থেকে এখানটা কাছে, আর ব্যোমকেশও অনেক সময় বাড়িতেই থাকে বলে এসেছিলাম—'

ইন্‌স্পেক্টর তারপর বললেন—'হুঁ!—বাড়িতে যখন পেলেন না তখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুতে লাগলেন, বুঝতেই পারলেন যে এতক্ষণে ধরা পড়েছে—'

—'সন্ধ্যাবেলা টেলিগ্রাম পড়ার পূর্বে কিছুই জান্‌তে পারিনি,' হিমাদ্রি দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে।

—'ব্যোমকেশকে শেষ বার কখন দেখেছেন?'

হিমাদ্রি মনে করার চেষ্টা করে, তারপর যা নিছক সত্য তাই উচ্চারণ করে, বলে—'সকাল বেলা ন'টার পর।'

—'ও কি বলেছিল তখন?'

—'একটা সিগারেট চাইল, এই পর্যন্ত—'

—'আজ আপনি স্ট্র্যাণ্ড রোড বা হেয়ার স্ট্রীটের দিকে যাননি?'

হিমাদ্রি দৃঢ় কণ্ঠে মিথ্যা বলে—'না। যাইনি।'

—'কেন যাননি? যাবার ইচ্ছে ছিলনা?'

—'আমার গাড়ি থাকে হেমচন্দ্র স্ট্রীটে, সেখান থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোড অনেক দূর।'

ইন্স্পেক্টর পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'আমি তা জানি, প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার কাছে আড্ডা দিতে আসিনি, যদি সোজা উত্তর না দেন আমার সঙ্গে অফিসে চলুন—আপনি জবাব বেরোবে মুখ দিয়ে।' তিনি রাগে ফুলছেন। হিমাদ্রির উত্তরগুলি তেমন আশাজনক নয় বলে তিনি চটেন নি। চটেছেন, তাকে জড়াতে পারছেন না কোনও মতে, এই কারণেই।

তাঁর মনে হচ্ছে এই চতুর লোকটির কাছে তিনি বোকা বনে গেছেন। তাই যে সব প্রশ্ন করার কথা ছিল তার থেই হারিয়ে অন্য প্রশ্ন করে ফেলছেন। তিনি বলতে লাগলেন—'ব্যোমকেশের সঙ্গে আপনার কি চার্চ লেনে দেখা করবার কথা ছিল?'

—'কোন কথাই ছিল না।'

—'ও আপনাকে কিছু বলে নি?'

—'না।'

—'বঙ্গমাতা ব্যাঙ্ক বা কর মণ্ডল কোম্পানির নাম শুনেছেন?'

—'বহু বার।'

—'ব্যোমকেশের মুখে শুনেছেন?'

—'না—'

—'আজকে সেখানে কি ঘটেছে জানেন? শুনেছেন বা পড়েছেন?'

—'হ্যাঁ পড়েছি।'

—'আপনার কি মনে হল?'

—'এরকম নিদারুণ সংবাদ আমি জীবন শুনিনি'—হিমাদ্রি বলল।

ইন্‌স্পেক্টর রুমাল দিয়ে টুপির ভেতর মুছতে মুছতে বললেন—'আরও প্রশ্ন হয়ত আপনাকে করতে হবে। হয়ত আজ রাত্রে আপনাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চে যেতে হবে। ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে।'

হিমাদ্রি বলল—'আমার দ্বারা যদি ব্যোমকেশের কোন সাহায্য হয় নিশ্চয়ই আমি তা করব।'

এই মন্তব্যে ইন্‌স্পেক্টর একটু বিস্মিত হলেন। তার যে অ্যাসিস্টাণ্টটি এতক্ষণ ঘরখানা তল্লাস করছিল সে একখানি কাগজ হাতে করে নিয়ে এসে ইন্‌স্পেক্টরকে দেখাল। কাগজখানি হাতে করে নিয়ে হাসলেন তিনি। সেখানি চার্চ লেনের ম্যাপ। তারপর হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনি যদি ব্যোমকেশকে সাহায্য করবার জন্যে এতই ব্যাকুল, তাহলে মোটরে অপেক্ষা না করে কেন পালিয়ে এসেছিলেন? আপনি ত জানতেন সে আপনার মুখ চেয়ে আছে?'

হিমাদ্রি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মাথা নীচু করল। তারপর আবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল। যেন এক অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু হিমাদ্রি সর্বক্ষণ মনে মনে এই ভাবছে—'আমিও কম ঘুঘু নই। ব্যোমকেশ নিশ্চয় কিছু বলে নি। আমি নিরাপদ। এই লোকটা আমাকে জড়াবার চেষ্টা করছে। আমিও তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছিনা।'

আর ব্যোমকেশ যে কোন মতেই তাকে জড়িত করেনি এই ধারণাটুকুই তার মনে তীব্র সুরার মত কাজ করল। সে সোজাসুজি ভ্রুকুঞ্চিত করে ইন্‌স্পেক্টরে মুখের দিকে তাকাল। এইবার ইন্‌স্পেক্টর মাথা নামিয়ে খানাতল্লাসিতে প্রাপ্ত আর সব কাগজ-পত্র দেখতে লাগলেন ও তল্লাসির তালিকায় যে সব আশপাশের লোক ডেকে এনেছিলেন তাদের নাম নিলেন।

অনেকক্ষণ পরে পুলিসের লোকজন চলে গেল। হিমাদ্রি আর গিন্নীমার কাছে না গিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর বিছানায় একখানি খদ্দরের চাদর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমুতে লাগল। অনেক পরে ঘুম ভাঙল, যখন মনে হল কে যেন গায়ে ধীরে ধীরে ধাক্কা দিচ্ছে। আধা ঘুম আধা জাগরণে হিমাদ্রি নড়েওনা কথাও বলে না।

'হিমুবাবু, হিমুবাবু উঠুন।' হিমাদ্রি বুঝল এ বকুলরাণীর গলা। হাত বাড়িয়ে তাকে হাত ধরে টেনে বিছানার প্রান্তে বসাল।

বকুল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—'সর্বনাশ হয়েছে হিমুবাবু, ব্যোমকেশকে ওরা ধরেছে!'

হিমাদ্রি ফিস ফিস করে জবাব দেয়—'হ্যাঁ আমি জানি। এই কিছুক্ষণ আগে এখানে তল্লাসি করে গেছে। অনেক কথা জিগ্যেস করছিল।' হ্যারিকেনটা জ্বালাবার জন্যে পকেট থেকে দেশলাই বার করছিল হিমাদ্রি, কিন্তু ভাবল এখন অন্ধকারেই থাকা ভাল।

বকুল ব্যাকুল ভাবে জিগ্যেস করে—'ওর জন্যে কিছু করা যায় না হিমুবাবু?'

—'আমরা আর কি করতে পারি?'

—'যা হয় কিছু···একটা কিছু···' বকুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হিমাদ্রি কিছু বলে না। সস্নেহ ভঙ্গীতে ওর পিঠে হাত চাপড়ায়। ওকে

শান্ত করবার চেষ্টা করে। বকুল আরও কিছুক্ষণ সে ভাবেই কাঁদল। হিমাদ্রির আরও একটু বাড়াবাড়ি করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই পারল না, একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। কারণ বকুল হয়ত ওর মনোভাব বুঝে নেবে। ওর কপটতা এবং ব্যোমকেশ সম্বন্ধে যে ওর এতটুকু কারুণ্য নেই, তা হয়ত বকুলের তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ে যাবে।

সে ফিস ফিস করে বলে—'কেঁদ না, চুপ কব।'

বকুল কেঁদে বলে—'ওর হয়ে গেল। ওব দফা শেষ। তারপর আবার মার্ডার চার্জ আছে।'

—'খুনটা হয়ত ইচ্ছে করে করেনি। ব্যোমকেশ কখনও ইচ্ছে করে কাউকে মারতে পারে না। আমি ত ওকে জানি। তুমি আর আমি দু'জনেই ওকে জানি বকুল। ও সহজে এরকম করার ছেলে নয় ...'

—'কিন্তু সত্যিই ত খুন করেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় অনেক লোকের চোখের সামনে। কে এখন বিশ্বাস করবে যে ওর খুন করাব ইচ্ছে ছিল না?'

হিমাদ্রি তেমনি ফিস ফিস করে বলে—'সেই কথাই ত ভাবছি।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তবু ওব মুখ দিয়ে এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ পেল না। অথচ তাব প্রয়োজন ছিল। ওর এই সতর্কতায় বকুলের মনোভঙ্গী লক্ষ্য করার ও কথোপকথনের ধাবা নিয়ন্ত্রিত করাব সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু ও যদি না বকুলরাণীকে বোঝায় যে ব্যোমকেশের পরিকল্পনাব সঙ্গে ওর কিছু যোগ ছিল না, ও যদি এই ঘটনায় সহানুভূতি ও সমবেদনা জানায়, তাহলে চতুর বকুলরাণী ওর মনোভাব ধরে ফেলবে। তবু ও কিছু বলার মত ও করার মত ভেবে পায় না এবং ক্রমশঃই ওর স্তব্ধতা আরও বেড়ে যায়।

বকুলও নীরব হয়ে আছে। ক্রমে একটু সুস্থ হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

হিমাদ্রি বোঝে ওর মনোভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে। সেই অন্ধকারেও ও তার তেজময়ী প্রকাশ বুঝতে পারে। সে আবার হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে আসে। ওর এই নৈকট্য তার পক্ষে তেমন নিরাপদ নয়। হিমাদ্রি বোঝে হ্যারিকেন জ্বালা থাকলে বকুলরাণীর চোখের দিকে ও তাকাতে পারত না।

সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ও বলে ওঠে—'হিমুবাবু আলোটা জ্বালান।' বকুল হিমাদ্রির কাছে দেশলাই খোঁজে, বলে—'দেশলাইটি দিন।'

বকুলের এই চড়া কণ্ঠস্বর হিমাদ্রি বোঝে। বিছানায় নড়ে বসে সে বলে—'আমিই জ্বালছি।' তারপর উঠে গিয়ে দেশলাইটি পকেট থেকে সরিয়ে এক জায়গায় রেখে দেয়। বলে—'তাই ত খুঁজে পাচ্ছিনা। তোমার কাছে টর্চ নেই?'

এও এক প্রকার জুয়া। বকুলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই হিমাদ্রি এরকম করছে।

বকুল দৃঢ় কণ্ঠে বলে—'হিমাদ্রিবাবু শুনুন!' অন্ধকারে হিমাদ্রির মুখোমুখী সে দাঁড়িয়ে। বকুল বলে—'আপনি আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মনে আছে?'

—'হ্যাঁ, আছে।'

বকুল বলে—'ব্যোমকেশকে বাঁচাবায় সেই এক রাস্তা ছিল। আমি বারবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। আপনি বলেছিলেন, আপনি ওর বন্ধু। যদিও তা ছিলেন না, তবুও বন্ধুত্বের ভান করেছিলেন। আমিও চেয়েছিলাম আপনি ওর বন্ধু হয়েই থাকুন। আপনি যা চেয়েছিলেন আমি তা বিশ্বাস করেছিলুম। কি ভাবে আপনি প্রকৃত বন্ধুত্ব করতে পারেন সে সব আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলুম। হিমাদ্রিবাবু, আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলুম। আপনিও তাই চেয়েছিলেন। আগে কোনদিন আপনাকে বিশ্বাস করি নি। এখন কিন্তু করি। আপনি

কথা দিয়েছিলেন। আমিও ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলুম। কেমন নয়?'

হিমাদ্রি কোন উত্তর দেয় না, উত্তর দেওয়ার বাসনা থাকলেও পারে না। সারা প্রাণ মন দিয়ে ও কথা খোঁজে, উপযুক্ত বাক্য—কিন্তু মুখ থেকে কথা বেরোয় না। মুহূর্ত কেটে মিনিটে দাঁড়ায়, তবু সে নীরব।

বকুলরাণী চীৎকার করে বলে—'ভুলে গেলেন? কেন ওকে বাঁচালেন না?'

হিমাদ্রি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বকুল, পারিনি। তোমার কাছে কথা দিয়েছি এ আমার শেষ পর্যন্ত মনে ছিল —বিশ্বাস কর এই সত্য!'

হিমাদ্রি বকুলের কম্পিত হাতখানি তুলে নেয় নিজের হাতে—বকুল হাতটি মুক্ত করার চেষ্টা করে না। সে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে ওর কথার সত্যতা অনুভব করে, মানুষে মানুষে কি নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, ভাবে কোনোদিন কি সমগ্র ব্যাপারটি ও বুঝবে? তবে বিশ্বাস করে হিমাদ্রি তার কথা রেখেছে। ব্যোমকেশ আর হিমাদ্রিব সংঘর্ষের যেখানে অবসান ঘটেছিল সেখানে আর সে তাই অনধিকার প্রবেশ করতে চায়নি, সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেনি।

বিনা বাক্যব্যয়ে বকুল ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে যায়···সিঁড়িতে তার স্যাণ্ডালের আওয়াজ শোনা যায়।—সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পাওয়া গেল। হিমাদ্রি বোঝে বকুল পথে নেমে পড়েছে।

এইবার দেশলাই বার করে হ্যারিকেনটি জ্বালে হিমাদ্রি, আর অন্ধকার সহ্য হয় না, ক্ষিপ্র হস্তে আলো জ্বালতে হবে। আলো চাই, মন ও অন্ধকার মলিন আত্মাকে আলোকিত করতে হবে, আর আঁধারে থাকা

যায় না—আলো জ্বেলে হিমাদ্রি তাই তার কুঞ্চিত বিছানা ও যে প্রান্তে বকুল বসেছিল সেই দিকে তাকায়।

সহসা দোর খুলে গেল—পুষ্পময়ী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে—পুষ্পময়ী ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকলেন, তারপর অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হিমাদ্রির মুখের ওপর তাঁর কঠিন দৃষ্টি। হিমাদ্রি প্রাথমিক আক্রমণের ঘোর কাটিয়ে নেয়। তারপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে ম্লান হাসে—বুকের ভেতর দু'টি হাত চেপে মাথা নীচু করে বসে। যেন পাকা অভিনেতা।

পুষ্পময়ী আরও কাছে এসে খুব নীচু গলায় বললেন—'তুমি একটি পাকা শয়তান, ওকে তুমিই নাচিয়েছ।'

হিমাদ্রি সরোষে বলে—'ওসব কথা বলবেন না!'

—'ছি ছি কি কাণ্ড! ও গিছল মানুষ খুন করতে, তুমিও সঙ্গে ছিলে, তারপর সুযোগ বুঝে ওকে একা ফেলে পালিয়ে এসেছ। অপেক্ষা করতে সাহস হয়নি, কেমন তাই নয়?'

হিমাদ্রি শিউরে উঠে—হাত নেড়ে অঙ্গ ভঙ্গী করে—

পুষ্পদিদি বলেন—'এ তোমারই কাজ; অস্বীকার কোরোনা—'

হিমাদ্রি কিছু বলে না, তার নীরবতাই তার স্বীকৃতি।

—'এই ত তুমি চেয়েছিলে, এই তোমাদের শেষ—।'

হিমাদ্রি গিয়ে বিছানায় বসে—ঘরে তখন নীরবতা, বেতের চেয়ারে বসে পুষ্পময়ী হিমাদ্রির মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। তারপর কিছুক্ষণ পরে পুষ্পময়ী ভারি গলায় বললেন—'যাক, সব চুকে গেল, তুমি এখন এ বাড়ি ছাড়, শিগশির ভবানীপুরে চলে যাও, এখানে থাকার আর মানে হয় না। নতুন করে আবার মানুষ হবার চেষ্টা কর।'

প্রাথমিক তদন্তাদি শেষ হবার পর আসামীকে যখন আদালতে হাজির করা হল, তখন পুলিসের অনুরোধে সরকার পক্ষ এক সপ্তাহের সময় চাইলেন আর কিছু অনুসন্ধান বাকী আছে এই অজুহাতে। বিভিন্ন সূত্রে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা না কি যথেষ্ট নয়, তবে তাঁরা আশা করেন তদন্ত অবসানে এমন অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, যদ্বারা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাবে। উপস্থিত মামলাটি রহস্যের ঘন কুয়াশায় ঢাকা।

ব্যোমকেশের মনও কুয়াশাচ্ছন্ন। তার আশঙ্কা এ কুয়াশা হয়ত বিদূরিত হবে না। হয়ত আর সেই কুয়াশা ভেদ করে কোনদিন সূর্যালোক দেখা যাবে না। পুরাতন দিনের সেই স্বাধীনতা, সেই বিস্তীর্ণ বিচরণ-ক্ষেত্র আর পাওয়া যাবে না। চারিদিক থেকেই যেন কুয়াশায় ঘিরেছে। ব্যোমকেশের উদ্দাম চিন্তাধারা যেন জেলখানার গবাদে মাথা খুঁড়ে মরছে। সেই স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র জেলে পায়চারি করতে করতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর যে-কথা বারবার ভেবেছে, সেই কথাই আবার ভাবে। একটা কথা কিছুতেই স্থির করতে পারে না, হিমাদ্রি সেদিনের সেই সকালে এসেছিল, কি আসে নি। কিছুই ভেবে পায় না ব্যোমকেশ। নিশ্চিত হতে না পেরে অভিমানে, দুঃখে, হতাশায় হিমাদ্রিকে অভিশাপ দেয় ব্যোমকেশ, ভেঙে পড়ে অপ্রতিরুদ্ধ কান্নায়।

সি. আই. ডি কর্মচারী বা জেলের কর্তৃপক্ষ যাঁদের চোখে পড়ে, তাঁরা ভাবেন হয়ত অনুতাপ এসেছে মনে, অনুশোচনা জেগেছে অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু কুয়াশা ভেদ করতে না পারার অক্ষমতা ও নিদারুণ হতাশাই ওর গভীরতম দুঃখের কারণ হয়েছে।

মিনিট, ঘণ্টা ও দিন কেটে যায়। আর এক সপ্তাহ কেটে গেল। পুলিস ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করতে না পারলেও মামলাটি বেশ

ভালভাবেই সাজান, নরহত্যা, ডাকাতি ও বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র রাখার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হল, অভিসন্ধিটা যে রাজনৈতিক তারই সমর্থনে ব্যোমকেশের অপরিচিত আরও পাঁচ ছ'জনকে ধরা হয়েছিল, তাদেরও কাঠগড়ায় হাজির করা হয়েছে। স্পেশাল বেঞ্চের বিচারের যথারীতি অনুষ্ঠানের দীর্ঘ ও বিলম্বিত বিচার চলল। কতখানি অপরাধ যে ব্যোমকেশ করেছে তার সম্যক গুরুত্ব আদালত কক্ষেই ও সর্বপ্রথম বুঝল।

গোড়ার দিকে একটা বীরত্ব ও উদ্দেশ্যের রাজনৈতিক সততা তাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। এতদিন তাই ভাঙিয়েই চলেছে, কিন্তু এখন আর কিছুতেই ভরসা নেই। এরপর ব্যোমকেশ অকপটে স্বীকারোক্তি করল, কিন্তু কোন পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে একাজ করে নি, এই কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিল।

ব্যোমকেশ তার বিবৃতিতে বলেছে, ব্যাঙ্কের ধার দিয়ে যাচ্ছিল, পকেটে রিভলবার ছিল, সহসা ওর মাথায় ব্যাঙ্ক লুটের ফন্দি জাগে, রিভলবারটাই ওকে সাহস ও প্রেরণা এনে দিয়েছে—কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে সে এ-কাজ করেনি। আর ব্যাঙ্কের বুড়ো দরোয়ানটিকে মারার ইচ্ছে ওর মোটেই ছিল না, ঘটনাটি সম্পূর্ণ আকস্মিক, টানাটানির ভিতর আপনি রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়েছে। কোনো ষড়যন্ত্রের ফল নয়।

এই বিবৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই যে, হিমাদ্রির নাম যেন সযত্নে উহ্য রাখা হয়েছে। হিমাদ্রিকে এই ব্যাপারে জড়াবার জন্য পুলিস ওকে অনেক পীড়ন করেছে, অনেক জেরা করেছে। ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রির রেকর্ড পুলিস-অফিসারের অজানা নয়, তাঁরা অনেক কিছুই জানেন, হিমাদ্রির সঙ্গে ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস তাঁদের অজানা নেই, বকুলরাণী ও পুষ্পময়ীর নামও দু'একবার উঠেছিল, কিন্তু জীবনের

এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপর্যয়ের মুখে ব্যোমকেশ ওদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নি। তাঁরা শুধু এই ভেবে বিস্ময় বোধ করছেন, সকল ব্যাপারেই যখন ওদের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ তখন এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তার অনুপস্থিতির হেতু কি? হয়ত হিমাদ্রি এসেছিল, কিন্তু কলরব ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু সত্যিই যদি সে পালিয়ে থাকে, তা হলে ব্যোমকেশ কেন তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে? হিমাদ্রি নিশ্চয়ই এর ভিতর ছিল, কারণ এই স্থূল লোকটির পক্ষে এরকম একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করা কখনই সম্ভবপর নয়। যেমন অসম্ভব এতবড় একটা দুঃসাহসিক মতলব অন্তরঙ্গের কাছে চেপে রাখা। কিন্তু তবু বিবৃতিতে কোথাও হিমাদ্রির নাম-গন্ধও নেই!

ব্যোমকেশের ধারণা ছিল হিমাদ্রিব নামটা উল্লেখ না করলে তাকেও বাঁচান যাবে আর অপরাধেব গুরুত্বও হয়ত কিছু কমবে। কয়েকদিন সত্যই ওব ভয হযেছিল। হয়ত হিমাদ্রিকে গ্রেপ্তার করা হবে, হয়ত সে নিজেই এসে ধরা দেবে, তাব ফলে উভয়েরই বিপদ বাড়বে। কিন্তু যখন দেখা গেল শেষ পর্যন্ত পুলিশ হিমাদ্রিকে গ্রেপ্তার করল না তখন ও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এর ফলে ওর মনে একটা আত্মপ্রসাদেব দম্ভ জাগল, ওর মিথ্যা কথাটাই তা হলে পুলিস মেনে নিযেছে আর হযত শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যাবে, ওর দুঃসাহসের প্রশংসা হবে।

নিজের বিবৃতির জন্য অপরিসীম আনন্দ তার মনে, শুধু তাই নয়—হাতের ওপব বরফের চাঁই রেখে তিনদিন তিনরাত্রি ঘুমুতে না দিয়ে, স্থানে অস্থানে আলপিন ফুটিয়ে গালাগাল দিয়ে, প্রহার করে, মিষ্ট কথা বলে, লোভ দেখিয়েও পুলিস কিছুতেই তার মুখ থেকে কোন কথাই আদায় করতে পারলে না। আর যাদের ধরা হয়েছিল তাদের সঙ্গেও যে ব্যোমকেশের কোন যোগাযোগ আছে, তা প্রমাণ করা গেল

না। অনেকগুলি সাক্ষী ব্যাঙ্ক-ডাকাতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলেন, কয়েকজন এ কথাও বললেন, রাস্তায় বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত যেন কাকে খুঁজছিল ব্যোমকেশ। এ-বিষয়ে ব্যোমকেশকে জেরা কবতে সে হেসেছিল। বলেছিল 'পথে অনেক গাড়ি যাতায়াত করছিল, নির্বিঘ্নে রাস্তা পার হয়ে যাবাব জন্য এদিক ওদিক দেখছিলাম।'

আরও বহুবিধ সূত্র ধরে জেরা চলল, কিন্তু আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে তা কাটিয়ে দিল ব্যোমকেশ, তার বিবৃতির একবিন্দু নড়চড় হল না। ব্যোমকেশ এতেই মহাখুশি। তার ধারণা এইতেই তার আত্মপক্ষ সমর্থনের বড় বাজী জেতা হয়ে গেছে, সহজ বিবৃতি সহজেই আঁকড়ে রাখা যায়, ভুল বা নড়চড় হবার উপায় নেই। কথাগুলি এমন ভাবেই ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, যেন এইটাই সত্য ও নিজেই তাই বিশ্বাস করল—এর পরে কিন্তু গুলিয়ে গেল সব, হিমাদ্রির ব্যাপাব সম্পর্কে কিছুতেই ও মনস্থির করতে পারলনা, আর সেই কাবণেই ও কিঞ্চিৎ অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু দু'চার দিন শুনানী হবাব পব ব্যোমকেশেব মনে হল সে অতিশয় নির্বোধ, তার আর সেই বীবত্বেব আত্মপ্রসাদ নেই, বিবৃতির পরিবর্তনের জন্য মনে লোভ জাগে, সে অতিশয় সন্ত্রস্ত হযে উঠেছে, তার এই বিবৃতিব ফলে কেন সে একা আসামীব কাঠগড়ায দাঁড়াবে? কেন হিমাদ্রি এগিয়ে এসে এ বিপদের অংশভাগী হবে না?

এই ধরণের অসংখ্য প্রশ্নের কণ্টকে জর্জবিত হয়ে রইল ব্যোমকেশ। কিন্তু পুলিস বা যে-ভদ্রলোক করুণা পরবশ হযে বিনা ফী-তে তার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, ব্যোমকেশ তাঁদেব কাছে মুখ খুলতে সাহস কবল না। হিমাদ্রির বিষয় ওকে নীরব থাকতে হল। জবানবন্দী আঁকড়ে ধরে রইল ব্যোমকেশ, সবাই মনে করল এতেই হয়ত মামলাব রায় আশাজনক হবে।

তবু অবিরাম মনের ভিতর থেকে কিছুতেই একটা প্রশ্ন মুছে ফেলতে পারে না ব্যোমকেশ, সে প্রশ্ন হিমাদ্রি সম্পর্কে, তার জন্য বিরামবিহীন অনুসন্ধান চলেছে ওর মনে। অনেক কিছু প্রশ্নের যে জবাব চাই :

'হিমু কোথায় ছিল? সত্যিই কি সে এসেছিল? কি হয়েছিল ওর? একবার যেন মনে হয়েছিল সে এসেছিল, কিন্তু যখন বেরিয়ে এলাম, তখন কাউকেই দেখা গেল না। জানি না তার কি হয়েছে তাই চুপ করে আছি। সত্যি হিমাদ্রি তোমার কি হয়েছে?'

কিন্তু সেই বিশ্রী কুয়াশার কালো ঘন যবনিকা যেন সব কিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় না। তাই নিজের জবানবন্দী অস্বীকার করার কোন পথ নেই। কোন সিদ্ধান্তেই যে পৌঁছান যাচ্ছে না। কারণ ব্যাঙ্কের দরজায় হিমাদ্রি এসেছিল কি আসে নি, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই ওর মুস্কিল। এরই জন্য ও কেঁদেছে, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে নি। কেবলই মনে হয়েছে ও আজ নিঃসঙ্গ। পৃথিবীর সুবিশাল জনতার ভিতর পথ হারিয়ে ফেলেছে। পুলিস যে হিমাদ্রির পেছনে লেগেছে, তাকে প্রশ্ন করছে, লক্ষ্য করছে তার গতিবিধির ওপর, সে কথা ব্যোমকেশ জানে না, সেদিনের সেই আলো-আঁধারের দিনটিতে কোথায় কে ছিল, ব্যাঙ্কে আসার আগে ব্যোমকেশ কোথায় কোথায় গিছল, আগের দিন রাতেই বা কোথায় ছিল—এসব তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিস আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, হিমাদ্রিকে কিছুতেই তারা জড়াতে পারছে না।

এই কারণেই তারা সময় চেয়ে দিন পিছিয়ে দিয়েছে, পুলিস কিছুতেই তদন্ত শেষ করতে পারছিল না, আশা করছিল কোন অলৌকিক অঘটনের, তা কিন্তু ঘটল না। সময় কেটে গেল, কিন্তু কুয়াশা কাটল না।

বিচার চলতে লাগল, নরহত্যা, ডাকাতি ও বে-আইনী ভাবে অস্ত্র রাখার যে দায়ে ব্যোমকেশেকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সে সকল বিষয়েই সে নিজেকে নিরাপরাধ বলল।

আসামী পক্ষের সেই অ্যামেচার উকিল বাবুটির বিশ্বাস ছিল তাঁর কেস খুব জোরাল, তিনি কিঞ্চিৎ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, বিশ্বাস ছিল আসামী হয়ত ন্যায়-বিচার পাবে, সেই কারণেই প্রথম মুখটায় ব্যোমকেশকে দিয়ে তার জবানবন্দীর পুনরাবৃত্তি করালেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার বক্তব্য আগের মত তেমন জোরাল হল না। কেমন যেন জোলো ও প্রাণহীন। কোথায় যেন অন্তর্নিহিত সত্যের অভাব রয়েছে। যেন বিনি সুতোয় গাঁথা কতকগুলি উড়ো কথার মালা। কিন্তু সরকারী পক্ষেব জেরার মুখে ব্যোমকেশ উত্তেজিত হয়ে ব্যাঙ্কের বাইবে সেই সংঘর্ষের কথা স্বীকার করল।

—'হ্যাঁ…(ধীরে ধীরে বিরাট দেহ নিয়ে কাঠগড়ায় উঠতে গিয়ে বলে) হ্যাঁ! (বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলে)—হ্যাঁ, করেছি, কিন্তু হুজুর আমার কথাটা শুনুন (তার গম্ভীব গলাব আওযাজে আদালত-ঘর গম গম করে, মুখখানি মৃতের মত সাদা, যেন ভয় ও উৎকণ্ঠায় এই পরিবর্তন ঘটেছে)—হ্যাঁ আমি ওর সঙ্গে মারামারি করেছি, কিন্তু সে শুধু নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, ফুটপাতের ওপর দু'জনে টানাটানি চলছিল, ও আমাকে বাগিয়ে ধরেছে, আমিও ওকে ধরেছি সজোরে, কিন্তু ওকে হত্যা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, হঠাৎ গুলি ছিটকে গেল, কিন্তু ওকে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না, আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনি আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা করছেন, আমি স্বেচ্ছায় করেছি এই কথাটুকু বার করে নিতে চান, কিন্তু আমি যা করিনি তা কি করে বলব? এই একমাত্র সত্য!'

আদালত-ঘরে কয়েকটি মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে, চারিদিক থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায়, তাবপর আবার সবকাবী উকিল জেরা শুরু করেন :

—'কিন্তু ঐ বিভলবার যেটা আপনার হাতে ছিল, ব্যাঙ্কের ভিতরে ও বাইবে যখন পালারার চেষ্টা করছিলেন, তখন কি সেটা উঁচিয়ে ধবা ছিল, পুবো ভর্তি কবা ছিল না ?' তাঁব ' লাব স্বর নরম ও গম্ভীর।

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে আগাগোডাই জানতেন ওর ছ'টি ঘরেই গুলি ঠাসা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনি ত আগেই বলেছেন, সকালে ভরেছিলেন—না ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু হত্যা করাব কোন উদ্দেশ্য আপনার ছিল না ?'

—'না।'

সবকাবী উকিল থামলেন, ব্যোমকেশের উচ্ছ্বাস এই প্রশ্ন করে তিনি বিশ্লেষণ করলেন। ওর স্বীকারোক্তিব ভাবপ্রবণ অংশেব সারভাগ এই ক টি কথায জেনে নিলেন।

বিচাব এগিযে চলে—

সহসা ব্যোমকেশ বুঝতে পারে কোথায় ওর সুবিধা, চেঁচিয়ে ওঠার ফলে আদালতের ওপর ওব সামযিক প্রভাবের সুযোগ নেওযার স্বর্ণ সুযোগ এসেছে, ওর মাথায় এই বিলম্বিত বুদ্ধির উদয় হয ধীর গতিতে, একবার নিজের দিকে, অসংখ্য উকিল ও জুরীদেব দিকে পর্যায়ক্রমে তাকায় ব্যোমকেশ,—ওদেব মনে যে একটা ধারণা জাগিযেছে সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ হয।

কিছু পরেই হাকিম বললেন,—আগামী দিন তিনি জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দেবেন। ব্যোমকেশের মনে তখন বেশ নিঃসংশয় ভাব।

তার ধারণা আদালত তার নির্দোষিতা বুঝেছেন, সে নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারে, দণ্ড একটা অবশ্য হবেই, তবে হয় ত তেমন গুরুতর নাও হতে পারে।

ব্যোমকেশ কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চিত হল। আদালত ওর উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছেন, কিন্তু ওর অসঙ্গত আশা তাঁদের কাছে উপেক্ষণীয়। বিচারক তাই জুরিদের সেই সব তথ্যের ওপর জোর দিতে বললেন, যেগুলি নিজস্ব বুদ্ধিতে সে ধরতে ছুঁতে সাহস করেনি। সে এখন আর কিছুই বলতে পারে না, সভয়ে কাঠগড়ায় বসে গম্ভীর মুখে প্রতিটি কথা ওজন করে শোনে।

দুপুরের দিকে চার্জ বোঝান শেষ হল। জুরিরা অভিমত দেবার জন্য ঘরের ভিতর ঢুকলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা ফিরে এলেন, আদালত-কক্ষে আবার চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজ আবার থেমেও গেল। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে রায় শোনে। "ডাকাতি ও বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র রাখার অপরাধে ব্যোমকেশ অপরাধী বিবেচিত হয়েছে। নরহত্যাটা আকস্মিক।"

আদালত-ঘরে কলরব উঠল, সকলে হাকিমের দিকে তাকিয়ে রইল, জুরিদের ফোরম্যান বসলেন, তার পাশের লোকটি তাঁর কানের কাছে গিয়ে কি যেন বলছেন, অপর জুরিরা বিষাদ-আকুল মুখে আনতদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, কাগজপত্রের খস খস আওয়াজ, উভয় পক্ষের উকিলই উত্তেজিত হয়ে কথা কইছেন—সবাই সহসা থেমে গিয়ে হাকিমের মুখের দিকে তাকাল। এইবার রায় দেওয়া হবে।

অনেক কথার পর হাকিম জানালেন, ব্যোমকেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দেওয়া হল।

ব্যোমকেশ শান্তভাবে নীরবে দণ্ডাজ্ঞা শোনে। তার উত্তেজিত মনে এই দণ্ডাজ্ঞা আঘাতের মত বাজে। আদালতে আবার যখন কলরব

উঠল, তখন সামায়িক আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটিয়ে ব্যোমকেশ বুঝল সমস্ত আদালতের দৃষ্টি তার মুখের ওপর।

ব্যোমকেশ ভাবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল। এর চাইতে চরম দণ্ডই ছিল ভাল। যদিও কোনদিন মুক্তি পায়, তখন এমনই বুড়ো হয়ে পড়বে যে, আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না, দেহ ও মনে সে ভেঙে পড়বে। দ্বীপান্তর! আন্দামান, বক্সা, দেউলী না হিজলী? এই সঙ্গে মুছে গেল জীবনের সকল আশা, আকাঙ্খা, সকল পরিকল্পনা, মৃত্যু হল ব্যোমকেশের, পড়ে রইল ওর নির্বীয খোলশটুকু।

কাঠগড়া থেকে যখন ওকে নামান হচ্ছে তখন ওর সেই বড় বড চুলগুলি যেন সাপের উদ্যত ফণার মত দুলছে, ফুলন্ত মুখখানি যেন আরও ফুলে উঠেছে, বড বড চোখ দু'টি রক্তের মত লাল। সেই কলরব মুখরিত আদালত-কক্ষে ওর মুখ-নিঃসৃত হতাশাব আক্ষেপ "সব শেষ হল" কথাগুলি সবাই-এর কানে বাজল।

পুলিসের কালো গাড়ির ভেতর যখন ওকে পুরে দিয়ে সার্জেণ্ট দরজা বন্ধ করল, তখন জনতার ভিতর থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ," "বন্দেমাতরম্।

আসামীর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল "ব—ন্দে—মা—ত—র—ম্।"

এই চাঞ্চল্যকব মামলাব রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পডল। পাঁচটার মধ্যে শহরের কারও আর জানতে বাকি রইল না। খবরের কাগজ সাতকলম লম্বা হেড লাইন সাজিয়ে বিশেষ সংস্করণ বার করেছে। চৈত্রের সেই অপরাহ্ন বেলা খবরের কাগজ বিক্রেতাদের 'জোর খবর' এই চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই খবরের জন্য গিন্নীমার বাড়ির সেই ঘরটিতে উদগ্রীব হয়ে শুয়ে আছে হিমাদ্রি, এই বাসাতেই ও এখনও থাকে। হিমাদ্রি জানত আজই এ-খবর বেরুবে, কেন না সকালের সংবাদপত্রে

বেরিয়েছিল যে, আজকেই হাকিম রায় দিয়ে দেবেন। সমস্ত দুপুরটা আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে হিমাদ্রির। সে ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত ফাঁসি না-ও হতে পাবে ব্যোমকেশের। বরাং ভাল হলে হয়ত বারো তেরো বছরের ওপর দিয়েই কেটে যেতে পারে।

মনে মনে বারবাব এই কথারই পুনবাবৃত্তি করেছে হিমাদ্রি। ওর এই ধারণায় গোড়ার দিকটায় যুক্তি ছিল, শেষটায় কিন্তু তা শূন্যগর্ভ বলে মনে হয়েছে। সন্দেহ ও সংশয়ের দোলায় দুলছে হিমাদ্রি সারাদিন, কেমন একটা আতঙ্ক ওকে ঘিরে ধরেছে।

বিছানায় শুয়ে কাঁপছে হিমাদ্রি, ব্যোমকেশের সঙ্গে দীর্ঘ দিনেব বিরহ-মিলন-কথা মনে পড়ে, কত দিনেব কত খুঁটি-নাটি, কত চাপা মান-অভিমান, কত ছোটাখাটো সংঘর্ষ ও সংঘাত ও সেই সঙ্গে দুঃখের দিনের ছায়ার মত অনুসবণ, ভালবাসাব অকৃপণতা ও মমতার কথা মনে পড়ে হিমাদ্রির। প্রথম যেদিন পরিচয় হয়েছিল সেইদিন থেকে শেষ দিনটির ইতিহাস চলচ্চিত্রের মত ধারাবাহিকভাবে মনে জাগে। হিমাদ্রি ভাবে ব্যোমকেশের ও কি করেছে, তারই বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই আজ ওর এই নিদারুণ দুর্দশা। ব্যোমকেশের ওপর অসীম ঘৃণা ও ঈর্ষার তাড়নাতে এ কাজ কবেছে হিমাদ্রি। এক হিসাবে হিমাদ্রি ব্যোমকেশকে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস কবল, আর কিছুই সে করতে পাববে না, বাঁচলেও জেলখানার বাইবে আব কোনোদিন সে আসতে পারবে না। কি ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে হিমাদ্রি। ও যে নিজের হাতে তাকে ধ্বংস করল, একথা মনে হতেই সে উন্মাদের মত বিড় বিড করে বকতে থাকে, যে-দেবতার কথা কোন দিন মনে হয়নি, সেই দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়, মঙ্গল কামনা করে ব্যোমকেশের। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, শহরের কলরব এখন শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়েছে, তবু সেই ভাবেই পড়ে আছে হিমাদ্রি।

সন্ধ্যার অনেক পরে মাঝে মাঝে সাইকেল-পিয়ন বিশেষ সংখ্যার কাগজ নিয়ে এ-পাড়ায় আসে, তারই আশায় উৎকর্ণ হয়ে শুয়েছিল হিমাদ্রি, অনেক পরে সেই প্রত্যাশিত ধ্বনি শোনা গেল। আওয়াজ ক্রমে কাছে আসে, হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, পিয়নটাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে একখানা কাগজ কেনে।

ওপরের হেডলাইনেই সকল খবর সাজান আছে, পড়তে বা দেখতে বেশি সময় লাগে না, এক নিঃশ্বাসে শেষ করে হিমাদ্রি।

একবার নয় বহুবার পড়ে হিমাদ্রি, মনে মনে ও সজোরে। "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, আসামীর প্রতিক্রিয়া……"হিমাদ্রি ব্যোমকেশের কি করেছে ও কি তার জবাব দিয়েছে ব্যোমকেশ, তা-ও এই এক পয়সার টুকরো সংবাদপত্রে লেখা আছে—

"…আসামীকে যখন কাঠগড়া হইতে নামান হইতেছিল, তখন তাহার মুখভঙ্গীতে হতাশার চিহ্ন ছিল,—আসামীর মুখ হইতে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত 'সব শেষ হোল' এই কথাগুলি স্পষ্ট শোনা গেল। মনে হয—"

হিমাদ্রি আর পড়তে পারে না, তার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। সত্যিই সব শেষ হল! ওদের এতদিনের সংঘর্ষ, সখ্যতা ও সম্প্রীতির অবসান। ব্যোমকেশের জীবনের ওপর যবনিকা পড়ল।…কিন্তু সত্যই কি এই শেষ! হিমাদ্রি সবেগে বাড়ি ফিরে আসে।

সদর দরজাটি বন্ধ করে অন্ধকার দেউড়িতে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবে—না, এ কখনই শেষ নয়, নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে শেষ পর্যন্ত। হয়ত ওর ওপর ব্যোমকেশের অভিশাপ পড়বে, মাথায় বজ্রাঘাতও হতে পারে, আকাশে মেঘ জমেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ বহ্নি দেখা যাচ্ছে।—কিন্তু কিছুই হলনা।

আনমনাভাবে আরও দু'চার মিনিট দাঁড়িয়ে রইল হিমাদ্রি, সেই ভাবে

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা ভয়ানক কিছুর প্রতীক্ষায়। সেই অনাগত আঘাতের জন্য ও প্রস্তুত, কাউকেই ওর ভয় নেই, ভয় করবে না।—কিন্তু কিছুই হয় না শেষ পর্যন্ত।

হিমাদ্রি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়,—ভয় করবে না মনে করলেও তীব্র আতঙ্কে ওর শরীর ও মন আচ্ছন্ন। ভয় এই, যে, হয়ত এর প্রতিক্রিয়া হবে অনেক পরে, দীর্ঘকাল নিরাপত্তা ভোগ করার পর অবশেষে একদিন মাথায় আঘাত এসে পড়বে। এই ওর আশঙ্কা, আত্মা এই চিন্তাতেই উৎপীড়িত।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করার জন্য রান্নাঘরের দিকে চলল হিমাদ্রি, গিন্নীমার সঙ্গে দু' একটা কথা কয়ে মনটা হাল্কা করার চেষ্টা করে, সেখানে গিন্নীমা নেই, রান্নাঘর বন্ধ। গিন্নীমার ঘরের দিকে দৌড়য় হিমাদ্রি—

—'গিন্নীমা, গিন্নীমা, কোথায় গেলেন? কাগজ পাওয়া গেছে!'

কোন উত্তর নেই, হিমাদ্রি এ বাড়িতে আজ একা, সহসা হিমাদ্রির মনে পড়ে। বৃদ্ধা দুপুরের দিকে অনেক উপদেশ দিয়ে বোনের বাড়ি উল্টাডাঙ্গায় গিয়েছেন। বার বার করে বলে গেছেন, কেরোসিন তেলওলা এলে যেন তেলটা ঠিকমত নেওয়া হয়, দরজায় এগাবোটা খড়ির দাগ আছে, আজ একবোতল হলে সেই দাগ বাবোয় দাঁড়াবে। দুধওলা আসবে সন্ধ্যার পর—। দুধটার মাপ যেন ঠিক থাকে, একে ত জল দেওয়া, তার ওপর পোওয়া ছোট।—উনি সন্ধ্যার ভিতর ফেরার চেষ্টা করবেন, মার পেটের বোন, অসুখে পড়েছে, না দেখলে বলবে—দিদি একবারও এল না। ইত্যাদি।

সব কথা তখন হিমাদ্রির কানে যায় নি। এখন মনে পড়ে, তাই ত আজ যে বুধবার, বুধবারই ত রায় বেরোবার দিন, তারিখটা কত—বোধ হয় ১২ই কি ১৩ই এপ্রিল।—এ বছর শেষ হয়ে এল।

গিন্নীমাব একটিও কথা মনে নেই হিমাদ্রির, অথচ অনেক কিছুই ত

বলেছিলেন। মনে হল বিকালে চা খাওয়া হয়নি, উপরন্তু ক্ষুধারও উদয় হচ্ছে, স্টোভটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগল হিমাদ্রি আর গিন্নীমাকে মনে মনে অভিশাপ দেয়—এই মানসিক ক্লেশের পর কি আর এত শত ভাল লাগে!

স্পিরিট কম ছিল, বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও স্টোভ জ্বলল না, উনুন জ্বালান গেল না, ঘুঁটে যদিও বাইরে ছিল, কয়লার ঘরে গিন্নীমা চাবি দিয়ে গেছেন।

দরজা খুলে বাইরে তাকায় হিমাদ্রি, আকাশে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, বৃষ্টি নামল বলে, ধুলো উড়ছে, ঝড় এগিয়ে আসছে। হয়ত কাল-বৈশাখী নামছে, দেখতে দেখতে ঝড়ের ঝাপটা এসে গেল, জানলা দরজার দুমদাম আওয়াজ, কোথা থেকে একখানি করগেটের টিন উড়ে এসে রাস্তায় পড়ল, ইলেকট্রিক ট্রাম ও টেলিফোনের তার ছিঁড়ল, প্রবল বর্ষণ শুরু হল, একটা ঘুন ধরা বটগাছ ভেঙে পড়ল, হিমাদ্রি জানলা থেকেই দেখল।

তারপর নামল শিলাবৃষ্টি, এ ধরণের শিলাবৃষ্টি সচরাচর কলকাতা শহরে দেখা যায় না, চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে সাদা হয়ে গেল, পথের ওপর প্রায় এক ফুট বরফ জমল। সারা বাড়িটা যেন ঝড়ে কাঁপছে, প্রাচীন বাড়িটা বুঝি ধুলিসাৎ হয়।—শিল পড়ে বাড়ির উঠানটুকু সাদা হয়ে গেল,—কি ভীষণ কাণ্ড!

সভয়ে এই দৃশ্য দেখে হিমাদ্রি। তার ধারণা ছিল, এ বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়ত এখনই কমবে, কিন্তু তা হল না, ঝড়ের বেগ বেড়েই চলল। ঠিক কাল বৈশাখীর ঝড় নয়, তাই সহসা কিন্তু শান্ত হয় না।

আবার জানলা খুলে তাকায় হিমাদ্রি, পথের ওপর জনপ্রাণী নেই, শুধু সাদা বরফের স্তূপ পড়ে আছে। বাতাস গর্জন করছে, সারা শহর আতঙ্কে মুহ্যমান।

হিমাদ্রি জানলা থেকে সরে আসে, তার শীত করছে, ক্ষিদে পেয়েছে, সারা দিনের অবসাদ, তার ওপর ব্যোমকেশের মামলার রায়, আর অবশেষে বৃষ্টি ও গিন্নীমার অনুপস্থিতি তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। ভাঁড়ারের দরজাটা জোর করে খুলে ফেলে হিমাদ্রি। খাবার জিনিস কিছুই নেই, একটি কৌটোতে আছে কিছু একো গুড়ের মুড়কি, চাঙারিতে বেগুন কুমড়ো ও আলু পড়ে আছে, কাঁচা খাওয়ার জিনিস শুধু ঐ মুড়কি। কেমন একটা ভয় জাগে হিমাদ্রির মনে, এ ভয় তার নিজের সন্ত্রস্ত মনের আকুলতা। এইভাবে যদি ঝড় বৃষ্টি আরও কিছুক্ষণ চলে, তাহলে ও একা কি করবে! সব দোকানই আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে। আরও দেরি করলে ওর অদৃষ্টে আর কিছুই জুটবে না। হিমাদ্রি তাই বর্ষাতিটা গায়ে চড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে, যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তারই সন্ধানে—হিমাদ্রি কোন দোকানে যেতে হবে তা জানে, তাই দ্রুত পদক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে চলে। এখন পৌঁছতে পারলে কিছু খাবার পাওয়া যাবে।

কিন্তু সময়টাই সব নয়। দোকানে পৌঁছতে যদি এক ঘণ্টাও লাগত, তাহলেও কিছু এসে যেত না, হয়ত এর চেয়ে সহজেই পাওয়া যেত, কিন্তু পথ যতই কম হোক না ঝড় ও জলের জন্য কিছুতেই এগিয়ে যাওয়া যায় না। কয়েক মিনিটের ভিতর কাপড় জুতা সবই ভিজে গেল, বর্ষাতি আর কত জল আটকাবে। ঝড়ের বেগ যেন ওকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। হিমাদ্রিও ছাড়বার পাত্র নয়, তবু এগিয়ে চলে।

কিছু খাবার অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর দেখে সদর দরজার সামনে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়েছে, রাস্তার ওপর কর্পোরেশন ছায়া বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গাছটা বসিয়েছিল সেইটাই আজকের ঝড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে ওদের দোরগোড়ায়।

গাছটি সরিয়ে বাড়ি ঢুকতে অনেক সময় যায়, খাবারের ঠোঙায় জল ঢোকে—কিন্তু উপায় নেই।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে পুনরায় ক্ষুধার তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে হিমাদ্রি, কোনমতে লুচি ক'খানা ও ঠাণ্ডা ছোলায় ডাল গিলে ফেলে এক গ্লাস জল খায় হিমাদ্রি,—এরপব আরামের প্রয়োজন, সিগারেট তখনও গোটাচারেক আছে, আরও কয়েকটা থাকলেই হত,—সিগারেট ধবিযে সেই খববেব কাগজটায় পুনবায় চোখ বুলিয়ে নেয় হিমাদ্রি।

সংবাদটা ইতিমধ্যেই যেন বাসি হয়ে গেছে, প্রথমবার পড়ার সময় যা মনে হয়েছিল তারও বেশি কিছু যেন জড়িয়ে আছে মুদ্রিত ঐ ক'টি অক্ষরেব ভিতর।

সহসা মনে হয় হিমাদ্রির ব্যোমকেশের দণ্ডাজ্ঞা প্রথমবাব পড়াব পর ওর মনে যে আতঙ্কেব সৃষ্টি হয়েছিল, যে বিপদের আশঙ্কা জেগেছিল, তাব সঙ্গে এই ঝড ও শিলাবৃষ্টিব কি কিছু সংযোগ আছে? বিপদেব কথাই ভাবে হিমাদ্রি, না জানি কি যেন ভযঙ্কব দিন সামনে আসছে।

কিন্তু কিছুই করাব নেই। ক'দিন আগে পথ চলতে বেতাবে ভেসে আসা ববীন্দ্রনাথেব 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে—' গানটি শুনেছিল, সেই লাইন ক'টি বার বার মনে পড়ে।

হাই ওঠে হিমাদ্রিব, আব নয, আজকেব দিনটি কাটল। কি জানি কি আছে আগামী দিনের প্রভাতে, এই কথা চিন্তা কবতে করতেই হিমাদ্রি ঘুমিযে পড়ে।

ওদিকে ঝড়েব প্রচণ্ড মাতামাতি থেমে এসেছে, নিঃস্পন্দ নিঝুম শহবে আবাব প্রাণ চঞ্চলতা ফিরে আসছে, ভেসে আসছে জনতার কলরব ও কোলাহল।

ঘরের ভিতর এক ঝলক প্রভাতী আলো এসে পড়ার সঙ্গেই চট করে হিমাদ্রির ঘুমটা ভেঙে গেল। সারারাত এক ভাবেই ঘুমিয়েছে সে। সচকিত হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু ঘুমটা অতি অস্বস্তিকর উদ্বেগে ও গ্লানিতে কেটেছে, কত দুঃস্বপ্ন কত বিভীষিকা। রাতের ঝড়ের শন্‌শনানি এখনও তার রেশ রেখেছে, বাইরে গাছের পাতায় ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি না থাকলেও উদ্দামতা রয়েছে। এই হাওয়ার আওয়াজে হিমাদ্রি বোঝে, রাতে এই হাওয়াই ঘুমের ভিতর ভেসে এসেছে, ঘুমন্ত মন ভেদ করে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। নিদ্রায় মনের গহনেব যে সব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা চাপা পড়ে ছিল, এখন জাগরণে তারা আবার সজীব হয়ে ওঠে। গায়ের ঢাকাটা খুলে ফেলে সে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাইরে গত রজনীর ঝড়ের ধ্বংসলীলাব চিহ্ন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—টেলিগ্রাফের পোস্ট কলাগাছের মত মাঝখান থেকে ভেঙে পড়েছে, এক জায়গায় কাক আর চিল মরে পড়ে আছে, গাছেব ডাল-পালায় রাস্তা বোঝাই, আর বড় বড় অনেকগুলি গাছ উপুড় হয়ে রাস্তা বন্ধ করে পড়ে আছে, তখনও কোন দোকান-পত্রেব দরজা খোলা হয়নি। হঠাৎ আবহাওয়া অত্যন্ত শীতল হয়ে উঠেছে। গায়ে রীতিমত কাঁপন লাগে।

এইবাব হিমাদ্রির মনে পড়ে গত রজনীতে কিছুই খাওয়া হয়নি। সেই কাল সকালে গিন্নীমা দুটি ভাত দিয়েছিলেন। সহসা ক্ষুধাব তীব্রতা বেড়ে উঠে। তাড়াতাড়ি নীচে রান্নাঘরে নেমে যায হিমাদ্রি, দরজা হাট করে খোলা, হাড়ি উলটে পড়ে আছে, তলায় দু'টি ভাত ছিল তা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে,—কড়ায় গোটাকয়েক মাছ একটা এলুমনিয়ামের বড় বাটিতে ঢাকা ছিল—ঢাকা ও কড়া পড়ে আছে, মাছ নেই, গেছো ইঁদুর বা বেরালে তা শেষ করে দিয়েছে। কোথাও

কিছু খাবার জিনিস নেই। ডাল আছে, চাল আছে, গোটাকয়েক আলু আছে, ব্যস্। তেল, ঘি, নুন ইত্যাদি সব কিছু গিন্নীমা চাবি দিয়ে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল একটা গ্ল্যাক্সোর খালি টিনের ভিতর কিছু চিঁড়া।—চায়ের সরঞ্জাম আছে, দুধ নেই। কতকগুলি পুরাতন কাগজ সংগ্রহ করে উনুনের ভিতর আগুন ধরায় হিমাদ্রি। জল গরম করে চা খেতে হবে, বিনা দুধেই। তারপর কিছু চিঁড়া জলে ভিজিয়ে দেয়, চিনি দিয়ে খাওয়া যাবে।

যে রকম অবস্থা—দোকান পাট কখন যে খুলবে কে জানে। এই খাদ্যটুকুও যে ছিল, তার জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ। এও একরকম জুয়া, কাল যা ঘটে গেছে তার পর হিমাদ্রির এভাবে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য! জীবনের ঘোড়দৌড়ে ও বেঁচে থাকার বাজী ধরেছে আর জিতেছেও। ওর হৃদয় সেই বিজয়ের আনন্দে পরিপূর্ণ। হিমাদ্রি আত্মবিশ্বাসী। ওর ধারণা ওর চরিত্রে আছে অসীম দৃঢ়তা। নিজের মতলবে সে কাজ করে, নিজেকে বাঁচিয়েই করে, আর পরিণামে তারই জিত। এভাবে জীবনটাকে বিপন্ন আর কোনদিন সে করেনি, শুধু দৃঢ়তা ও সহনশীলতার বলেই সে বেঁচে গেছে। এখন হিসাব-নিকাশ করতে বসে হিমাদ্রির মনে পড়ে আজীবন এই রকম বহু বিপদের মুখে সে পড়েছে, নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রভাবে সে বেঁচে গেছে। সেই ক্ষমতাটুকু ও ত সৎপথে চালিত করতে পারত। ভেবে দেখে হিমাদ্রি—যাই কিছু করে থাকুক, যতটুকু লাভ ওর হয়েছে তার অনুপাতে ক্ষতিও কম হয়নি, একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন বহন করে চলেছে মাত্র। না করল সৎভাবে দেশের কাজ,—না করেছে অর্থসঞ্চয় বা জ্ঞান সঞ্চয়। কেবল হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়িয়েছে।

কলেজে পড়ার সময় কি ভাবে দিনগুলি উড়ে গেছে। কি করা যাবে এইটুকু চিন্তা করতেই দেখা গেল চারটে বছর কোথায় উড়ে

গেছে—একথা ভাবলেও আজ হাসি পায়। হিমাদ্রিই একদিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনের টাকা স্কলারসিপ পেয়েছিল, ইণ্টারমিডিয়েটে দ্বিতীয় ডিভিসন, আর বি, এ-তে কোনমতে।

কিন্তু এই কলেজই ওর কাল, ওর মত কূটবুদ্ধি ছেলে কলেজের উদ্দাম জীবনের হাল্কা ছন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, কখনও ভেবেছে দেশের কাজ করি, গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়ে জীবনটা বিলিয়ে দিই, আবার কখনও জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলেছে। সব কিছুর মূলে ছিল কল্পনা-বিলাসী রোমাণ্টিক মন, সেই রোমান্স বুভুক্ষার ফলেই পাওয়া গিয়েছিল ব্যোমকেশের মত বন্ধু, বুদ্ধিমান না হলেও সে সৎ, সকল কাজে ছিল তার সমান আন্তরিকতা। তাই ওদের ভাব এত জমেছিল, এতদিন টিঁকে ছিল। হিমাদ্রি আজ বসে বসে ভাবে, যেভাবে ও দিদি বা পুষ্পময়ীকে এতদিন নিরাশ করে এসেছে, আজ কি নিজের কাছেও সেই নৈরাশ্যেরঃ কারণ হয়ে দাঁড়াবে? সত্যই কি নিষ্ফল হয়ে যাবে ওর জীবন। ওর এই প্রখর বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান ব্যর্থতায় শেষ হবে?

এই মানসিক অবস্থাতেই হিমাদ্রি পুরাতন কাগজ পুড়িয়ে চায়ের জল গরম করে, বিনা দুধেই চা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করায় চায়ের জল ফুটল! এলুমিনিয়মের কেট্‌লিটা উনান থেকে নামাবার সময় হিমাদ্রির নজরে পড়ে গত সন্ধ্যার এক পয়সার টেলিগ্রাম—বড় বড় অক্ষরে ব্যোমকেশের নাম ছাপা রয়েছে। তৎক্ষণাৎ অসীম ঘৃণা ও বিরক্তি ভরে কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয় হিমাদ্রি।

আর ব্যোমকেশের কথা চিন্তা করতে ভাল লাগে না, কিছুতেই ওকথা মনে আনতে চায়না, ভুলতে চায়। সমস্ত ধুয়ে মুছে যাক্, পুরাতনের এতটুকু স্মৃতি যেন ওর পথে বাধা হয়ে এসে না দাঁড়ায়। সব শেষ হয়ে যাক্, চুকে যাক্!

কিন্তু কিছুতেই তার হাত থেকে নিস্তার নেই, পরিত্রাণ নেই। খবরের কাগজখানি হাতে পড়া মাত্র যে কথা মনে জেগেছে, তা মোছে কার সাধ্য। জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে অতীতের ঘটনাবলী, যেন ছায়াচিত্র। সেই হিষ্টিরীয় অবস্থায় হিমাদ্রির মনে হয়, যেন ব্যোমকেশ সশরীরে এসে হাজির হয়েছে। রাগে, ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিউরে ওঠে হিমাদ্রি। ব্যোমকেশ জেলে আজ নিরাপদ নিশ্চিন্ততায় বিশ্রাম করছে। আর সে মুক্ত, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল।

অদৃষ্টের এই ত পরিহাস! ওদের সান্নিধ্য ও সংঘর্ষের এই পরিণতিই নিয়তি এনেছে। একজনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরের নির্বুদ্ধিতায় এই অবস্থা ঘটেছে। কিন্তু হিমাদ্রি মরবে না, নিজেকে সে মরতে দেবে না, আবার বেঁচে উঠবে সে, নতুন করে বাঁচবে। হিমাদ্রির মনে হয় চীৎকার করে বলে ওঠে—'আমি বাঁচতে চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই।'

চিঁড়ে ও চা খাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ে অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে। শ্রান্ত হিমাদ্রি কিছুক্ষণের ভিতরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—বহির্জগতের সঙ্গে আর তার সংযোগ থাকে না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দুপুর কেটে গেছে, এতক্ষণে আকাশে একটু আলো ফুটেছে। সারা বাড়িটিতে পায়চারি করে বেড়ায় হিমাদ্রি, আর ভাবে, এ-বাড়িতে আর নয়, এই নিদারুণ শূন্যতা আর সয় না।

যে মুহূর্তে এই কথা মনে হল, তখনই তার বাড়ি ছাড়ার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে, বাড়ি ছেড়ে যে কি করবে আর ভেবে পায় না, শুধু ভাবাবেগের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে স্থির করে হিমাদ্রি। তাড়াতাড়ি দু'চারখানি কাপড়-চোপড় প্যাকেটে বেঁধে তখনই বেরিয়ে পড়ল হিমাদ্রি।

আর এ বাড়িতে সে ফিরবে না।

পথে বেরিয়ে হিমাদ্রি ভাবে গত রজনীর ঝড়ের মত ওর জীবনেও ঘটেছে এক মহা-বিপর্যয়,—পিছনের যা কিছু আজ মুছে গেছে, সামনে কি আছে কে জানে—কোনও পরিকল্পনা নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, হৃদয় ওর আজ বুঝি ভেঙে পড়েছে—নিবিড় তিমির ভেদ করে আজ তাই ও ছুটে চলেছে নবীন উষার সন্ধানে।

সেইদিন অপরাহ্নে সারা শহরটায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াল হিমাদ্রি। উদ্দেশ্যহীন ও অন্যমনস্ক হিমাদ্রি একটা দোকানেই একা একা একঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে—বহু পরিচিত কলিকাতার পথে ঘাটে আলো জ্বলে ওঠে, তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত হিমাদ্রি সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে যে, সে দিদির বাড়ির পথ ধরেছে। দোকান তখনও জমজমাট। চারিদিকে আলো জ্বলছে, হিমাদ্রি পাশের সরু দরজাটা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে।

ছায়ামূর্তির মত নীরবে হিমাদ্রি দিদির সামনে এসে দাঁড়ায়।

এই আগমনের প্রতীক্ষাতেই যেন দিদি বসেছিলেন। তিনি শুধু বললেন—'হিমু এলি, আয় এদিকে আয়—'

দিদিকে অনুসরণ করে হিমাদ্রি ধীরে ধীরে দরজার ধারে এসে দাঁড়ায়। আলমারির গায়ে লাগান লম্বা আরশিতে ওর দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে—সেইদিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হিমাদ্রি।

বিগত সপ্তাহের দুঃখকর অভিজ্ঞতার চিহ্ন ওর সারা দেহে বর্তমান। সে শুধু ম্লান হেসে চেয়ারে বসে পড়ে।

দিদি সামনে দাঁড়িয়ে বলেন—'একটু কিছু খাবি হিমু, হাঁপিয়ে পড়েছিস দেখছি—।'

হিমাদ্রির উদ্বেগাকুল আকৃতির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দিদি। তিনি সস্নেহে বলেন—'এত রোগা হয়ে গেছিস কেন রে?'

হিমাদ্রি অতি মৃদু গলায় বলে—'ভাবলাম তোমাদের এখানেই দু'চার দিন কাটিয়ে যাব। বড্ড শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

আনন্দ, অভিমান ও উচ্ছ্বাসে দিদির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। এই দিনটির আশাতেই তিনি এতদিন বসেছিলেন। আজ এতদিন পরে ক্লান্ত বিহঙ্গ ফিবে এসেছে পুরানো দিনের বাসায়—এবার আর ওকে ছাড়া হবেনা।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল পুষ্পময়ী, সহসা সেদিকে নজর পড়ায় হিমাদ্রির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কেমন যেন একটা শীতল শিহরণ সারা গায়ে লাগে। হিমাদ্রির কেমন যেন মনে হয়—পুষ্পময়ীর মুখে একটা নূতন দৃঢ়তার ছাপ, কেমন একটা কাঠিন্য। অথচ এ অবস্থা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। হিমাদ্রি এসেছে শুনে আর সবায়ের মত সে-ও উপরে উঠে আসছিল ওকে দেখার জন্য—কিন্তু সকলের মত উত্তেজনা ও আবেগের লেশমাত্র ওর মনে নেই।

হিমাদ্রিব দিদিব মত ওর মনে এত আনন্দ জাগেনি। হিমাদ্রির এই আবির্ভাব ওর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, সে এই মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হয়েই যেন আছে।

সহসা তাব মনে পুরাতন কথা জাগে, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ওকে যা বলেছিল সেইসব কথাগুলি মনে জাগে—যে রাতে ব্যোমকেশের ধরা পড়ার খবর প্রকাশিত হয়, সেই দিনই রাতে পুষ্পময়ী তাকে সতর্ক করে অনেক কথা বলে এসেছিলেন। বলেছিলেন—'তুমি ফিরে এস, নতুন করে আবাব জীবনটাকে বাঁধ।'

পুষ্পময়ীর সেই রাতের হুকুম আজ এতদিন পরে হিমাদ্রি তামিল করেছে। আজ এতক্ষণ ও ভেবেছে, তাবপব এখানে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে। কিছু পরিমাণে কথাটা সত্য, ওর ইচ্ছারই পরিণতি সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মূলে রয়েছে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ঘোষিত পুষ্পময়ীর সেই হুঁশিয়ারি।

এই মুহূর্তে সেই কথা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করা যায় না। পুষ্পময়ীর কাছে মাথা নত করতেই হবে। হিমাদ্রি মনে মনে ভাবে, যদি কোনদিন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, সেইদিনই আবার পুষ্পময়ীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

পুষ্পময়ী আজ আর কোনও অবসর দেবেন না, দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গেই পুষ্পময়ী বলে উঠেন—'এখানে যদি থাক হিমু, তাহলে নিজের পায়ে ভর দিয়েই থেক। বড়দির মাথায় হাত বুলিয়ে চলবে না—'

পুষ্পময়ী কি বলতে চান, তা শোনার অপেক্ষায় থাকে হিমাদ্রি—পুষ্পময়ী বলেন—'তোমার গাড়ি আছে, গাড়িটাকে বিক্রী করে একটা লরি কেন। মাল বইলে অনেক টাকা হবে, বড়দিদেরইত মাসে কত টাকা গাড়ি ভাড়া দিতে হয়। এই থেকেই তোমার একটা ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে।'

হিমাদ্রি গম্ভীর গলায় বলে—'কথাটা ভাল, চেষ্টা করব।'

প্রস্তাবটা সহজ, যুক্তিযুক্ত, লোভনীয়। তাব মনে কথাটা লাগে, সেই প্রস্তাবের মাদকতায় ওর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ভাব-প্রবাহের প্রাথমিক ঘোর কাটিয়ে সে আবাব বলে—'তোমার কথাই শুনব পুষ্পদি, দেখি কি করা যায়।'

পুষ্পময়ী মাথা নেড়ে বলেন—'কথাটা ভাল কবে ভেবে দেখ ভাই, তোমার ভালই হবে।'—পুষ্পময়ী চলে গেলেন।

হিমাদ্রি ভাবে ওঁর এই কথাগুলি সবল যুক্তি, সদিচ্ছা-প্রসূত প্রস্তাব, না সতর্কবাণী?

তৃতীয় পর্ব

পুষ্পময়ীর প্রস্তাবটা ভাল করেই ভেবে দেখে হিমাদ্রি,—সত্যই ত আর কি-ই বা করার আছে, পুরাতন জীবনের অবসান ঘটেছে, যে-জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে আবার তার ভিতর গিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ নেই, সেই উত্তেজনার আস্বাদ গ্রহণ করার মত মানসিক অবস্থা নেই, সামনে পড়ে আছে জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি। এখন একটা পথ বেছে নিতে হবে।

ধীরে ধীরে মনে এক একটি কথা ভেসে ওঠে, পুরাতন দিনের কিছুই ত ধুয়ে মুছে যায় নি, আছে সেই পুরাতন আশা ও আকাঙ্খা। সেই অদম্য আকাঙ্খা আবার মনে জেগে ওঠে।

জীবনের ত এই বসন্তাভাষ। সৌভাগ্যের সন্ধানে ফিরতে হবে, অর্থ চাই, সম্পদ চাই, সম্মান চাই। কেন পারবে না? হটবে না সে কিছুতেই। এতদিন ত ভাগ্যলক্ষ্মী ওকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন—জীবনের সেই দুঃখ রাতে সেই ভাগ্যসূর্য বহুবার উদিত হয়েছে, সে উদয় ছিল কুয়াশায় ঢাকা—তার পরিপূর্ণ সুযোগ সেদিন সে নিতে পারেনি, এখন পুষ্পময়ীর পরামর্শানুসারে আর একবার চেষ্টা করে দেখুক না কেন, একটা সুযোগ নিতে দোষ কি?

পুষ্পময়ীর সঙ্গে পরদিন দেখা হতে হিমাদ্রি বলে—'তোমার কথাটাই ভাবছিলাম। একটা কিছু করতে ত হবে, গাড়ির কাজটাই না হয় ধরা যাক। অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখি।'

পুষ্পময়ী নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলেন—'বেশ ত, এখনই শুরু করে দাও, নিজের গাড়ি ত রয়েছে।'

—'ওটা ত বেবী কার, তাও পুরানো, টাকা চাই পুষ্পদি, একটা লরি না হলে কাজ চলবে না। আর লরি ত অমনি হবে না, এককাঁড়ি টাকা চাই।'

পুষ্পময়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে দীপ্ত ভঙ্গীতে বলেন—'হিমু, চালাকি কোরোনা, এখান থেকে একটা পয়সাও তুমি নিতে পারবেনা। নিজের পায়েই তোমাকে দাঁড়াতে হবে।'

হিমাদ্রি কিছু বলে না,—মুখ টিপে থাকে, পুষ্পদির অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে আশাভঙ্গ হয়নি। নূতন উদ্যম ওর মনে জেগেছে। নতুন ভাবপ্রবাহ মাথায় তরঙ্গায়িত—কল্পনার উদ্দাম ঘোড়া অনেক দূরে ছুটে গেছে।

এখন সময় এসেছে পরীক্ষার, তার মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মনের কোথায় এই রকম একটা কাজের জন্যই জমি তৈরি ছিল, আজ সেই বাসনাই প্রবলতব হয়ে উঠেছে। এই ত ওর জীবন। জীবনটা এই একদিক দিয়েই গড়ে তুলতে হবে। বিগত জীবনেব প্রতিটি অলস মুহূর্ত যে এর জন্যই ব্যয়িত হয়েছে—আবাব স্টিয়াবিং ধরে শহরেব পথে পথে ঘুবে বেড়াবে। এবাব ভবঘুরের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ নয়। এবার শুরু হল কর্মজীবনের, জীবিকার প্রয়োজনেই ঘুরতে হবে, মানুষ হতে হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করতে। অতএব খেয়ালের বশে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা যে এভাবে এতদিনে ফলে যাবে, তা কে জানত। এবারে ঘোরা নিরর্থক নয়, তাব বিনিময়ে আসবে অর্থ ও সম্পদ, গড়ে উঠবে একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

এখন দূর থেকে দাঁড়িয়ে সেই ফেলে আসা অতীতের ছবি নিস্পৃহ

দর্শকের চোখে দেখে—কিন্তু তাতে ব্যথা ও বেদনা বাড়ে, জ্বালায় অন্তর ভরে যায়, যে অপ্রীতিকর দৃশ্য মুছে ফেল্‌তে চায় মন থেকে, তাই স্পষ্টতর হয়ে ফুটে ওঠে।

পুরাতন জীবন শেষ হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি তার অবসান ঘটেছে? ব্যোমকেশ ও তার সংঘাতের সমাপ্তি ঘটেছে,—কিন্তু সত্যিই কি তাই? তার শেষ অংকের প্রতিধ্বনি তখনও শহরের পথে পথে অনুরণিত। সব সময়েই তা কানে এসে বাজে,—যেন তাকে আঘাত দেওয়ার জন্য, উৎপীড়িত কবার জন্যই যেন একটা অদৃশ্য চক্রান্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে যায়, যেখানে দাঁড়ায়, সর্বত্রই ঐ একই কথা—'আহা বেচারা ব্যোমকেশ। বরাত ওর খারাপ—নইলে অমন লোক, কত গরীবের মা-বাপ, নিশ্চয়ই ও খুন করেনি, অন্ততঃ বুঝে-সুঝে করেনি। কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভিতর—কে জানে? আহা অমন লোক।'

এই 'আহা' এবং 'অমন লোক'টুকু হিমাদ্রির কানে বিষ ঢেলে দেয়। ব্যোমকেশের ওপব কেন এই সর্বজনীন সহানুভূতি।

মনে মনে তাই বিড বিড কবে হিমু—'আহা বেচারী ব্যোমকেশ। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর—যত সব—'

এই ধরনের লোকজনের সঙ্গেই সর্বত্রই দেখা হয়—হিমাদ্রি মাঝে মাঝে ভাবে ইচ্ছা কবেই ওরা তাকে কথা শোনায় নাকি। কি ওদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা না হলেও হয়ত হিমাদ্রি কষ্ট পেত, গোড়ার দিকে যেমন কষ্ট পেয়েছে বিবেক দংশনের জ্বালায়। কারণ যে সব জায়গায় অতীতে ব্যোমকেশ আর সে একত্রে ঘুরেছে, সেই সব জায়গা এমনই স্মৃতিবিজড়িত যে, ব্যোমকেশের কথা চিন্তা না করেও থাকা যায় না। সব চাপা দিয়ে সে পরিচিতদের বলে,—'এই একট ছোটো-খাটো বিজনেস্ ধরেছি ভাই, একখানা লরি নিয়ে শুরু করেছি,

আর একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কেনার তালে আছি। কাজকর্ম সন্ধান পেলে একটু বোলো ভাই।'

সব সহ্য করতে পারবে হিমাদ্রি, সবই সয়ে যাবে। অলস মুহূর্তে বসে বসে অতীত জীবনের মিছিল দেখবে নীরবে। চিন্তা করবে, জয় না পরাজয়, কি হয়েছে তার জীবনে। মুছে ফেলে দেবে, নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেবে অতীতের দিন। কিন্তু এখনও একজন আছে—তার ভয় কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যায় না—এখনও তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

তার সঙ্গে দেখা করতেও ভয় হয়, মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় সহসা তার কথা মনে জাগে,—সে জানে ওর প্রতি সত্যকার সহানুভূতি থাকলেও—হিমাদ্রি কিছুতেই সামনে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করে উঠতে পারেনি। ওর চোখের সামনে হিমাদ্রির সংশয়-সংকুচিত মন উদ্বেল হয়ে উঠবে।

তবু মনে হয় শহরের পথে ঘোরাঘুরি করতে এক সময়ে কোনখানে সহসা তার দেখা মিলবে। সেই মুহূর্ত অবশ্যম্ভাবী। তারপর হয়ত ওর স্বীকারোক্তি সে আদায় করে নেবে।

ইতিমধ্যে ওর নতুন ব্যবসায়ে বেশ লাভ হতে লাগল। ব্যবসাবুদ্ধি ওর ছিলই, এখন সেই ব্যবসাবুদ্ধির সঙ্গে কৌশল মিশিয়ে অল্পদিনের ভিতরই হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে গেল। ছোটো-খাটো দোকানদার, চুন-সুরকির ব্যবসায়ী, আসবাবপত্রের সরবরাহকরা হিমাদ্রির গাড়িটার সুবিধা ও উপকারিতা বুঝল। অল্প লাভে কাজ করত বলে সবাই আগ্রহভরেই ওকে কাজ দিতে লাগল।

কাজটা কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য। শুধু চিরদিনের কাম্য অর্থ ও সম্পদের মোহতেই এই নতুন নেশায় মেতেছে হিমাদ্রি। তার কর্মপ্রেরণার মধ্যে এইটুকুই শক্তি সঞ্চার করেছে। এই সঙ্গে আর একটা কঠিন কাজ

জুটেছে—অতীতের বদনামকে সহসা সুনামে পরিণত করার চেষ্টা করতে হচ্ছে। চারিদিকেই তার বদনামটাই প্রবল হয়ে আছে। যে জগৎ থেকে সরে এসেছিল আবাব সেইখানে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই অপমান, বিদ্রূপ ও শ্লেষ সহ্য করেও নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে।

বাড়ি ফিরেও কি শান্তি আছে, সেখানেও একটা থমথমে ভাব, সবাই সেখানে সন্দেহের চোখে দেখে। অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব সবায়ের মনে। সারাদিন ধবে শহবে যা করে আসে ঘরেও তাই করতে হয়—এখানেও যে তার বদনাম।

রাগ হয়, সে কি সৎভাবে সৎপথে চলছে না, ব্যবসা কবছে না! তবু কেন এই সন্দেহ আর অবিশ্বাস? দিদিব কাছ থেকে কিছুই সাহায্য পাওয়া গেল না, পুষ্পদি ত চটে উঠলেন। তিনি ইচ্ছা কবলেই পাঁচ-সাতশো টাকা দিযে দিতে পাবেন। অথচ তিনি একেবারে অচল, অটল—তাঁকে চটাতেও সাহস হয় না। হিমাদ্রি পুষ্পময়ীকে ভয করে, তিনি ওব জীবনেব অনেক গোপন কথা জানেন —সেইখানে তাঁর সুবিধা, ববাববই তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে হিমাদ্রি, কিন্তু পারেনি, হাঁপিয়ে পড়েছে। জীবনের সকলদিকই যেন তিনি পথ বোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

হিমাদ্রি বলেছিল—'পাঁচ-সাতশো টাকা যদি দিতে, তাহলেই আমি দাঁড়িযে যেতাম। একটা লরি হলে আমি কি না করতে পারি?'

পুষ্পময়ী বলেন—'কি করবে অত টাকা নিয়ে শুনি?'

হিমাদ্রি ভাবে পুষ্পময়ী বুঝি প্রকৃতই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে, তাই সে উৎসাহভরে বলে: 'কেন লরি করতে পারলে আরও কাজ পাওয়া যাবে, একসঙ্গে বেশি কাজও কবা চলবে।'

—'নিজেই করে নেবে একদিন।'

উত্তেজিত হিমাদ্রি বলে—'তাহলে তোমার কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পাবনা ?'

পুষ্পময়ী ওর মুখের পানে তাকালেন, সে দৃষ্টি কঠিন বা কঠোর নয়, বা উপেক্ষার ভাব সে দৃষ্টিতে প্রতিফলিত নয়। কিছুক্ষণ পরে পুষ্পময়ী বলেন—'হিমু, ভিক্ষায় কাজ হয়না, নিজের ক্ষমতায় সব করাই ভাল। কারও কাছে সাহায্য চেয়োনা। পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াও।'

কোন জবাব দেওয়ার পূর্বেই পুষ্পময়ী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। হিমাদ্রি ভাবে পুষ্পময়ীর মেজাজটার এমন পরিবর্তন হল কেন ? কারণটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে হিমাদ্রি, আকাশ-পাতাল ভাবে, কিছুই ভেবে পায়না।

অশান্ত হৃদয়ে ভেসে বেড়াতে বহু কথা মনে জাগে—কত বিচিত্র সমস্যা—কিন্তু কিছুরই কিনারা হয়না। বহুমুখী চিন্তা—ব্যোমকেশ, বকুলরাণী, দিদিমনি আর পুষ্পময়ী। সকলের অন্তরেই সে আঘাত দিয়েছে,—কিন্তু আশ্চর্য শুধু বকুলের জন্যই ওর মনটা কাতর হয়ে আছে।

একদিন কোনমতে পুষ্পময়ীকে বকুলের কথা জিজ্ঞাসা করল হিমাদ্রি—'বকুলের সঙ্গে দেখা হয় ?'

একটুও ইতঃস্ততঃ না করে পুষ্পময়ী বলে ওঠে—'না, সেই ঝড়ের রাতে বকুলের একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়, হাঁসপাতালে দু'মাস পড়ে থাকার পর ভাঙা পা নিয়ে বাড়ি ফিরে বকুল আবার নিমোনিয়ায় ভুগেছে একমাস—এই সব ব্যাপারে অনেকদিন কামাই হওয়ায় স্কুলের চাকরিটিও গেছে।'

আন্তরিক দরদ জানিয়ে হিমাদ্রি বলে ওঠে—'আহা! শেষটায় চাকরিটাও গেল, এর নাম স্বদেশী প্রতিষ্ঠান।'

পুষ্পময়ী কোন কথা বললেন না।

'সে এখন কি করছে ?' হিমাদ্রি আবার প্রশ্ন করে।

—'টেলিফোনের অফিসে কাজ হয়েছে, মাইনেও ভাল।'

পুষ্পময়ী ওর এই অহেতুক আগ্রহ লক্ষ্য করছেন কিনা সে কথা চিন্তা না করেই বকুল সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল—বকুলের সংবাদের জন্য সে আকুল হয়ে আছে।

—'ওর যখন অসুখ করেছিল বা হাঁসপাতালে—তখন দেখাশোনা করতেন নাকি?'

—'প্রায় প্রতিদিনই যেতাম।'

পুষ্পময়ী বেশি কথা বলতে চান না, বকুল সম্পর্কে কি যে হিমাদ্রি শুনতে চায় তা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না—উত্তরদানে তাঁর এই অনিচ্ছা দেখে হিমাদ্রি রাগে জ্বলতে লাগল, কিন্তু তা প্রকাশ না করে চুপ করে গেল। নিজের ওপর ওর তেমন বিশ্বাস নেই, রাগ প্রকাশ করলে পুষ্পদিও রাগ করতে পারেন—তিনি হয়ত অনেক কথা ফাঁস করে ফেলবেন। কি করে ওকে জব্দ করতে হয় তা তিনি জানেন, তাই হিমাদ্রির চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি!

সব জড়িয়ে মনের ভিতর একটা গতির আবেগ আসে। অতীত থেকে হটে এসে নূতন পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে একটা সুনাম অর্জনের নেশা হিমাদ্রিকে পেয়ে বসেছে। সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্যই হিমাদ্রির এত তাড়া। এখনও সামনে অনেক পথ—বিস্তীর্ণ বাধা। শুরু করেছে দেরিতে, বয়স ত্রিশের কোঠা পেরিয়েছে। এতদিন পথে বিপথে দিন কেটেছে—ব্যোমকেশের সঙ্গেই কত সময় নষ্ট হয়েছে—এখন নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।

ব্যবসাও এগিয়ে চলেছে, ছোটখাটো কাজ পাওয়া যাচ্ছে আর তারই ফলে কিছু কিছু সঞ্চয়ও হয়েছে, এখন লরি কিনে প্রথম কিস্তি হিসাবে দেয় টাকা ওর হাতে জমেছে।

লরি কেনাটা ওর কাছে যেন নব জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ব্যবসা জগতে ওর সেই হবে সাফল্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—ব্যবসায়ী মহলে ওর ছোট বেবী গাড়ি অবশ্য হাসির উদ্রেক করলেও ওর বর্তমান কাজের একটা বিজ্ঞাপনের কাজ করে। সকলেই জেনেছে হিমাদ্রিকে দিয়ে কি ধরণের কাজ পাওয়া যাবে। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরে স্বপ্ন দেখে নতুন লরি কেনা হয়েছে আর তার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—'হিমাদ্রি'। স্বপ্নের আর শেষ নেই, সেই একখানি লরি ক্রমে সংখ্যায় বাড়ছে, ওয়ালফোর্ডের মত বড় ব্যবসা হয়ে উঠছে হিমাদ্রির—সেই সব এঞ্জিনের গর্জন সে শুনতে পাচ্ছে, কর্মচারীরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাড়ি বাইরে যাওয়ার আগে হিমাদ্রি শেষ নির্দেশ দিচ্ছে। নিজের পরিশ্রম ও আত্ম-বিশ্বাসে এতবড় ব্যবসা গড়ে উঠেছে।

হিমাদ্রির দৃঢ়-বিশ্বাস, এ স্বপ্ন সে সার্থক করে তুলতে পারবে।

ভবিষ্যতের এই সোনার স্বপন দিন দিন ওর মনে আরও গভীর হয়ে বসে। শহরের পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট গাড়িখানি নিয়ে ছুটে চলে শুধু ব্যবসার সাফল্যের খাতিরে বা গাড়ির নেশায় নয়, তার ধারণা যতই সে উপরে উঠবে ততই তার অখ্যাতির শেষ হবে। পুষ্পময়ীর কাছে ওর শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে চায় হিমাদ্রি, তাঁর বিরূপ মনোভঙ্গীর অবসান ঘটাতে হবে। পুষ্পময়ীর ধারণার ত্রুটি জানিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়—সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। আগ্রহ ও উৎসাহে যেন তার শ্বাস রোধ হয়ে আসছে।

এই গতিবেগ সাফল্যের পথে চালিত করলেও প্রথম ধাক্কাটা এল এই দিক থেকেই, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি সতর্কবাণী জানিয়ে দিল। একদিন দুপুরে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে একটা ছোট ছেলেকে ধাক্কা মারল—পথচারী জনতা ভিড় করে ঘিরে ধরল, তখনও জনতা আইন

নিজের হাতে নেয়নি, তাই সকলে কার কতটা দোষ সেই বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক শুরু করল।

হিমাদ্রি রেগে আগুন, সবাই যেন তার বিপক্ষে,—সে বলে ওঠে—'সোজা সামনে এসে পড়েছে, তবে ঠিক সময়েই ব্রেক করেছি, কিছুই হয়নি হয়ত—থাকগে তর্কে প্রয়োজন নেই, দেখা যাক—'

ছেলেটা সাইকেল তুলে নিজেই গায়ের ধূলা ঝাড়তে লাগল,—হিমাদ্রি ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—'লেগেছে নাকি? ওরকম রং সাইডে আসে?'

হিমাদ্রি ছেলেটিকে মোটরে তুলে নিতে চায়—সহসা পিছন থেকে পাহারওলা এসে বলে—'ছোড়িয়ে—কেস ত লিখনেই পড়েগা।'

হিমাদ্রির তাড়া ছিল, বাধা পড়ল, সে উত্তপ্ত হয়ে বলে—'এর আবার কেস কি?'

—'সমঝ্ মে নেই আতা কেয়া কেস?'

এরপর প্রচুর বাকবিতণ্ডা এবং জেরা ও পাল্টা জবাব চলল।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলে ওঠে—'ওরা যখন ধরেছে তখন কি ছাড়বে, তাকে কাজ কি হিমু—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—কথায় কথা বেড়ে যাবে—'

হিমাদ্রি ভিড়ের লোকটিকে খোঁজার চেষ্টা করে—পরিচিত লোক, রেসের মাঠের বন্ধু। লোকটি আবার বলে—'একটা টিপ দিচ্ছি, পাহারওলার সঙ্গে ভাই তর্ক কোরোনা—যা বলে শুনে যাও।'

হিমাদ্রি আহত অভিমানে বলে ওঠে—'লোকটা মিথ্যা কথা বলছে যে!'

—'না, তা নয়, ও যা বলছে তুমি তর্কে তা বাড়িয়ে তুলছ, পুলিসের কাছে তর্ক চলেনা।'

পাহারওলা নোট বইটিতে সকল কথা টুকে নেয়।

হিমাদ্রি রাগে জ্বলতে থাকে—তারপর বেবী-কারের স্টিয়ারিং ধরে। প্রায় এক ঘণ্টাব ওপর সময় নষ্ট হল, একটা পার্টির সঙ্গে কনট্রাক্ট স্থির হবার কথা ছিল, সবই বোধ করি ফেঁসে গেল।

পরদিন অনেক হেফাজতেব পর প্রায় সাড়ে বারোটার সময পুলিসের আদালতে মামলা উঠল। রাতারাতি হিমাদ্রি ভারসাস্ কিং এমপারার সাতপাতা কেস তৈরি হয়ে গেছে—অনেক কথার পব ফাইন হল পঞ্চাশ টাকা, 'পুওর ফণ্ডে' দিতে হবে। বিচারকর্তা পুলিস সাহেব অতি সদাশয়—হিমাদ্রিকে বললেন—'ফিউচারে একটু সাবধান হবেন।'

পঞ্চাশ টাকা,—বড কম নয়, বক্ত জল করা পয়সা। সেই পয়সা দিতে গায়ে বড লাগে। টাকাটা দিতে মন সবেনা, তার চেয়ে সাতদিন জেলখাটা ভাল—কিন্তু টাকার চাইতেও যে জিনিসটা বিশেষ করে পীড়া দিতে লাগল, তা হল তার সোনাব স্বপনেব সাফল্যের পথে এই আকস্মিক বাধা—তাব কেমন মনে হয পুলিস এখনও ওর পিছে লেগে আছে। ব্যোমকেশেব সঙ্গে জড়িয়ে কোনরকমে একটা মামলা খাড়া করার তালে আছে।

অর্থের চাইতে অন্যদিক দিয়েও এটা একটা অস্বস্তিকব শাস্তি, সর্বদাই মনে হয়. পুলিস সন্দেহভরে প্রতিপদক্ষেপে লক্ষ্য রেখেছে, এ এক অসহনীয় অবস্থা।

তার সকল প্রচেষ্টা ও উচ্চাকাঙ্খার জৌলুষ চলে গেল। পুলিস-কোর্টের ব্যাপাবটা দিদিমণি ও পুষ্পময়ীব কানে গিয়েছে তাঁরা ওর কথা শুনতে বা ওব স্বপক্ষীয যুক্তি মেনে নিতে নাবাজ, ওকে উৎসাহিত করতেও আপত্তি।

ওঁরা বলেন—'ছিঃ ছিঃ। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, ছোট ছেলে, যদি মরেই যেত।'

—'কি মুস্কিল, আমার মোটেই দোষ নেই, ছেলেটাই—'

—'তর্কে কি প্রয়োজন হিমু, এ বিষয় আর আলোচনা না হওয়াই উচিত।'

হিমাদ্রি বোঝে ওঁদের মনোভঙ্গী, ওঁদের চোখে সে এখনও অপদার্থ, উচ্ছৃঙ্খল। কিভাবে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তিত হবে কে জানে? হিমাদ্রির একটা আবছা ধারণা ছিল যে, ওর সাফল্যে হয়ত ওঁদের চৈতন্য হবে। সাফল্যই তার সুনামের সহায়ক হবে। হিমাদ্রি জানে সর্বদাই তার পিছে যুক্তি বা সাধুতা থাকেনা, তবু সারা পৃথিবী সাফল্যটাই বড় করে দেখে, বদনামের ওপর সাফল্যের চুনকামে সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ধাক্কাটা খাওয়ার পর ওর অগ্রগমন ব্যাহত হল। গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে এল। সেই 'অন্যায়' জরিমানায় ওর উৎসাহ আহত হয়েছে। এখন প্রয়োজন নূতন উৎসাহের—যা এই আঘাতে প্রলেপ সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু কে দেবে সেই উৎসাহ? দিদিমণি ও পুষ্পময়ীর কাছে দীর্ঘকাল ধরে একটা নিরুৎসাহের শীতল উপেক্ষার পর এই বিপর্যয় তাকে আশাহত করেছে, পুষ্পময়ীর অবিশ্বাস বা দিদিমণির সন্দেহ সে দূর করতে পারে অল্প চেষ্টায়—কিন্তু সারা শহরের কাছে কি নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে, কেমন যেন সাহস হারিয়ে গেছে।

হিমাদ্রি মনে মনে ভাবে, কেন এই দুর্বলতা, আগের দিনে যা কিছু করেছে তার পাশে পেয়েছে ব্যোমকেশের অখণ্ড সমর্থন, অকুণ্ঠ উৎসাহ। এখন কিন্তু সে সম্পূর্ণ একা, এই হতাশার হয়ত এইটুকুই প্রবল কারণ। তবে এইটুকুই ভরসা অনুকূল পবনে সবই আবার ঠিক হয়ে যাবে, আবার কাজ করে যাবে, সাফল্যের সন্ধানে ছুটবে।

এরপর এল গ্রীষ্মকাল···পিচঢালা কলিকাতার রাস্তা দিনের প্রচণ্ড

সূর্যালোকে উত্তপ্ত হয়ে থাকে। যা একটু হাওয়া বয়, তা ধূলা উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। গাড়িখানা এখন সাবধানে চালান প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত ব্যবহারে গাড়িটা ক্রমেই জীর্ণ হয়ে আসছে। একদিন ত পথের মাঝখানে বিকল হয়ে পড়ল, পথে তখন খুব ভিড়। পাহারওয়ালা, অন্য গাড়ির ড্রাইভার ও উৎসাহী পথিকরা নানাবিধ গালিগালাজ করে গাড়িখানি ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু এঞ্জিনটা ঠিক করে নিতে আড়াই ঘণ্টা সময় গেল। সেইদিন একটা জরুরী কাজ হাতে নিয়েছিল, হাওড়ার হাট থেকে জামা-কাপড়ের বস্তা নিয়ে আসছিল। দোকানদার ত ক্ষেপে খুন।

তারা বলে—'গরুর গাড়িতে এর চাইতে আগে আসত, খরচও কম হত।'

পুলিস কোর্টের সাম্প্রতিক ঘটনা তাদের মনে পড়ে, কেউ কেউ হিমাদ্রির অতীত জীবন নিয়ে রসাল আলোচনা করে। বলে—'ছোকরা বরাবরই অমনি ধাপ্পাবাজ, কোন কাজের নয়।' কেউ কেউ ওর সঙ্গে কারবার তুলে দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করল।

হিমাদ্রির ভয় হয় এবার ভাঁটা পড়ল, ওর সুসময়ের অবসান হতে চলেছে। না, দিদিমণি, পুষ্পময়ী বা ব্যবসায়ীর দল সবাই ঠিক কথাই বলে—ও সেই পুরাতন হিমাদ্রিই আছে। তাদের কথা ওর মনে লাগে। ওর ধারণা ছিল একটা সংশোধিত পথে ও এসেছে, কিন্তু সবই হয়ত এখনও সেই ধাপ্পা হয়েই আছে। ওর সকল প্রচেষ্টার নীচেই অতীতের প্রচ্ছন্ন স্বভাব উঁকি দেয়। শুধু বাহ্যতঃ তার পরিবর্তন ঘটেছে। অন্তরের পরিবর্তন কই? এখনও ত ওর বিপদের ঝুঁকি নেবার দিকেই ঝোঁক। এখানেও সেই জুয়াড়ি প্রবৃত্তিই প্রবল হয়ে আছে। কিছুরই হয়ত পরিবর্তন হবেনা, পুরাতন প্রবৃত্তি ও মনোভাব চরিত্রে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। তারাই তাকে বিপজ্জনক পথে চালিত

করে। বিবেক ও বিচারশক্তির ওপর নির্ভরশীল ওর সচেতন মনেই শুধু পরিবর্তনের একটা প্রবল বাসনা জেগে আছে। সেই নব-জাগ্রত শুভবুদ্ধি হয়ত ওকে সৎপথে চালিত করবে, নবচেতনা আনবে, চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত কববে। অপেক্ষা করার অবসর নেই।

উপস্থিত মুস্কিল এই যে, সাধারণকে বোঝাতে হবে যে, সত্যই ওর পরিবর্তন ঘটেছে। কেউ ত তাকে বিশ্বাস করেনা, স্বদেশের কাজে একদিন নেমেছিল, অসাধুতা ও ভণ্ডামির জন্য সেখানে আর কোনদিন ফেরার পথ নেই, কোন সাহায্যের আশা নেই। বন্ধু ছিল ব্যোমকেশ, সে আর কোনদিন ফিরবেনা। তাই ওর স্বেচ্ছা-আরোপিত ভালত্বে সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নেই। তারা চেনে সেই আজন্ম-জুয়াড়ি হিমাদ্রিকে।

শুরুতে যে প্রাথমিক উৎসাহ ও প্রেরণা মনের কোণে জেগেছিল, তা যেন দিন দিন মুছে যাচ্ছে। এখন লরির চাইতেও জোরালো কিছু চাই, এমন কি সম্পদের স্বপ্নও তাকে উৎসাহিত করতে পারছে না। নতুন প্রচেষ্টার ফলে কিছু লাভ হল না, পেল কেবল হতাশা ও অসম্মান। এমন কি দুর্দিনের সাথী ছোট্ট বেবী-কারও আজ অসহযোগী।

হিমাদ্রি আত্ম-প্রবঞ্চনা করেছে। পূর্বের মত জয়লাভের উদ্দেশ্যেই সব কিছু নিয়ে বাজি ধরেছিল, কিন্তু তাল ঠিক রাখতে পারেনি। তবু হিসাব-নিকাশ করে দেখে কাজ শুরু করার সময় যে শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে নেমেছিল, তা এখন সবই অক্ষুণ্ণ আছে। চাই শুধু একটু নতুন উদ্দীপনা।

পুষ্পময়ী ও দিদিমণির চোখে কিন্তু এই নতুন মনোভাব, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যবসা দাঁড় করানোর সাধু সংকল্প একটা প্রশংসনীয় রূপ নিয়েছে। তাঁরা খুশি হয়েছেন মনে মনে, ও যে দিনের পর দিন একভাবে কাজ করে চলেছে, এ তাঁদের আশাতীত! এর ভিতরই

ওর কাজ করার সদিচ্ছা ফুটে উঠেছে। এই সময় যদি হিমাদ্রি পাঁচ-সাতশো টাকা চেয়ে বসত, তাহলে ওঁরা তা সানন্দে দিয়ে দিতেন। ক্রমশঃই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তাঁদের মন।

সন্ধ্যার পর পুষ্পময়ী হিমাদ্রির ঘরে গিয়ে বসেন, প্রতিদিনই বলেন—'এস হিমু, তোমার খাতা-পত্তর ঠিক করে দিই।' পুষ্পময়ী একরকম জোর করেই প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ, জমা-খরচ লিখে দেন। হিমাদ্রির এখন আর কথা কইবারও সামর্থ্য থাকেনা, *শুধু নীরবে ছোট ছোট 'একসারসাইজ বুক'গুলি এগিয়ে দেয়, তাইতেই দৈনন্দিন হিসাব লেখা হয়।

কোথাও ত্রুটি দেখলে বলেন—'একি হিমু, বোস ব্রাদার্স এখনও টাকা দেয়নি? অনেকদিন হল যে,—তুমি ঠিক রেকর্ড রাখছ না, ডুপ্লিকেটটা ঠিক নেই, কার্বন দিতে ভুলে গেছ।'

—'ছেড়ে দিন, ওরা টাকা দিয়ে দিয়েছে।'

—'তা হোক, তবু ত হিসেব ঠিক রাখতে হবে—'

—'বেশ, লিখে রাখুন তিপান্ন টাকা পাঁচ আনা।' চেযার থেকে উঠে পড়ে হিমাদ্রি বলে।

পুষ্পময়ী বলেন—'পালিওনা, আরও একটু আছে—'

যেন কড়া স্কুল মাস্টার। হিমাদ্রি আর পারেনা, হাই তুলে বলে—'আপনিই দেখে শুনে নিন'। হিমাদ্রি লক্ষ্য করে ওর এই বর্তমান উদাসীনতায় দিদিমণি বা পুষ্পময়ী কেউই বিরক্ত হচ্ছেন না। পুষ্পময়ী কেবল টাকার হিসাব দেখছেন, খাতা-পত্তর ঠিক আছে কিনা সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি।

পদ্মপুকুরের ওদিকে একদিন গাড়ি নিয়ে যেতে হয়েছিল। গিন্নীমার বাড়িতে একবার গেল হিমাদ্রি। অনেকদিনের অনেক স্মৃতি এই

বাড়িটির সঙ্গে বিজড়িত—গিন্নীমা হিমাদ্রিকে দেখে খুশি হলেন—তাড়াতাড়ি চা করে দিলেন, বললেন—'বড় রোগা হয়ে গেছ বাবা হিমু! শরীরের দিকে যত্ন নাও, খাও দাও ভাল করে বাবা।'

হিমাদ্রি বলে—'কি করব মাসীমা, ভীষণ খাটুনি, সেদিন আর নেই।'

অনিলবাবুর অফিস যাওয়ার সময় হয়েছিল, কলতলা থেকে স্নান সেরে ওপরে উঠছিলেন, সহসা হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা, আকাশের চাঁদ পেলেন যেন তিনি। বলে উঠলেন—'হিমাদ্রিবাবু, এসেছেনই যদি দয়া করে, একটা টিপ্ দিয়ে যান, সামনের শনিবারটা যেন মা-কালীর কৃপায় বৃথা না যায়—'

হিমাদ্রি বলে—'ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি, মাঠ কোন দিকে তাই ভুলে গিয়েছি। কি বলব বলুন।'

অনিলবাবু কাতর কণ্ঠে বলে—'যা হয় একটা বলুন দয়া করে, ছলনা না করে।'

হিমাদ্রি তবু বলে—'সত্যি বলছি মাঠের খবর আর রাখিনা—'

অনিলবাবু শুধু বললেন—'বলবেন না তাই বলুন, সবাই বলে বলেই যে আপনি রাতারাতি সাধু বনে গিয়েছেন, তা ত নয়—'

হিমাদ্রি কি আর বলবে, এখন দেখা যাচ্ছে সবত্রই হিমাদ্রির নতুন জীবনের খবর পৌঁচেছে, হিমাদ্রি জানার আগেই সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে। সত্যই ইন্দ্রজাল ঘটেছে। পদ্মপুকুর থেকে বেরিয়ে এস্প্লানেডের পথে যেতে যেতে ডানদিকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ—হিমাদ্রির মনে রঙ ধরে। আর একবার রেসের মাঠে ভাগ্য-পরীক্ষা করবে নাকি!

চৌরঙ্গীর মোড়ে হিমাদ্রির একখানা 'রেসিং-গাইড' কেনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাওয়া গেলনা।

শনিবার সকালে খবরের কাগজ খুলতেই রেসের পাতাটাই বেরিয়ে

পড়ল—কি যে দৌড়, কোন কোন ঘোড়া দৌড়বে, কি তাদের বংশ-পরিচয় কিছু জানা নেই হিমাদ্রির। হিমাদ্রি চোখ বুজিয়ে কি ভেবে নিয়ে সেদিনের দৌড়ের ঘোড়াগুলির তালিকায় চোখ বুলিয়ে নেয়। কোনও দিকে লক্ষ্য নেই, একটা নাম খুঁজছে সে। হঠাৎ চোখে পড়ে 'Hope'—আশা, আশার পিছনেই ত সে ছুটেছে। এই ঘোড়াটাই সে ধরবে, যা কিছু সঞ্চয় আজ এর পিছনেই লাগাবে—হয় জিত নয়ত নিশ্চিত মৃত্যু।

গত বছর ব্যোমকেশ আর হিমাদ্রির সেই শেষ মাঠে আসা। তারপর আজ আবার ও মাঠে এল। তখন মাঠে তেমন ভিড় ছিলনা, আজ কিন্তু মাঠ গমগম করছে, আকাশের চার পাশে মেঘ ভাসছে, মাঝে মাঝে মেঘ-ভাঙা রৌদ্র তীব্র হয়ে উঠছে।

হিমাদ্রি প্যাডকে গিয়ে ঘোড়াগুলির আকৃতি দেখে নেয় চোখ ভরে। সারা মাঠটি বেড়িযে রেস্তরাঁর ভিতর গিয়ে ঢোকে। বসে বসে দু বোতল বীয়ার আর কিছু স্যাণ্ডউইচ শেষ করে, আর চারপাশের নানাবিধ ঘোড়া-সংক্রান্ত আলোচনা কান খাড়া করে শোনে। কত ঘোড়ার নাম—মাই লভ, লেডী বিউটিফুল, কুইন ক্রিস্টিনা—সবই নাকি সিউর উইন, কিন্তু হিমাদ্রি মনস্থির করে ফেলেছে।

উইণ্ডোতে গিয়ে সোজা পাঁচশো টাকা 'হোপে'র পিছনে লাগায়। বুক-মেকার হিমাদ্রির মুখের পানে তাকাতেই সে সসম্ভ্রমে বলে ওঠে—'হ্যালো মিঃ উড—'

লোকটি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—'হিমুবাবু ইজ নট্ ইট্! সেম ওল্ড হিমু! আই হ্যাড সীন ইউ বিফোর।' হিমাদ্রি হাসে। লোকটি এবার অতি মৃদু গলায় বলে ওঠে—'দ্যাট্স্ এ ফানি থিং ইউ হ্যাভ ডান্'—

হিমাদ্রি শুধু বলে—'নেভার মাইণ্ড!'

হিমাদ্রি পুনরায় রেসিং-গাইডের পাতা ওল্টায়, 'হোপ'-এর নাম কোথাও নেই, বাইরে থেকে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়া। কেউই তার সম্বন্ধে একটি কথাও কোথায় বলেনি—তবু হিমাদ্রির মনে পড়ে গত বছর দিদিমণির বাসায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন কোথায় যেন এই ঘোড়া সম্বন্ধে সে পড়েছে। অনেকখানি লিখেছে সেই কাগজে, এখন ঠিক স্মরণ হচ্ছেনা, তবে 'হোপে' নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্ব আছে।

হিমাদ্রির মনে হয় 'হোপ' ডার্ক হর্স, এখানে এ ঘোড়া নতুন। ওকে এখন পরীক্ষা করা হচ্ছে, সব ব্যাপারটাই তাই অত্যন্ত গোপন করে রাখা হয়েছে। দু'চারজন শুধু ভিতরকার খবর জানে, সবাই তাই চুপ করে আছে।

হিমাদ্রির ভারি আনন্দ, এক টাকায় ত্রিশ টাকা, সোজা ব্যাপার! কিন্তু রেসের সময় যত ঘনিয়ে আসে ততই যেন উত্তেজনা বাড়ে। দু'চারজন বুক ঠুকে কিছু লাগালে এই ঘোড়ার ওপর। হিমাদ্রি ভাবে নিশ্চয়ই গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে।

হিমাদ্রির আসন থেকে দৌড শুরু করার জায়গাটা একটু দূরে। তার মুখেব ওপর রোদ এসে পড়েছে। দৌড় শুরু হল স' তিনটেয়। জনতা চীৎকার করছে, এই হুল্লোড হিমাদ্রির কানে যেন 'নাইন্থ্ সীমফনি'র মাদকতা আনে। এই একটি সুরই সে জানে, এই তার ভাল লাগে। বাঁকের মুখে তীরের মত ঘোড়াগুলি সরে যাচ্ছে টান হয়ে দেখে হিমাদ্রি। তার মনে অনুতাপ বা অনুশোচনা, আশা বা আনন্দ নেই, এ এক নির্বিকল্প সমাধি। পাশের ভদ্রলোকটি তার এই তুরীয় অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁর বায়নাকুলারটা এগিয়ে দিলেন। হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি সেটিকে ঠিক করে নিয়ে চোখে লাগায়। ঐ যে বারো নম্বরের ঘোড়া 'হোপ'—যেন সাদা পালকের মত হালকা গতিতে হাওয়ায় ভাসছে। 'হোপ' ক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। হিমাদ্রি

বায়নাকুলার ফেরৎ দেয়। এরপর কি হবে তা সে জানতে পেরেছে। দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিনিসিং-এর মাথায় শুধু মাথাটুকু এগিয়ে দিয়ে প্রথম হল 'হোপ'!

আবেগহীন ভঙ্গীতে উঠে গিয়ে পেমেণ্ট নেয় হিমাদ্রি। মোটা টাকা, সুদে-আসলে সব উঠে এল। যারা পরিচিত, তারা এসে পিঠ চাপড়ায়, ওর সৌভাগ্য দেখে সবাই বিস্মিত হয়। এমন জুয়াড়ি সচরাচর দেখা যায়না, যাতে হাত দেবে তাই কি সোনা হবে!

হিমাদ্রি শুধু হাসে। কোঁচার খুঁটে বেশ করে নোটগুলি বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখে, সাবধানের মার নেই। চারিদিকে মধুর সান্ধ্য বাতাস বইছে, পাখীর গুঞ্জন, ফুলের সুবাস সব জড়িয়ে বোঝা যায় এটা কোন ঋতু। এই প্রথম দীর্ঘকাল পরে হিমাদ্রি অন্তরে শান্তি পায়। এখানে এসে যেন তার সাধনার সিদ্ধি হয়েছে, শুধু স্থুল অর্থ লাভ হয়নি। যা কিছু হয়েছে সবই ওর ব্যবসার খাতিরে। এখন এই সমস্ত টাকা সে ব্যবসাতেই ফেলবে। সেও এক জুয়া, তারই সাহায্যে সে সফল করে তুলবে নব-জীবনের স্বপ্ন। কালই দুটো লরির অর্ডার দিতে হবে।

তিনদিন পরে লরির ডেলিভারি পাওয়া গেল। যে রকম বড়-সড লরির ও স্বপ্ন দেখেছিল লরি দু'টি তত বড় হলনা। তাহলেও কাজ শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট। এত দিনে ব্যবসা ঠিকমত জমবে। লরির লাল রঙ আর নিকেল করা চকচকে পুরোভাগ মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। হিমাদ্রি তার গায়ে সাদা রঙ দিয়ে বড় বড় করে লিখিয়েছে—

"HIMADRI"

—Express Service—

কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবসায় উন্নতি দেখা গেল। অনেক নতুন

কনট্রাক্ট হয়ে গেল, যে সব পার্টি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তাদেরও দু'একজন আবার হিমাদ্রিকে ডেকে কাজ দিয়েছে। এখন সে বেশি মাল নিয়ে অনেক দূরের পথে যেতে পারে। ছোট গাড়িখানিতে বসে মনও যেন ছোট হয়ে থাকতে হত। এখন লরির উঁচু সীটে বসে মনটাও যেন উঁচু হয়ে গেছে। এর বোধহয় একটু মনস্তাত্ত্বিক হেতু আছে। এখন একটা ছোটখাটো অফিসের প্রয়োজন, গাড়ি ক'খানা শহরের কেন্দ্রস্থলে রাখার বন্দোবস্ত করতে পারলে সুবিধা হয়। কিন্তু যে সব জায়গা পছন্দ হয়, তার ভাড়া অনেক বেশি। একটা পুরানো গুদাম অনেকদিন খালি পড়ে আছে, সেটা হয়ত সস্তায় পাওয়া যায়, কিন্তু মন সরেনা। একটু ইতস্তত: করে হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি চুপ করে থাকে। তার মাথায় একটা নতুন মতলব এসেছে—এখন যখন কাজ বেশি পাওয়া যাবে, অন্যান্য বড় কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, তখন ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে ওকেও তাল রেখে চলতে হবে। সাফল্যেব মুখে নতুন প্রচেষ্টার মূলে প্রতিটি পাই পয়সা পর্যন্ত খরচ করতে হবে, এতটুকু পিছিয়ে থাকা চলবেনা। হিমাদ্রি স্থিব করল যথারীতি ছোটখাটো ব্যবসায়ীর সঙ্গেই ও সম্পর্ক অটুট রাখবে। তাদের দিয়ে কাজ শুরু করেছে, তাদের নিয়েই বাড়াবে। এইভাবে শীঘ্রই বারো-চোদ্দটি ছোটখাটো ব্যবসায়ীর সঙ্গে নিয়মিত বন্দোবস্ত করা হয়ে গেল। বিল ছাপান হল, চিঠিপত্রের কাগজ ইত্যাদি সবই রীতি-মাফিক করা হল।

সমস্ত বন্দোবস্ত করে একদিন হঠাৎ লরি দু'খানি বাসার সামনে এনে দাঁড় করাল। দিদিমণি ওপরের বারান্দা থেকে দেখতে লাগলেন, পুষ্পময়ী নীচে নেমে এসেই বললেন—'কি করে পেলে হিমু? টাকা কে দিল?'

প্রশ্নের ভিতর একটা সন্দেহের সুর ছিল। হিমাদ্রির বিশ্রী লাগে,

এখনও সেই অবিশ্বাস! সে শুধু বলে—'কিনেছি, নিজের টাকাতেই কিনেছি।'

—'কিন্তু…কেমন করে কিনলে?' পুষ্পময়ীর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনা।

এই প্রশ্ন উপেক্ষা করে হিমাদ্রি গাড়িব ওপর সাদা রঙে বড় করে লেখা নিজের নামটি দেখায়—একরকম জোর করেই পুষ্পময়ীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে। ঐ অক্ষর তার সাফল্যের প্রতীক। হিমাদ্রি বলে—'কেমন, ভাল লাগছে? এখন ডবলের ওপর কাজ পাচ্ছি. পুষ্পদি।'

—'কত দাম পড়ল?' পুষ্পময়ী প্রশ্ন করেন।

ওপরে উঠতে দিদিমণিও এই একই প্রশ্ন কবলেন। হিমাদ্রি সকলকে বুঝিয়ে বলে—'আমার টাকার প্রয়োজন ছিল—মূলধন নইলে ব্যবসা দাঁড়ায় না। যাহয় করে জোগাড় হল—'

এ কথায় সকলেই কেমন সংশয়ান্বিত চিত্তে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল—উপযুক্ত ভাষা ও সুর খুঁজে পায়না হিমাদ্রি, শেষকালে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—'একটা ঘোড়ার পিছনে আমাব যথাসর্বস্ব ধরেছিলুম, সেই দিলে—'

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কথাগুলির ভিতর নিজেব দম্ভটুকু চাপতে পারলনা হিমাদ্রি। তারপর সে সতর্ক হয়ে যায়, ওদের মুখে একটা অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য কবে হিমাদ্রি। ওঁরা হয়ত একটু আহত হয়েছেন। পুষ্পময়ী শুধু বললেন—'হিমু, আবার মাঠে যাওয়া আসা করছ?'

হিমাদ্রি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজেব ঘরে চলে যায়, কোথায় ওরা আনন্দ করবে, না আহত ও ক্ষুব্ধ হচ্ছে, ওদের নীতিবাগীশ মনে আঘাত লেগেছে। ওদের নিয়ে আর পারা যায় না। আশা করেছিল ওদের কাছে উৎসাহ ও সমর্থন মিলবে, তার বিনিময়ে পাওয়া

গেল উপেক্ষা, ওরা এখনও সন্দেহ করে, আজও ওদের অবিশ্বাস। ওদের চোখে আজও সে জুয়াড়ি।

সকল পরিশ্রম, সকল প্রচেষ্টা যেন সহসা সুর ও সঙ্গতিহীন হয়ে গেল। আশা ছিল দিদিমণি বা পুষ্পময়ী আজ হয়ত ওকে উৎসাহ দেবেন, দুটো স্বস্তির বাণী। কিন্তু কেউই নেই, আজ সে আবিষ্কার করে এ সংসারে সে একান্ত একা। সকল কাজে পিঠ চাপড়ে সমর্থন ও উৎসাহ জানাবার নিত্যকালের সহচর ব্যোমকেশ আজ আর পাশে নেই!

এরপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বকুলরাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, টেলিফোন অফিসে একটা টেলিফোন পাওয়ার তদ্বির করতে হিমাদ্রি কনট্রাক্ট ম্যানেজারের কাছে গিছল, তাঁরই ঘরে বসে টাইপ করছিল বকুলরাণী। হিমাদ্রি অবাক হয়ে গেল—এসব আবার কবে শিখল সে? বকুলরাণী হিমাদ্রির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হিমাদ্রি বলে—'এখন কেমন আছ বকুল, শরীরটা সেরেছে?'

বকুলরাণী বলে—'আছি একরকম, সবই ত' শুনেছেন। পা-টা শুধু টেনে চলতে হয়।'

হিমাদ্রি বলে—'যাই হোক, প্রাণে বেঁচে গেছ ত'।'

বকুলরাণী একটু উত্তেজিত হয়েই বলে—'এর নাম বাঁচা! এর চাইতে আমার মরাই ভাল ছিল হিমুবাবু।'

বকুলের মত তেজস্বিনী মেয়ের কাছে এমন একটা জোলো ভাব-প্রবণতার কথা শোনা যাবে আশা করেনি হিমাদ্রি, তাই কি বলতে হবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেল।

বকুল আবার প্রশ্ন করে—'আপনার শরীরও ত' খুব ভাল দেখছি না, ব্যবসার খবর অবশ্য শুনেছি।'

হিমাদ্রি বলে—'ব্যবসার হাঙ্গাম ত বোঝ, চলছে কোনও রকমে, একা মানুষ—'

বকুল বলে—'আপনি ভাগ্যবান, কপাল চিরদিনই আপনার সহায় !'

এরই বা কি জবাব দেবে হিমাদ্রি। শুধু বলে—'টেলিফোনটা যাতে তাড়াতাড়ি পাই দেখ, একদিন এসোনা, দুজনে গল্প টল্প করা যাবে, অনেকদিন দেখা নেই।'

এরপর মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ঘটে, আর যত দিন যায় ততই হিমাদ্রির কেমন মনে হয়, বকুল যেন সহসা শান্ত হয়ে গেছে। তার আশংকা ছিল, ব্যোমকেশের ব্যাপারে তার অন্তরে যে ক্ষত হয়েছে, তার প্রতিশোধ নেওয়ার তালে আছে বকুলরাণী, কিন্তু মনে হয় হিমাদ্রির পরিবর্তন ও আর্থিক অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বকুলকে আরও ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ধূলি-ধূসরিত শহরের পথে পথে ঘোরার সময় সর্বদাই বকুলের প্রতিমূর্তি ওর চোখের ওপর ভাসে—বকুলরাণীর চিন্তা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে,—তার সমস্ত হিসাব-নিকাশ, ব্যবসা উন্নয়নের চিন্তা মাথা থেকে সরে গেছে, সব জুড়ে বসে আছে বকুলরাণী। দুর্গম প্রান্তরের প্রান্তে এসে সে দাঁড়িয়েছে, বকুলরাণী সেখান থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখন কি করা যায় ?

এই দুর্দম কামনা সত্ত্বেও ভদ্র ভাবে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নিতান্ত মামুলী ধরণের কথাবার্তা ছাড়া হিমাদ্রি আর একটুও অগ্রসর হওয়ার সাহস রাখেনা—এও এক ধাপ্পা! সে কিছুই বলবে না, কিছুই জানাবেনা, সাবধানে পদক্ষেপ করবে,—দেখাই যাক না বকুল কি করে। কিন্তু তার অসহিষ্ণু মনের কাছে এ এক পীড়াদায়ক পরিস্থিতি।

তার ধারণা, ব্যবসায়ী হিসাবে ও সার্থক মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সকল প্রচেষ্টা তার থেমে আছে শুধু নিজের এই সামান্য চক্ষুলজ্জার ফলে। কিন্তু কিছুতেই সে মনের কথা প্রকাশ করবেনা,

বকুলরাণীর দৌড়টা দেখা যাক। সে দৃঢ়সংকল্প—কিন্তু তার ফলে মূল্য কিছু বেশিই হয়ত দিতে হচ্ছে।

এই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে সারারাত অশান্ত উদ্বেগে কেটে যায়, প্রতি ঘণ্টায় নিজের সংকল্পের ভিত্তি দৃঢ় করার চেষ্টা করে, মনের কথা খুলে বলছে না বলে জীবনের অনেক কিছু বহুমূল্য সম্পদ হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তবু সে চুপ করে আছে। এই সব নিদ্রাহীন রাতের পর আবার সকালের কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় তাকে, এদিকে বকুলের অপেক্ষায় হিমাদ্রি বসে আছে, আর বকুল হয়ত চুপ করে আছে ওর কথা শোনার উদ্দেশ্যে—একথাও হিমাদ্রির অজানা নয়, সবই সে বোঝে, বকুল চায় হিমাদ্রি ওর হাতের মুঠোর ভিতর এসে পড়ুক। তারপর হিমাদ্রি যেমন করে ব্যোমকেশকে টিপে মেরেছে, বকুল সেইভাবে হিমাদ্রিকে মারার তালে আছে হয়ত।

ধূর্ত পশুর জন্য শিকারী যেমন ফাঁদ পাতে, হয়ত তেমনই বন্দোবস্ত করেছে বকুল। এ বিষয়ে হিমাদ্রির বিশ্বাস অপরিসীম, কিন্তু বকুলের সান্নিধ্যে সে সব ভুলে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে সময় সব কথা মনে থাকেনা, তবু ধরা পড়ার ভয় আর সম্ভাব্য বিপদের আশংকায় সে নিজেকে সংযত রাখে।

অবশেষে একদিন আর এই সংকল্পের বাঁধ বাধা মানলোনা, সকল বিপদ ও ছলনার কথা ভুলে হিমাদ্রি বকুলের কাছে আত্মসমর্পণ করল। ছোট্ট বেবী গাড়িতে উভয়ে ফিরছিল, অফিসের ছুটির পর হিমাদ্রি ওকে তুলে নিয়েছে, একটা কাজ সেরে বাসায় নামিয়ে দেওয়ার কথা। শীতের সন্ধ্যা, পাঁচটা না বাজতেই অন্ধকার, ছটায় যেন গভীর রাত্রি। এক সময় বকুলের গলায় হাত রাখল হিমাদ্রি, তারপর সামান্য একটু আদর করেই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় মুখখানি ভরিয়ে দিল। গাড়িটা নির্জন পথের একপ্রান্তে পার্ক করে রেখে অনেকক্ষণ এই ভাবেই উভয়ে

আচ্ছন্ন হয়ে রইল। একটিও কথা বলল না বকুল, আপত্তি জানালনা, বাধাও দিলনা, উৎসাহও দিলনা, যেন পাষাণ-প্রতিমা।

কিন্তু সে যে আলিঙ্গন ও চুম্বনে আপত্তি জানালনা এইটুকুই হিমাদ্রির মনে রঙ ধরিয়ে দিল, এই তার অন্তরে প্রেরণা জাগাল—এইটুকু সে অগ্রগমনের ইঙ্গিত বলে ধরে নিল। হিমাদ্রির ধারণা হল, যেদিন থেকে তারা পরস্পর আবার মেলামেশা শুরু করেছে, সেদিন থেকেই বকুল মনে-প্রাণে কামনা করেছে অতীতের অন্ধকার থেকে টেনে তুলুক হিমাদ্রি। হিমাদ্রি ভেবেছিল অতীতের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট এই দুটি প্রাণীরই উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন, আর সেই উৎসাহ শুধু ওরাই পরস্পরকে দিতে পারে। উভয়েরই তাই প্রয়োজন উভয়কে।

সেই রাত্রে উভয়ে অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে ঘুরল, কর্মক্লান্ত দিনের পর এই নীরবতাটুকু মধুর লাগল। আশ্চর্য, এখন, যখন উভয়েই একা, তখন হিমাদ্রি কত কথা মনে মনে চিন্তা করে বেখেছিল বকুলকে বলার জন্য কিন্তু কিছুই বলতে পারলনা। সে যে চলে যেতে পাবে, হাত থেকে পিছলে গিয়ে অন্য কোথাও সরে যেতে পারে, এ চিন্তা হিমাদ্রিব মনে ছিলনা। এখন আর তাড়াতাড়ি করার কি আছে! এখন আর সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। তার বদলে হিমাদ্রির মত মানুষেব মনে এসেছে কেমন একটা লজ্জা ও কুণ্ঠাব ভাব। হিমাদ্রি তাই বকুলের পাশে কিছু না বলে নীরবে বসে রইল। যেন অল্পবয়সী ভাবপ্রবণ প্রেমিক আলোচনার উপযুক্ত বিষয় খুঁজে পাচ্ছেনা, যেন নিজের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের একটা জুৎসই জবাব সে কিছুতেই উচ্চারণ কবতে পারছে না,—বকুল সেই অন্ধকারের ভিতরেই তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, যেন ওর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে। সে মুখ টিপে হাসে।

হিমাদ্রি বকুলরাণীর মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, ওর হাত

খানি নিজের হাতের ভিতর তুলে নেয়। এরপর যেন ওর সাহস আরও একটু বেড়ে যায়। তারপর আবার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে—'বকুলরাণী, আমাদের মধ্যে কোনও কিছু গোপন নেই, তুমিও আমাকে জানো, আমিও তোমাকে জানি—এসোনা দু'জনে মিলে জীবনটা সার্থক করে তুলি,—তোমার আপত্তি আছে বকুল?'

বকুল শান্ত কণ্ঠে বলে—'কি বলবো বলুন?'

হিমাদ্রিও গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলে—'বেশত, না হয় ভেবেই বোল।' এরপর কথা প্রসঙ্গে হিমাদ্রি ওর ব্যবসার কথা আগাগোড়া বলে যায়, ব্যবসা শুরু করার পর এমন দরদী শ্রোতা বোধ হয় সে আর পায়নি, তাই তার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে বকুলকে বোঝানর চেষ্টা করে।

সব শুনে ওর মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বকুল বলে ওঠে—'আপনি সত্যই ভাগ্যবান হিমাদ্রিবাবু, সব জিনিসই ঠিক মত আপনার হাতে এসে পড়ে। আপনি ধুলো ধরলে সোনা হয়ে যাবে।'

এ যেন বকুলের গলায় একটা অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হল—হয়ত তার কোনও একটা দুঃখ কোনখানে আছে, কিন্তু সে বস্তুটা যে কি, তা সে কৌশলে চেপে গেল। নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখে বকুলরাণী সন্ধ্যা তখন অনেক রাত্রে পরিণত হয়েছে, দিনের শেষ আলোটুকু যা পশ্চিম আকাশের কোণে যাই যাই করেও যেতে পারছিলনা, সেটকুও অন্তর্হিত হয়েছে, সারা জগৎ তখন অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত।

সহসা হিমাদ্রির মনে হয়, বকুলের মনে ব্যোমকেশের কথা এখনও হয়ত জ্বলছে, তাই জোর জবরদস্তি করে কিছু হবেনা, ব্যোমকেশ আর হিমাদ্রির মধ্যে আজ যখন এতবড় ব্যবধান রচিত হয়েছে, যা ঘটে গেছে তার জন্য অপরাধী হিমাদ্রি, সে বকুলের জীবনের আশা ধ্বংস করেছে, ব্যোমকেশের জীবন্ নষ্ট করেছে, আজ সে বকুলের পাশে বসে প্রেম

নিবেদন করছে, অথচ বকুলের হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুখায়নি নিশ্চয়ই। আজ রাতে তাই আর কোনও প্রস্তাবে কুণ্ঠিত বকুলকে বিড়ম্বিত করতে চায়না হিমাদ্রি। তবে বকুল ও তার মধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা সমাধান করতে হবে। তারপর পর ব্যবসা রয়েছে, সেটাকে ঠিকমত সংগঠিত করে তুলতে হবে। একবিন্দু সময় নষ্ট করা চলবেনা, জীবন আর ব্যবসা এখন এক সূত্রে গ্রথিত।

সহসা হিমাদ্রির মনে হয়, ধীরে ধীরে বকুলের মনে সাড়া জাগছে, ওর ব্যবসা সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন সে করল, তার ভিতর আন্তরিকতা আছে। হিমাদ্রির কাছে তা বিস্ময়কর, এই ত নব-জীবনের সূচনা। নিষ্প্রাণ নিস্পৃহতার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বকুলের মনে উত্তাপ এনেছে হিমাদ্রি—তাকে জয় করার জন্য আকাস্মিক পন্থা প্রকৃষ্ট নয়, চাই বিলম্বিত মেলামেশা, তবে তার ধারণা সে একটা কর্তব্য সম্পাদন করেছে, এখন সে বকুলকে তার আশ্রয়ে রাখবে, শান্তি ও সান্ত্বনার প্রতিশ্রুতি দেবে। বকুল ত ইতিমধ্যেই ধরা দিয়েছে।

হিমাদ্রির আগ্রহ, তার কথা ও চুমায় বিজড়িত হয়ে গেছে—বকুল শুধু হেসে ওকে সরিয়ে দিয়েছে। এই উৎসাহটুকুই ত এতদিন ও পাওয়ার চেষ্টা করছিল, অবশেষে তা মিলেছে। এখন ও বিস্তার করবে ওর পরিকল্পনা। এখন লক্ষ্য সামনে, আর পিছনে তাকাবার প্রয়োজন নেই। প্রথম যেদিন বকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে স্বপ্নেও ভাবেনি এত সহজে মীমাংসা হবে,—মনে মনে এই দিনটি সম্বন্ধে তার আতংক ও সংশয় ছিল প্রচুর। বকুলকে বুকে পাওয়া, তাকে প্রেম নিবেদন করা, এবং চিরদিনের মত আপন করে নেওয়ার পিছনে রয়েছে ব্যোমকেশের করুণ কাহিনী, সেই পটভূমিকার ওপর নূতন জীবনের ভিত্তি গড়া হচ্ছে। উভয়েরই মনে ব্যোমকেশ আজও জীবিত, এখনও ত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেহধারী ব্যোমকেশ দিন

কাটাচ্ছে, কিন্তু সেই নামটি উভয়ের মধ্যে কেউই উচ্চারণ করেনি, এটি একটি সুলক্ষণ। এইখানেই ত সে বিজয়ীর জয়মাল্য পেয়েছে।

হিমাদ্রির মন কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে মাঝে মাঝে কথাটা পাড়ে, বকুল বলে—'অত তাড়া কিসের! কিছুদিন যাক্, এত ব্যস্ত হয়োনা। আমাকে ছ'মাস সময় দাও।'

হিমাদ্রি বলে ওঠে—'ছ'মাস? ছ'সপ্তাহ বা ছ'দিন নয়, ছ'মাস?'

বকুল একটু বিব্রত হয়ে আছে, তাই সে সময় চায়, এখনও মনস্থির করতে পারছেনা, ব্যোমকেশকে একটা চিঠি লিখেছে, তার জবাব এখনও আসেনি, চিঠিপত্র লেখার দিকে ব্যোমকেশের কোনদিনই তেমন মুন্সিয়ানা ছিলনা—তবু বকুল আশা রাখে, সে জবাব দেবে। অন্ততঃ তার শেষ জবাবের পর সে যদি হিমাদ্রিকে কথা দেয়, তাহলে ব্যোমকেশের প্রতি নিষ্ঠাহীনতার কোন কথাই উঠবে না।

দিন কেটে যায়—ক্রমশঃই বোঝা যায় ব্যোমকেশ আর উত্তর দেবেনা,—বকুল উদ্বেগাকুল চিত্তে ভাবে ব্যোমকেশ যদি উত্তর না দেয় তাহলে কি সর্বনাশা পথ তাকে বেছে নিতে হবে, একদিকে ব্যোমকেশের আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকা, অপর দিকে হিমাদ্রি আর তার ঐশ্বর্য। এরপর হিমাদ্রি আবার জবাব চায়। বকুলের সংশয় কাটেনা, কিন্তু হিমাদ্রি তাকে নিবিড় করে নিতে চায় ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে। অবশেষে বকুল আর বাধা দিতে পারেনা, হিমাদ্রির কথায় রাজী হতে হয়। বিবাহের একটা দিনও স্থির হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু বকুলের কাছে ব্যাপারটি বিয়ের চাইতেও বেশি, এই পথ ধরেই তাকে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। হিমাদ্রি এতটা ভাবেনি, কিন্তু বকুল তাকে বাধ্য করেছে। সেই রাতে বকুল বসে বসে ভাবতে লাগল, এখন দিনের পর

দিন, সুদীর্ঘ জীবন কি অপরূপ রহস্যে কাটবে। অদৃষ্ট কি ফাঁদ পেতেছে কে জানে—কিন্তু কিছুই তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবেনা।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরেই পুষ্পময়ীর কাছে সংবাদটুকু বিনা আড়ম্বরেই প্রকাশ করে হিমাদ্রি। গোড়া থেকে শেষ অবধি সবটুকুই অকপটে বলে যায়, কিছু গোপন রাখে না।

সকল কথা শোনার পর কোন জবাব দেন না পুষ্পময়ী, বিনা বাধায় সবটুকু শুনে যান।

হিমাদ্রি সবশেষে বলে ফেলে—'একটা দিন স্থির করা হয়েছে, তিন আইনের বিয়ে, রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিস দেওয়া হয়েছে, আস্‌ছে মাসের ন' তারিখে বিয়ে হবে।' তারপর দিদিমণির ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—'তুমি দিদিমণিকে বলে দিও, বুঝ্‌লে?'

পুষ্পময়ী সবিস্ময়ে বলে উঠল—'সামনে মাসের ন'ই, সত্যি?'

পুষ্পময়ী যেন বিরক্ত হয়েছেন, হিমাদ্রি লক্ষ্য করল তাঁর মুখ থেকে সব রঙ যেন মুছে গেল।

সমস্তই লক্ষ্য করল হিমাদ্রি, কিন্তু তা সে বুঝেও বুঝতে চায় না, কোন প্রশ্ন করতে চায় না। এই সময়ে যুক্তি তর্ক ভাল লাগে না—অতঃপর কি যে শুনতে হবে, তা যেন তার জানা, তাই সে অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠে—

—'কিছু বলো না পুষ্পদি, কোনও লাভ নেই, আমি সব স্থির করে ফেলেছি।'

হিমাদ্রি তার ঠোঁটটি কামড়ে ধরে বসে পড়ে। সে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। এখনও এদের মনে সেই অবিশ্বাস—অথচ পুষ্পদি নিজেই বকুলরাণীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী! এখন পুষ্পদির এই আচরণ লক্ষ্য করে হিমাদ্রি বেদনা বোধ করে।

রুষ্ট কণ্ঠে হিমাদ্রি বলে—'বিয়েটা অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার…'

—'না—না হিমু, তুমি ভুল বুঝো না, আমি খুশিই হয়েছি—!'

হিমাদ্রি তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের পানে তাকায়,—পুষ্পদির তখনও মুখ ভার,—কিন্তু তবু তিনি হাসছেন, আর এই হাসিতে ওই মুখে কিছু আগে যে ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা গেছে, তা যেন মুছে গেছে, পুষ্পদি এগিয়ে এসে হিমাদ্রির পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসলেন।

—'আশ্চর্য! তোমার এই রকম মনে হল কেন? এত খুব ভাল কথা, আনন্দেরই কথা—আমি খুশিই হয়েছি।' এটা পুষ্পদির সুচিন্তিত অভিমত।

হিমাদ্রি ওঁর মুখের পানে তাকিয়েই আছে, ওর কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর ঠেকছে। হিমাদ্রি হাসে না বা কিছু বলে না, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, তারপর হেসে ওঠে।

সে বলে ওঠে 'আমি ভেবেছিলাম যে তুমি বুঝি চটেছ।'

হিমাদ্রি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায়, বলে—'তাই মনে হয়েছিল, সত্যি—' তাকে অত্যন্ত লাজুক ও নির্বোধ দেখায়—কিন্তু কল্পনাতীত সুখের ছাপ তাঁর সেই মুখে পরিস্ফুট।

পুষ্পময়ী প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন আর কি—এই চেষ্টাকৃত আন্তরিকতার অন্তরালে নিদারুণ হতাশা মিশ্রিত বিরক্তি জেগে রয়েছে। কয়েক মাস ধরে বকুলের সঙ্গে লজ্জায় তিনি দেখা করেন নি, বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেন নি, যেহেতু হিমাদ্রির বিশ্বাসঘাতকতার কথা উভয়েরই জানা ছিল। এখন হিমাদ্রি সেই সমস্যাটুকু আরও জটিল ও বিশ্রী করে তুলল। বকুলরাণী এই সংসারে এসে হাজির হবে, পরিবারের একজন হিসাবে ওদের সঙ্গে থাকবে। পূর্বে যদি তার মনে শুধু সংশয় জেগে থাকে, এখন তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

এই অবস্থাটা হিমাদ্রির কাছে স্পষ্ট করে বলার সাহস হয় না পুষ্পময়ীর। তিনি কিছুতেই ওকে বিশ্বাস করবেন না। নিজের সুখ ও শান্তির মনোরম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করা বা শোনার মত মনের অবস্থা ওর নয়। পুষ্পময়ী খুশি হয়েছেন জেনেই সে খুশি।

হিমাদ্রি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—'দিদিমণি ও জামাইবাবুকে বুঝিয়ে বোলো। ওরা যেন আর কিছু মনে করে না বসে। ওরা যদি না বোঝে, তুমি বুঝিয়ে দিও।'

প্রসন্ন মনে শ্রান্ত হিমাদ্রি শুতে যায়, পুষ্পময়ী চুপ করে বসে ছিলেন, তারপর পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ঘরের আলোটা জ্বালতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, পুষ্পময়ী মশারিটা খাটাতে লাগলেন। দিদিমণি বললেন—'কটা বাজল, সেই কোন্ ভোরে উঠেছি—চোখের দুটো পাতা এক করিনি—তাই তন্দ্রা এসে গিছল—'

পুষ্পময়ী বলে—'হিমুর যে বিয়ে—বকুলের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে।'

দিদিমণির ঘুমের ঘোর কেটে গেল—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'বলিস কিরে—বিয়ে? ঐ বকুলের সঙ্গে—?'

পুষ্পময়ী ফিসফিস করে বলে—'চুপ, হিমু—শুনতে পাবে—'

—'ছি ছি কি কাণ্ড!'

দিদিমণি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'আমার যে কষ্ট, সেই কষ্ট—চিরদিনটা একভাবে কাটল—হিমু আমাকে পাগল করে দেবে—কিছুতেই শান্তি নেই, একটা না একটা লেগেই আছে।'

পুষ্পময়ী বলে—'করলেই বা বিয়ে, কি আর হবে?'

—'কি বলিস রে পুষ্প, শুনতে পেল ত' বয়েই গেল, তোর বকুল শুনলেও আমার কিছু এসে যায় না,—একটা লজ্জা থাকা উচিত, হিমুরও কি লজ্জা নেই, এই সেদিন এতবড় একটা কাণ্ড করল—এখনও দু মাস

হয়নি, ব্যোমকেশ জেলে ঢুকতে না ঢুকতেই এদিকে বকুল হিমুর সঙ্গে ভিড়ে গেল—এসব নষ্টামি—অসতীপানা আর কাকে বলে—'

পুষ্প গম্ভীর গলায় বলে—'জান দিদিমণি, ঢাকার সেই রমেশ বোস বার্ড সাহেবকে মেরে যার ফাঁসি হল, তার বউ শুনছি নাকি এখন ভদ্রধরনের বেশ্যাগিরি করছে।'

—'তোদের স্বদেশী মেয়েদের কাণ্ডই আলাদা—'

—'সবাই আর কি সমান হয় দিদিমণি, তা ছাড়া বকুল হিমুতে হয় ত একটা বোঝাপড়া হয়েছে। তুমি ওভাবে দেখছ কেন—সহজ ভাবে নাও।'

—'ছাই, সহজ ভাব, ওসব কথা আমাকে আর বলিসনি পুষ্প। বিয়ের কি সব ঠিক হয়ে গেছে?'

—'বল্‌লে ত সবই স্থির হয়ে গেছে।'

দিদিমণি হেসে উঠলেন এবার, বললেন—'কে যে কি করল্ল কে জানে? তোমার ঐ বকুল নিজেই হয়ত গুছিয়ে নিয়েছে। বকুলই বা হিমুর মধ্যে কি এমন পেল আর হিমুই বা কি—যত সব কেলেঙ্কারি!' তারপর কিছুক্ষণ থেমে পুষ্পময়ীকে বলেন—'তোর কি মনে হয় এ বিয়ে ভালবাসার বিয়ে?'

—'তা না হলে কি বকুল ওকে বিয়ে করতে রাজী হত।'

—'পুষ্প, মনকে চোখ ঠারলে ত চলবে না, বকুল কখনই হিমুকে ভালবাসতে পারে না, তা যদি হয় তা হলে এতদিন যা শুনে আসছি, তা মিথ্যা। হিমু ত' ভালবাসার মত কিছুই করেনি। ব্যোমকেশকে ত শুনেছি বকুল প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, দুদিনেই সব ধুয়ে মুছে ফরসা হয়ে গেল? বলিহারি!'

পুষ্পময়ী কিছু বলে না, বলার আর কি আছে। অনেকক্ষণ পরে পুষ্পময়ী বলে—'আমার মনে হয় হিমাদ্রিকে হাতে রাখতে হলে আমাদের উচিত ওকে সাহায্য করা, ওর ব্যবসাতে কিছু দেওয়া।'

দিদিমণি সবিস্ময়ে বলে উঠেন—'টাকা! জলে ফেলে দেব!'

সারা ঘরটিতে স্তব্ধতা বিরাজ করে, টাকায় অবশ্য সব হয়, কিন্তু হিমাদ্রিকে হাত করতে টাকাই কি যথেষ্ট? কিন্তু সে টাকা কি অপব্যয় করা হবে না! পুষ্পময়ীর মনে একটা নূতন পরিকল্পনা জেগেছে। পুষ্পময়ী বলে—'হিমাদ্রির ব্যবসাটা জাঁকিয়ে তুলতে হলে কিছু টাকা দিতে হবে, একটা লিমিটেড কোম্পানি করতে হবে,' দিদিমণিকে বুঝিয়ে বলে, একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করলে হিমাদ্রি ওদের হাতের ভিতর থাকবে। হিমাদ্রিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে, কাজকর্ম সে-ই করবে, ওরা হবে অংশীদার। এতে হয়ত বকুলের ছোঁয়াচ থেকে হিমাদ্রিকে মুক্ত করা যাবে। হিমাদ্রিকে ভুলিয়ে ব্যবসায় মাতিয়ে তুলবে।

সারারাত ধরে দিদিমণি আর পুষ্পময়ী নূতন কথা চিন্তা করেন,—ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পুষ্পময়ী হিমাদ্রির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনলেন, হিমাদ্রির তখনও নাক ডাকছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

পরদিন—এবং সেই সপ্তাহ ধরে এই প্রস্তাব হিমাদ্রিকে নাড়া দিতে লাগল। এই সময়ে মোটা টাকার মূলধন হাতে এলে কাজের সুবিধা হবে সন্দেহ নেই। ব্যবসার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠবে।

প্রথমটা খুবই উৎসাহিত হল হিমাদ্রি—'ব্যবসাটা বাড়িয়ে তুলব সময়ও হয়েছে বাড়াবার, একটা ভাল জায়গায় অফিস বসাতে হবে, নিজস্ব ডিপো, গ্যারাজ প্রভৃতি বানাতে অনেক টাকারই ত প্রয়োজন।'

এই ভাবেই পুষ্পময়ী তাকে প্রলোভিত করতে থাকেন। বলেন—'আমাদের অংশ, আমাদের টাকা আমাদের নামে থাকবে, তুমি হবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার জন্য টাকা পাবে, অমত করার ত কিছুই নেই।'

হিমাদ্রির সকল যুক্তি তাঁরা খণ্ডন করেন, হিমাদ্রিই তার ব্যবসায়ের সর্বময় কর্তা থাকবে, উপরন্তু কিছু মূলধন বাড়বে।

হিমাদ্রির প্রতি তাঁদের এই সন্তজাগ্রত বিশ্বাসে সে পুলকিত হয়ে ওঠে—বকুলরাণীর কাছে গিয়ে বলে—'এঁরা আমাকে অনেক টাকা দিচ্ছেন, দিদিমণি আর পুষ্পদি—' এইটুকুই যেন সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ, বাকিটুকু অকিঞ্চিৎকর। হিমাদ্রি আর কোনো কথাই বলতে পারে না —শুধু বলে যায় ঐ টাকায় ও কি করবে, কি ভাবে ওব ব্যবসা ফেঁপে উঠবে। নূতন নূতন আইডিয়ায় ওর মাথা বোঝাই, মনের কথা তাই কিছুতেই মুখে চেপে রাখতে পারে না।

বকুলরাণীর মনে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ জাগে, সে ক্ষেপে ওঠে, অনুমান করে এর অন্তরালে নিশ্চয়ই কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি রয়েছে। এমন একটা ব্যাপার আছে যা হিমাদ্রি হয়ত খুলে বলে নি। সে ব্যাপারটি যে কি, তা সে কিছুতেই অনুমান করতে পারে না—ওর ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা এই চালে হয়ত বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে। বোঝাব খুব চেষ্টা করে বকুল—কিন্তু হিমাদ্রি প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না—দু চারটে কথা যা বলল, তাতে ওর কৌতূহল মেটেনা। হিমাদ্রি ভাবে সমস্ত প্রস্তাবটা একটা করুণার দান, সুতরাং সে ভিতরে প্রবেশ করতে চায় না— ভবিষ্যতের কথাটাই তার কাছে বড়।

এই কারণেই বকুলের সাহস হয় না বেশি কিছু প্রশ্ন করার, ওর এই সুখের স্বপ্ন ভাঙতে চায় না, দৃঢ়ভাবে নিজের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করে। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝতে পারে কি জাতীয় মানুষ হিমাদ্রি। হিমাদ্রির চরিত্রের দুর্বলতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পায়।

ক্রমশঃ অবশ্য সবটুকু জেনে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বকুল।

দিদিমণি ও পুষ্প বকুলকে ভয় করে, তারা বুঝেছে হিমাদ্রি

ব্যোমকেশের সর্বনাশ করেছে, হয়ত ওরা বুঝেছে বকুলও তা জানে, তাই তাকে জব্দ করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

বাড়িতে বউ হিসাবেই বকুল থাকবে, ব্যবসায়ে তার কোনো অধিকারই থাকবেনা। এখন হিমাদ্রি দিদিমণি ও পুষ্পের হাতের মুঠায়। বকুল শুধুই আইনসঙ্গত স্ত্রী।

বকুলরাণীর মনে নিদারুণ হতাশা জাগে, হিমাদ্রির কোম্পানিতে সে কোন কর্তৃত্ব কামনা না করলেও তার একটা কর্তব্য থাকবে, এই তার আশা ছিল। এখন যা শোনা গেল, তারপর আর সে সুযোগ হয়ত মিলবে না। পার্টির কাজে ব্যোমকেশের হুকুমে সে প্রচুর খেটেছে, অসীম উৎসাহ ছিল তার, মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, হ্যাণ্ডবিল বিলি করা, দলে নতুন সভ্য বাড়ান, অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। সেই উৎসাহ এখন নূতন দিকে চালনা করবে স্থির করেছিল। বোঝা গেল, হিমাদ্রির দিদিমণি ও পুষ্পময়ী বকুলকে দূরে সরিয়েই রাখতে চান, তাঁরা ওকে ভয় করেন, ঈর্ষা করেন, হয়ত এই বিবাহ ব্যাপারে ওঁদের মনে কোথায় সন্দেহ জেগেছে।

বকুলরাণী বুদ্ধিমতী, এই হতাশা তাই সে মনেই চেপে রাখল। বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভিতর সে এই অস্বস্তি প্রচ্ছন্ন রাখল, হাসিমুখেই একদিন নূতন জীবনে নূতন শাড়ি পরে প্রবেশ করল,—হিমাদ্রি একটা বাড়ি ভাড়া করেছে, ছোট্ট বাড়ি তালতলার কাছে,—সেইখানেই তারা বাসা বাঁধবে। এই বাসাবাড়ির কাছেই হিমাদ্রি নূতন গ্যারেজের করগেটের শেড তুলেছে। প্রথম দিকে ধাক্কা খেলেও এখনও সে নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি রক্ষা করে চলছে। দিদিমণিরা আইনের প্যাঁচে হিমাদ্রিকে বেঁধেছেন,

বকুল তাকে জয় করবে বুদ্ধির প্রভাবে। হিমাদ্রির আশার আর শেষ নেই, সেখানে বকুলের কাছে ওদের পরাজয় ঘটবে। বৌভাতের পর যখন উভয়ে এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে গেল তখনই হয়ত দিদিমণির অন্তর পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে গেল। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি তাই গম্ভীর মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন এমন এক জায়গায় ওরা চলেছে, যার ব্যবধান হাজার হাজার মাইলের।

পুরীতে যে হোটেলে এসে ওরা উঠল, তা গ্রীষ্মকালেই ভরে থাকে, বছরের এই সময়টিতে মালিক তাঁর আত্মীয়দের আপ্যায়িত করে থাকেন। সুতরাং হিমাদ্রি আর বকুলরাণীর হোটেল সম্পূর্ণ জন-হীন না হলেও বেশ ফাঁকা। দু চারজন স্থায়ী বাসিন্দা প্রেতের মত সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যার পর হোটলের বারান্দায় ফিরেও সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়, সমুদ্রকে ভুলে থাকা যায় না, উদ্দাম, উত্তাল ঝড়ের হাওয়া অবিরাম বইছে। বকুলরাণীর মনকে সমুদ্রের হাওয়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমুদ্রের বাতাসে সে নিঃশ্বাস নেয়, কান পেতে শোনে। হিমাদ্রির আলিঙ্গনের চেয়েও মধুর এই সামুদ্রিক পরিবেশ। হিমাদ্রির আলিঙ্গন, মৃদু কণ্ঠস্বর ও আবেগ সব এই সমুদ্রের শব্দে মুছে গেছে।

অবশেষে হিমাদ্রি বোঝে জীবনের ঠিক এই মুহূর্তে বকুলরাণীর দৈহিক উপস্থিতি চোখের সামনে থাকলেও, ওর অন্তর নিরুদ্দেশ হয়েছে। হিমাদ্রি বোঝার চেষ্টা করে ব্যাপারটা কি, কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায়, এবং বকুলের কাছ থেকে উদ্দাম প্রেম নিবেদনের বিনিময়ে কোন সাড়া না পাওয়ায় হিমাদ্রি ফুলতে থাকে—বিছানায় বকুলের পাশে নীরবে শুয়ে হিমাদ্রি আকুল হয়ে ওঠে। হৃদয়ে এই জ্বালা নিয়েও হিমাদ্রি নীরব থাকে। শুধু বকুলের কোমর থেকে হাতখানি সরিয়ে নেওয়ার সময় তার মনে নিদারুণ আঘাত লাগে,

শুধু অভিমান নয়, তার দম্ভে আঘাত লাগে। বকুলের এই নীরব নিষ্ক্রিয়তা, এই নিস্পৃহ ভাব হিমাদ্রিকে উত্তেজিত করে তোলে। নিজের মনোভাব মুখের ভাষায় প্রকাশ করার বাসনা হলেও সে চেপে থাকে। ভাবে তাতে হয়ত সুফল ফলবে না।

হিমাদ্রির মনে হয় তার মনের এই উদ্দাম আকুলতার ভিতর দিয়েই সে বকুলের চিত্ত জয় করবে। হতাশাতেই রাগ বেড়ে যায়—প্রেমের বিনিময়ে কোন কিছুই সে পেল না, পেল এই নিস্পৃহতা। এর জন্যই কিনা সে এত তাড়াতাড়ি করেছে,—এইত জীবন, ভবিষ্যতের এই ছবিই কি সে মনে মনে এঁকেছিল ?

ব্যাপারটি যে কি, তা সে হয়ত বুঝেছে, বকুল যে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা নয়। হয়ত অতীতের কথাতেই তার চিত্ত ভরে আছে। ফেলে আসা দিনগুলির কথা তাই সে ভাবছে হয়ত, হয়ত ব্যোমকেশের স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সে নিজে ত অতীত জীবনের সব কালিমা মুছে ফেলেছে মন থেকে, সে অবশ্য বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, বকুলরাণী স্ত্রীলোক, তাই সে স্মৃতির দংশন থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না! ভুলতে পারছে না তার অতীত। হিমাদ্রির সকল পরিকল্পনা সে সহানুভূতি দিয়ে শুনেছে, ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনায় পুলকিত হয়েছে—অথচ আজ তার একি শীতলতা।

হিমাদ্রি চুপ করে শুয়ে ভাবে। এও আবার জুয়া—এই রেসের মাঠে বিজয়ী হওয়া কঠিন। এবার তার পরাজয় ঘটল। অর্থনাশের চাইতেও এই পরাজয় অতি নিদারুণ। ভবিষ্যতের সকল আশা নির্মূল হল। উপস্থিত চুপ করেই থাকা ভাল।

সহসা বকুল একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। কাছে ঘেঁষে এসে হিমাদ্রির হাতখানি টেনে নিয়ে নিজের কানে চাপা দিল।

হিমাদ্রি মৃদু গলায় বলে—'কি হল ? কানে যন্ত্রণা হচ্ছে ?' বকুল নিরুত্তর। অনেকক্ষণ সে নীরব রইল, অথচ বোঝা যাচ্ছে সে ঘুমায়নি। সহসা বকুল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে জানালাগুলি চেপে বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় ফিরে আসে।

কিন্তু তবু সমুদ্র-গর্জন শোনা যায়,—যেন কানের কাছে কার উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে।—এ নিঃশ্বাস ব্যোম.কশের। এই ঘরে যেন ওরা শুধু দুটি প্রাণী নয়, আরও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিও অনুভূত হচ্ছে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে কিন্তু যেন সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। বকুলরাণী বিছানায় উঠে বসে হাই তোলে, রাতটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে, প্রভাতের শীতলতায় সেই কালো যবনিকা উঠে গিয়ে প্রকাশ হয়েছে নূতন জীবনের। বকুলরাণী উপুড় হয়ে আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

হিমাদ্রিও জেগেছে, আড়চোখে লক্ষ্য করছে বকুলকে, তার বিস্রস্ত বেশবাস, রুক্ষ চুল কপালে নেমে এসেছে, অর্ধোন্মুক্ত নিটোল বক্ষে ক্ষীণ রবিরশ্মি এসে পড়ছে, নগ্ন বাহুর শুভ্রতা প্রাণে উন্মাদনা জাগায়। কিন্তু হিমাদ্রি ওতে প্রলোভিত হবে না। বকুল যদি অতীতকে বুকে করে জলে মরতে চায়, মরুক। হিমাদ্রি সে কথা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনাও করতে চায়না—কোন দিন উল্লেখ করবে না। এটুকু সংযম ও সহিষ্ণুতা সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।

কলকাতায় ফিরেই হিমাদ্রি খবর পেল মাল চলাচলকারী আর সব লরিওলারা সম্মিলিত হয়ে গোপনে একটা দল বেঁধেছে, যে সব জায়গায় হিমাদ্রির লরি যাতায়াত করে তার ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হয়েছে,—অথচ হিমাদ্রিকে তারা দলে নেয়নি। সব ব্যাপারটি গোপনে ঘটেছে,

হিমাদ্রি বুঝল তার সকল প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য এই প্রচেষ্টা, দীর্ঘকাল হিমাদ্রি ওদের খদ্দেরদের হাত করার চেষ্টা করেছে ; ওদের বাঁধা রাস্তার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করেছে, তারপর সম্প্রতি দুর পাল্লার চুক্তি করার ফলে সোজাসুজি ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে,—সহসা তীব্র গতিতে ও পাল্লা দিতে নেমেছে তাই ওরা ভয় পেয়েছে,—হিমাদ্রির ব্যবসা ক্রমশঃই জাঁকিয়ে উঠছে, এটা তারা লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু ওদের এই মনোভঙ্গীতে হিমাদ্রি আতঙ্কিত হল। ওর চরিত্র, ওর সাফল্য, উচ্চ আশাবলী সবই একটা সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে —তবু এই প্রথম আঘাত এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে, ও প্রস্তুত ছিলনা, তাই বিচলিত হয়েছে। এমন কোন আত্মিক শক্তি হিমাদ্রির নেই, যার সাহায্যে এই ধাক্কা সামলিয়ে নিতে পারে। হিমাদ্রির চোখে এই ঘটনা অবিচার, হীন ঈর্ষাপরায়ণতার চিহ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু সে অসহায়, অক্ষম, নিজেকে বাঁচাবার কোন অস্ত্রই তার তূণে নেই।

বকুলরাণী বুঝেছে কেন এই মানসিক ক্লেশ হিমাদ্রির। তার সেই দীর্ঘদেহের প্রতিটি রেখায়, মুখের ভঙ্গীতে হিমাদ্রির চিন্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সে ভয় পেয়েছে। হিমাদ্রি আব চাপতে পারেনা, বলে ফেলে—

—'এই রেটে ওদের সঙ্গে কম্‌পিট করা শক্ত। ঐখানেই আমাকে মেরেছে, ওরা দু'বার মাল ঐ রেটে চালাতে পারে। ক্ষতি স্বীকাব করেও পাবে, আমি কিন্তু চেষ্টা করলেও পারিনা। অল্প পুঁজির নতুন কারবার লোকসান দেওয়ার সামর্থ্যও নেই।'

বকুলরাণী চুপ করে ভাবে। জবাব দেয়না,—ওদের জীবন ধারায় আবার একটা নতুন পর্ব শুরু হল। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ওর সাহায্য হয়ত হিমাদ্রিকে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে টেনে তুলতেও পারে,—হিমাদ্রির মনে এমন এক উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে, যার ফলে ও বিপন্মুক্ত হয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

কিন্তু যেভাবে হিমাদ্রির অন্তরে শক্তি সঞ্চার করতে পারে বকুলরাণী, ঠিক সেই ভাবেই তাকে আবার ধ্বংসও করতে পারে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিশ্বাস পড়েনা বকুলের, ধ্বংস করা বা বাঁচান উভয় বাসনাই মনের ভিতর সমভাবে কাজ করে। কি যে করা উচিত ভেবে পায়না।

তবু সর্বদাই মনের ভিতর হিমাদ্রি সম্বন্ধে একটা অভিমত জমে ওঠে। হিমাদ্রির জীবন-দর্শনে যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা লক্ষ্য না করে উপায় নেই।

যে হিমাদ্রিকে ও মনের ভিতর এঁকে রেখেছিল, সেই ধূর্ত, শঠ ও ঘৃণ্য জুয়াচোর আজ কোথায় মিলিয়ে গেছে, যার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অন্ত ছিলনা বকুলের,—সে হিমাদ্রিকে পাওয়া যাচ্ছেনা। তার পরিবর্তে এই পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল যুবক আজ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে লোকটির সঙ্গে সংঘাত ঘটবে আশা করে ও মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সে আজ সাফল্যের পুণ্য সলিলে স্নান করে সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে উঠে এসেছে। এই হিমাদ্রিকে যদি সে ধ্বংস করে তাহলে হয়ত যাকে ও ধ্বংস করতে এসেছিল সে-ও ছায়ায় মিলিয়ে যাবে। তাই এখন হঠাৎ কিছু একটা করে বসা অন্যায় হবে, হঠকারিতা হবে, কারণ এত ভাল হলেও এই হিমাদ্রির ভিতর অতীতের হিমাদ্রি মাঝে মাঝে যেন ফুটে ওঠে, সেই ভঙ্গী, সেই শঠতা, সেই ঈর্ষাপরায়ণতা চাপা থাকেনা, তখন বকুল কিছুতেই ভুলতে পারেনা, এই সেই হিমাদ্রি, যে ব্যোমকেশকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তাই—ওকে ছাড়াও যায়না, অন্ততঃ এই মুহূর্তে, হৃদয়ের উপর তলায় কোথায় যেন সব কিছু বিগলিত হয়ে এক হয়ে গেছে, সেইখানেই শত্রু হিমাদ্রিকে খুঁজে বার করার বাসনা লোপ পেয়েছে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে হিমাদ্রিকে সন্ধান করে বেড়ানর দিন এখনও শেষ হয়নি। মনস্থির করে বলে ওঠে বকুলরাণী—

—'তুমি তোমার কারবার চালিয়ে যাও, কতকগুলো পার্টির সঙ্গে ত আগাম কনট্রাক্ট করা আছে, এখনও যেভাবে চার্জ কবা হচ্ছে সেই ভাবে চার্জ করে যাও।'

—'যদি আমি রেট না বদলাই, তাহলে সে সব পার্টি ক্রমে হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

—'কিন্তু গড্ডালিকার মত অপরে যা করছে তা কবতে যাবে কেন? ভেবে দেখ, না হয় দু'একটা খদ্দের কমবে, যারা হাতে থাকবে তাদের অন্যদিকে সুবিধা করে দেবে, রেট কমিয়োনা। তবু একটা বলার থাকবে ওদের ষড়যন্ত্রে আমরা ভয় পাইনি, অবশ্য যারা সুবিধাবাদী তারা ওদের দিকেই ঝুঁকবে সস্তার লোভে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়। যে টাকায় আর নতুন লরি কিনবে ঠিক করেছিলে, তাতে ববং একটা পেট্রল পাম্প বসাবার চেষ্টা কর, হাজরা রোডের সেই যে লোকটা বলছিল চালু ব্যবসা বিক্রী করবে, সেটা না হয় কিনে নাও, বাসের বডি তৈরি করলেও তোমার লাভ কম হবে না। সাধারণে এতসব দলাদলি বা নোংরামি বোঝেনা; যা করেছ তাই বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যাও, রেট এমন কিছু বেশি নয়।'

হিমাদ্রি ভেবে বলে—'দেখি, তাই না হয় করব।'

—'নাহয় নয়, তাই কর, ওদের উপেক্ষা করে কাজ করে যাও, তোমার খদ্দেরদের বিশ্বাস কর, কেন রেট কমান হচ্ছেনা জানিয়ে তার সার্কুলার পাঠাও সকলের কাছে,—এই সম্মিলিত ভাঁওতায় ভুলনা।"

বকুল চুপ করে রইল, হিমাদ্রির প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য কবে দেখে, লক্ষ্য করল আগে যেখানে হতাশা আর উদ্বেগ ছিল সেই মুখে এখন জেগেছে দৃঢ়তার ছাপ, ফুটে উঠেছে উদ্দীপনা ও উৎসাহের চিহ্ন। সে বলে—'বেশ তাই করব,—দেখা যাক কি হয়, তবে এতে বিপদও আছে।'

—'থাক্‌গে বিপদ, এতদিন জুয়া খেলে এসেছ, ভয় পেলে চলবে কেন? এও ত জুয়া!'

ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে বকুলের মুখের পানে হিমাদ্রি তাকায়, বলে—'জুয়াতে ভয় করি না বটে, এককালে ভালই করেছি, মুস্‌কিল এই যে—'

—'কি মুস্‌কিল!'

—'যে টাকা আমার নয় তাই নিয়ে আমি জুয়া খেলতে চাইনে। দিদিমণি ও পুষ্পদির টাকাও আমার সঙ্গে রয়েছে।'

বকুল উপদেশ দেয়—'দু এক সপ্তাহ দেখ, অন্য ফার্মরাও কি করে দেখ—সেদিন কাগজে দেখেছিলুম মার্চ মাসের পর পেট্রলের দাম বাড়বে, তুমি দর কমাচ্ছ না দেখে ওরা প্রথমটা অবাক হবে, তারপর পেট্রলের দর যদি চড়ে, ওরাও আবার দর বাড়াবে। এই রেটে কাজ করলে ওদেরও লোকসান দিতে হবে। বেশিদিন কখনই চালাতে পারে না।'

হিমাদ্রি মুখ টিপে হাসে। সত্যই এও একরকম জুয়া। কথাটা ভাবতেও ভাল লাগে।

পরদিন কিন্তু শহরের নানা জায়গা থেকে দালালরা ফোন করে, সারাদিনই টেলিফোন বাজছে,—এক সময় অসহিষ্ণু হিমাদ্রি নিজেই টেলিফোন ধরে বলে—'হ্যাঁ, আমি কথা বলছি—'

—'সবাই ভাড়া কমাচ্ছে, আপনাদের নতুন সিডিউল পাইনি এখনও—'

—'হ্যাঁ, সবাই কমিয়েছে বটে, আমরা কমাইনি, আমার কারও সঙ্গে কমপিটিশন নেই, অন্য ফার্ম কি করছে, তাতে আমার কি, আমার রেট বরাবরই রিজ্‌নেব্‌ল্‌—'

অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসে—'কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে যেখানে ভাল রেট্‌ পাওয়া যাবে সেখানেই আমরা কনট্রাক্ট করব, ব্যবসা করতে বসেছি মশাই, হরিনামের দল খুলিনি—'

তেমনই চড়া গলায় হিমাদ্রি বলে—'কেউ আপনাকে ত মাথার দিব্যি দেয় নি, যা ভাল বোঝেন করবেন—'

—'না হিমাদ্রি বাবু, এটা সেন্‌টিমেণ্টের ব্যাপার নয়, ব্যবসায় সেন্‌টিমেণ্ট নেই—'

—'সেন্‌টিমেণ্ট! ও সব ছেঁড়া কথা রেখে দিন, দু' পয়সা সস্তা হ'লেই যদি আপনারা এত উতলা হয়ে পড়েন, তা হলে গো-মাংসও ত সস্তা—'

বকুলরাণী টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে কনেকসনটা কেটে দেয়। বিরক্ত হিমাদ্রি বলে—'এই ত অবস্থা, এদেশে ব্যবসা চালান এই কারণেই কঠিন।'

সপ্তাহান্তে হিসাব-নিকাশ করা হল, হিমাদ্রির আয় অনেক কম হয়েছে, কন্‌ট্রাক্টের বাইরে একটিও খদ্দের পাওয়া যায়নি। খদ্দেররা কোথায় অর্ডার দিচ্ছে বোঝা কঠিন নয়। হিমাদ্রির সামনে যেন আসন্ন সর্বনাশের ছায়া ভাসছে।

বকুলরাণী সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'অত ভেব না,—মনে কর তোমার সব খদ্দের অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, যা কিছু কাজ অপর লোকেরাই পাচ্ছে, কিন্তু এই কি তাদের কাছে যথেষ্ট, ঠিক তখনই লোকসানের পরিমাণ না বুঝলেও লোকসান ওদের হচ্ছেই, তোমার কাজ না করে লোকসান, ওদের কাজ করে লোকসান। ওরা যা খুশি করুক, চুপটি করে বসে দেখ। অল্প সময়ের ভিতরই ওরাও বুঝবে।'

হিমাদ্রি বলে—'এও একরকম অহিংস অসহযোগিতা। ওদের যদি একটুও ঘা দিতে পারতাম!'

—'তাহলে লাখ লাখ টাকার মূলধন দরকার হত। যেমন আছ, তেমনিই থাক—'যে সহে সে রহে'। যে সৎভাবে কাজ চালায় সাধারণ লোকে তাকেই প্রশংসা করে—'

—'কিন্তু প্রশংসায় পেট ভরে না—'

—'দরকার একটু ধৈর্যের।'

হিমাদ্রিও তা জানে, কিন্তু ওর ধৈর্য নেই এতটুকু। আরও দুদিন কাটল, তারপর হিমাদ্রি প্রতি পার্টির কাছে সার্কুলার পাঠাল, চারিদিকে বড বড পোস্টার মারল, দুখানি লরি আগাগোডা পোস্টারে মুড়ে রাস্তায় বার করল।

হিমাদ্রি সংগ্রামে নামল।

এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই হিমাদ্রির এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলকাতা শহরের সবাই জানল।

যারা ওকে জানে তারা বলতে লাগল, এবাব তলিয়ে যাবে, একেবারে অতলে তলাবে, যাবা কানাঘুষো ওব সম্বন্ধে শুনেছে, তারা বলে, ডাকাত, অজ্ঞাতকুলশীল জুয়াচোর,—আব একদল বলে, টিকে যাবে ঠিক, লোকটাব অসীম সৌভাগ্য। দেখবে ওই সব রুই-কাতলা ঘাল করে ও-ই শেষটায় উঠে দাঁড়াবে।

আরও দু এক সপ্তাহ কাটল, হিমাদ্রির ব্যবসা ক্রমশঃই ডুবছে, এমন দিনও গেছে যেদিন একটি পুঁটলি বইবারও অর্ডার পাওয়া যায়নি। ডিপোতে সারাদিন পায়চারি করে হিমাদ্রিব দিন কাটে।

অবশেষে হিমাদ্রি মফস্বলে বেবিয়ে পডল—বর্ধমান, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, লম্বা দৌড়ের পাড়ি—দুচারটে অর্ডারও সংগ্রহ করে আনল: এবাব আরও দৃঢপ্রতিজ্ঞ। মনে প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতা।

কিন্তু কলকাতার ব্যবসা খারাপ—বকুলকে বলে—'আমার দেখছি এবার হয়ে গেল, আমাব মত দুচারটে ফার্মকে ওরা সব কিনে নিতে পাবে, সেন অ্যাণ্ড সেন, ম্যাকেঞ্জী ব্রাদার্স, বামকৃষ্ণ আগরওয়ালা—এদের কাছে দাঁড়াব আমি! ওরা আজ দশ বিশ বছর ধরে এই ব্যবসাই করছে।'

বকুল দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে—'তুমি তোমার কাজ করে যাও।'

এই সব খেদোক্তি শুনতে বকুলের ভাল লাগে না। অসাফল্যের আশঙ্কায় মনকে বিষিয়ে যেতে দিতে রাজী নয় বকুল, তাই যতটা পারে উৎসাহবাণী দেয়। তাই যত দিন কাটে ততই হিমাদ্রির মনে আশা জাগে, মফস্বলের কনট্রাক্টের জন্যই ব্যবসাটা কোনক্রমে টিকে আছে আজও। হিমাদ্রি নিজের ভাগ্য, বুদ্ধি ও সাহসের ওপর ভরসা রেখে নতুন জুয়ায় মেতেছে।

পুরাতন দিনের শক্তি, সামর্থ্য ও ধূর্তামি কিছুই মুছে যায়নি, যেন সেই সব ওর মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করছে। একটা নতুন প্ল্যান মাথায় এসেছে, সেই প্ল্যান কার্যকরী করে তুলতে হবে, এই হল ওর সর্বশেষ জুয়া।

দু তিন দিন ধরে বড বড় খালি প্যাকিং বক্সে হিমাদ্রি ডিপো ভরিয়ে ফেলল, স্ট্র্যাণ্ড রোডের ও লালবাজারের কয়েকটি ছোট বড় দোকানে বকুলরাণীর জানাশোনা ছিল—সেও অনেক খালি বাক্স, পিপে প্রভৃতি সংগ্রহ করে আনল, সেগুলি খড় আর রাবিশ দিয়ে বোঝাই করে রাখা হয়েছে, সেই স্তূপ হয়ে চারদিকে ছত্রাকার হয়ে রইল। হিমাদ্রি ইচ্ছা করেই ডিপোর চারপাশের দরজা খুলে রাখল—কৌতুহলী দর্শকদের ও বেকারের ছোট খাটো ভিড় জমল।

মুখে মুখে চারদিকে এই কথা রটে গেল, হিমাদ্রিও খানিকটা ইচ্ছা করেই রটনার রাস্তা প্রশস্ত করে দিল। ভাব দেখাতে লাগল, অতি ব্যস্ত, অনেক কাজ, পাঁচজনে যা বলত তাই ঘটতে বসেছে, কারবার এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। হিমাদ্রির শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরাও কথাটা শুনল, কেউ কেউ চর পাঠিয়ে সত্যাসত্য নির্ণয় করে নিল। শুনল ছাদ পর্যন্ত মাল বোঝাই হয়ে হিমাদ্রির গুদাম বোঝাই হয়ে রয়েছে, তিল-ধারণের জায়গা নেই।

পরদিন হিমাদ্রি দু একজন প্রতিপক্ষকে ফোন করল, দু একখানা লরি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে কিনা, এত মাল হাতে জমে রয়েছে যে, নিজের লরি পেরে উঠছে না।

তারা ত অবাক! এ কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! ওদের কারবার মন্দা, যাও কাজ মিল্‌ছে তার টাকা আদায় হওয়া শক্ত, আর ঐ ছোকরা সেই আগেকার রেটে এত কাজ পাচ্ছে! তারা গজগজ করে।

তার পরদিন পুরাতন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে হিমাদ্রি কয়েকটি লরি ভাড়া করল—তাতে পোস্টার আঁটল, কয়েকজন পরিচিত ড্রাইভারকে সব কথা ভেঙে বুঝিয়ে ঠিকে মাইনে ও কমিশনে রাখা হল। তারা শহরের কর্মব্যস্ত অঞ্চলগুলিতে অনাবশ্যক ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর মাঝে মাঝে দমদম বা টালিগঞ্জ প্রভৃতি শহরের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরে আসতে লাগল।

পরদিন প্রভাতে আবার তারা সেই ভাবেই কাজ শুরু করে। সকলেব মনেই একটা দুঃসাহসিকতার ভাব জেগেছে, হিমাদ্রির মনোভাব ওদের ভিতরও রূপ নিয়েছে। তারাও উৎসাহিত, যেন জুয়ায় মেতেছে।

ওরা চলে যাওয়ার পর হিমাদ্রি বসে বসে হিসাব-নিকাশ করে। ইতিমধ্যে আঠারোজন খরিদ্দারের কাছ থেকে চিঠি এসে পড়েছে, কনট্রাক্টের ফর্ম্‌ চেয়ে পাঠিয়েছে কেউ, কেউ বা রেট জানতে চায়, কেউ বা প্রতিনিধি পাঠাতে বলেছে।

হিমাদ্রি হাসে। ওর ভাঁওতা যে কাযকরী হয়েছে, হিমাদ্রি তা বিশ্বাস করে। বিশ্বাস না করে উপায় নেই, কারণ পরদিন আরও অর্ডার পাওয়া গেল। শহরে সর্বত্র হিমাদ্রির অপূর্ব কর্মকুশলতা, সংগঠন-শক্তি ও ব্যবসা-বুদ্ধির প্রশংসা হতে লাগল। সবাই বলে—লোকটার আশ্চর্য ভাগ্য!

জুয়াড়ি হিমাদ্রি বোঝে তার ধাপ্পা কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু এই

ধাপ্পার সম্পূর্ণ সুযোগ পেতে হলে প্রয়োজন আরও মূলধনের—কিন্তু তার একটি পয়সাও নেই।

হিমাদ্রির ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে।—সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সে এতদূর এগিয়ে এসেছে, এসব বিজয়ী হয়েছে, বিষয় বিক্রী করে জুয়া খেলেছে, কিন্তু এখন বাজির টাকা তুলে ঘরে আনার সামর্থ্য তার নেই, এতই সে দুর্বল। যে সব ড্রাইভার এই জুয়ায় ওকে সহায়তা করেছে তাদের টাকা বাকি, যাঁরা পেট্রল দিয়েছে তারা টাকা পাবে, গুদামের ভাড়া দেওয়া হয়নি—দেনায় চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। এই সব আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে হিমাদ্রি বাড়ি ফিরল।

বকুলরাণী ওর জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিল। হিমাদ্রি কিছু বলার পূর্বেই ফিস ফিস করে বলে—'দু'তিনজন এসে বসে আছেন, ওঁদের একটা প্ল্যান আছে,—ভাল করে জমাতে পারলে কিছু ক্যাপিটাল পেয়ে যেতে পার।'

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে, তিনটি বড় বড় ফার্মের কর্মকর্তা ভিতরে বসে আছেন। এদের মধ্যে একজন হিমাদ্রিব প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু এখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গের ভঙ্গীতে হিমাদ্রিকে অভিনন্দিত করে, হিমাদ্রিব জয়ে ওদেরও জয়লাভ ঘটেছে, সেই আনন্দের অংশভাগের জন্যই এই আগমন। হিমাদ্রিকে তারা স্পষ্টই জানায়—টাকার জন্য আটকাবেনা, দশ-বিশ হাজার যা লাগে ওঁরাই দেবেন,—লিমিটেড কোম্পানি জাঁকিয়ে উঠুক, হিমাদ্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোক, ওঁদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। কত পরামর্শ, কত প্ল্যান।

হিমাদ্রি মাথা নাড়ে, ওদের কথা কিছুতেই যেন বুঝতে পারেনা।

ওঁরা যখন গভীর রাত্রে উঠে পড়লেন, হিমাদ্রি তিনবার চেঁচিয়ে বলল—'কিছুতেই নয়। ওই পেট-মোটা কুমিরগুলোকে কিছুতেই সারা জীবনেব সাধনার ফল গ্রাস করতে দেবোনা।'

পরবর্তী দিনগুলিতে যখন বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়ে ফসল কুড়াবার পালা—তখন সংশয়-সঙ্কুচিত মনে উদ্দেশ্যহীন হিমাদ্রি নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে, তার মনে তখন শুধু শত্রুপক্ষের ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না যে, এই বহুমূল্য কলহের ফলে আজ সে ডুবতে বসেছে। এখন যে কি অবস্থা দাঁড়াবে সে োঝে,—এর হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। এত টাকা দেনা, তার ওপর দিদিমণি ও পুষ্পময়ী এবং তার নিজের মূলধনও নিঃশেষিত। এ এক অসহনীয় অবস্থা, এখন এই অবস্থায় অদৃষ্টবাদী হওয়া ভিন্ন আর উপায় কি, তাই হিমাদ্রি ভাবে অবশিষ্ট জীবন দারিদ্র্যের নরক-যন্ত্রণার ভিতর কাটাতে হবে। যে নক্ষত্র এতদিন ধূলার অঞ্জলি সোনায় পূর্ণ করেছে, সে নক্ষত্র এইবার বোধকরি অন্য ক্ষেত্রে চলে গেল—এখন ওব শনিব দশা।

অবশেষে বকুলকে বলে ফেলে—'হাতে আর একটি আধলাও পড়ে নেই, কি যে করি ভেবে পাইনা,—সব গেল, এবার ডুবে যাব। এখনই টাকায় থলে ভর্তি কববার কথা, কিন্তু আমাব লোক কই, লবি কই, তা যদি থাকত, ওদেব আমি ডুবিয়ে দিতে পাবতাম, আবার উঠে দাঁড়াতাম। কিন্তু এখন বানচাল হওয়াব অবস্থা, ভিতবকার খবরটুকু ওরা পেলেই আমাকে মরণ কামড দেবে।'

বকুলবাণী বাঁচার একমাত্র পথ বলে দেয়,—হিমাদ্রি আতঙ্কিত বিস্ময়ে শুধু শুনে যায়। বকুল জোর গলায় বলে—'তোমাব দিদিমণিবে বল কাপড়ের কারবারের অর্ধেক টাকা এদিকে দিক, তোমার দাদাবাবুকে দিদিমণি একটু বুঝিয়ে বললেই হয়ে যাবে।'

—'ওরা ব্যবসার অবস্থা জানে, ওদেব সঞ্চিত টাকা সব গেছে,—বাড়িভাড়া, পেট্রল আর মাইনে দিতেই জলের মত টাকা নষ্ট হয়ে গেল।'

বকুল জেদ করে বলে—'দিদিমণিদের ছেলেপুলে নেই, যা গেছে তা তুলে আনতে হলে আরও টাকার দরকার, না দেয় ওরাই ঠকবে, এটা বুঝিয়ে বলতে পারবেনা ?'

হিমাদ্রি শুধু হাসে, বকুল পাগলের মত বকছে।

বকুল তবু বলে—'কেন পারবেনা ?'

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—'তুমি রসিকতা করছ !'

—'মোটেই তা নয়, বুঝছনা এখন তোমার পিছনে টাকা দেওয়াটাই ওদের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে। বড় বড় পার্টির সঙ্গে লড়াই করে তুমি সবে জিতেছ। এখন যদি আরও দু দশ হাজার ফেলতে পার, তবেই ব্যবসা জোর হবে, নইলে যে সবই তলিয়ে যাবে।'

—'তা বটে, কিন্তু ওদের কিভাবে বোঝাই ? কাপড়ের দোকানই ওদের লক্ষ্মী, সেখানকার টাকা কি দাদাবাবু ছাড়বে !'

বকুল আবার বলে—'বলেই দেখনা একবার, মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই ফল হবে।'

মাথা চুলকে হিমাদ্রি বলে—'বলব, কিন্তু সে হবে চরম নিষ্ঠুরতা, ওই টাকাই ওদের সব। এতখানি নির্মম হব ?'

—'কিন্তু যা গেল, সেটাই কি কিছু কম ? ওদিক থেকে দিলে এদিকে আশা থাকবে।'

বকুল মনে মনে হাসে, হিমাদ্রিও নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে।

হিমাদ্রি বলে—'আর এক মুস্কিল কি জান, পুষ্পদি বাধা দেবে। পুষ্পদির কথায় দিদিমণিরা ওঠে বসে।'

নিস্পৃহ কণ্ঠে বকুল বলে—'আমার কথাটাই শোন। বলে দেখ।' তারপর হেসে বলে—'এতখানি যুদ্ধ করে এখন ওদের ভয়ে যে কুঁকড়ে গেলে !'

হিমাদ্রি মৃদু গলায় বলে—'ভয়েরই যে কথা, ওদের আমি সত্যিই ভয় করি।'

কথাগুলি কান্নার মত শোনাল।

অনেক তর্ক, অনুনয়-বিনয় এবং ক.কুতি-মিনতির পর দিদিমণিদের হাত থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেল। যে পুষ্পময়ী হিমাদ্রিকে সকল ব্যাপারে অকুণ্ঠিত সাহায্য করে এসেছেন. তিনিও এবার বেকে দাঁড়িয়েছিলেন, অবশেষে যেন বিরক্ত হয়েই দিদিমণি টাকাটা দিয়েছেন, হিমাদ্রির উপর যে কোন আস্থা আছে, তা মনে হলনা। তাঁরা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন—'এই পর্যন্ত। এর বেশি আর আশা কোরনা।' পথে বেরিয়ে হিমাদ্রিব মনে হয়েছে আজ সে সর্বপ্রথম অপমানিত হল, আব শুধু বকুলরাণীর কাছে তাড়া খেয়েই এই কাজ কবতে হল। এইবাবই ওব চবম পরীক্ষা।

হিমাদ্রি কাজ করে চলছে বটে, কিন্তু মনে আর সে উৎসাহ নেই, প্রাণে নেই উদ্দীপনা। এই ওর শেষ জুয়া, এথেকে যদি ওঠে ত উঠল, নইলে নিদারুণ সর্বনাশ। বকুল ওকে সাহস দিযেছে, পুষ্পদি বাধা দিযেছেন। অদৃষ্টবাদী হিমাদ্রির আত্ম-বিশ্বাস আব নেই। জীবনের যাত্রাপথে কত অভিজ্ঞতাই না সঞ্চিত হয়েছে, লেখাপড়ায় যে একটা উচ্চ আসন দাবি করতে পারত, সে রাজনৈতিক ঘূর্ণি হাওয়ায় অন্য দিকে চলে গেল, দেশাত্মবোধের চাইতে বাজনৈতিক গুপ্তদলের রহস্যময় রোমাণ্টিক পরিবেশই হয়ত সেদিন তাকে হাতছানি দিয়েছিল, তাই অগ্নিরথের সাবথি হওয়াব বাসনাতেই সে সব ছেড়ে দিয়ে মেতেছিল, সারথির মর্যাদা পায়নি, রথের চাকার নীচে পড়ে গেছে, সেথান থেকে যে তাকে বাঁচিয়েছিল, যে টেনে তুলতে পারত, সেই ব্যোমকেশের ও

সর্বনাশ করেছে। ব্যোমকেশ ছিল নিস্পৃহ, স্বার্থত্যাগী কর্মী, চিরদিনই আদর্শের পিছনে ছুটেছে, তাই এদেশে কম্যুনিজ্‌মের হাওয়া এসে পৌঁছতেই সে সেদিকে ভিড়ে পড়েছিল, কৃষক-মজতুররাজের স্বপ্ন দেখত, থাকতও তাদের মত,—অগ্নিরথের সারথি হওয়ার সততা ও সামর্থ্য ব্যোমকেশের ছিল, কিন্তু তার চরিত্রের সর্বপ্রধান দুর্বলতা ছিল হিমাদ্রি, হিমাদ্রিকে বোধ করি ব্যোমকেশ বকুলের চাইতেও ভালবাসত। তাই হিমাদ্রির সম্বন্ধে পার্টি-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সতর্কবাণী পাওয়া সত্বেও তাকে ছাড়তে পারেনি। আর সেই পাপেই তার জীবনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এখন সারাজীবন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বসে স্বপ্ন দেখুক কৃষক-মজতুররাজের,—স্বপ্ন দেখুক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের।

হিমাদ্রির মনে এতদিন পরে ব্যোমকেশের কথা জেগে ওঠে! ব্যোমকেশের মত বন্ধুকে ওভাবে বিসর্জন দিয়ে আজ সর্বপ্রথম অনুশোচনা জাগল হিমাদ্রির মনে। উৎসাহ নেই, উদ্দামতাও নেই, সহসা কেমন যেন সে জুড়িয়ে গেছে। এবার যে সাফল্য আসবে, সে বিশ্বাস তার আছে—যত দিন যায় নূতনতর সাফল্যের দিকে সে এগিয়ে চলেছে তা বোঝে, কিন্তু ওর ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা এখন সাফল্যের জন্য উন্মুখ হয়ে নেই, এখন সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—তত কিম্!

এই প্রশ্নটাই এতদিন মনের কোণে সঞ্চিত ছিল,—সেই সংশয়ই আজ ওকে উদ্বেল করে তুলেছে, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে—যেমন ভ্যাপসা গরমে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, হিমাদ্রিরও সেই অবস্থা। কেমন একটা অজানা ভয়ের আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত হয়ে আছে।

গত কয়েকমাস ধরে বকুলরাণীর কাছ থেকে যে তাড়না পাওয়া গেছে, সকল ব্যাপারে যে ভাবে সে চাপ দিয়েছে, তাতে হিমাদ্রির মনে সন্দেহ জেগেছে যে, বকুলের এই চাপের পিছনে হয়ত কোনও প্রচ্ছন্ন

কূট মতলব আছে। সংশয়াচ্ছন্ন হিমাদ্রির মনে এই কথা অনের আগেই জেগেছে—কিন্তু ইদানীং তা প্রবল হয়ে উঠেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে এই কথাই মনে আন্দোলিত হয়, যতক্ষণ না মন ঘুমের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দিনের বেলা এই নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর থাকে না। অগণিত কাজের ভিড়ে ব্যক্তিগত ভয় ও ভাবনা কোথায় মিলিয়ে যায়। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর তাদের সম্বন্ধে আর কোনই ভয় নেই, এই এক আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে, ইতিমধ্যে আরও চারটি লরি কেনা হয়েছে, কাছাকাছি মফস্বল শহরে এজেন্সি খোলা হয়েছে,—সর্বত্রই ওর কার্যের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে,—ক্রমশঃই ব্যবসা, মূলধন আর সুনামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠছে।

যে জায়গাটাতে গ্যারেজ ছিল শীতকালের ভিতরই কথাবার্তা পাকা করে এক রকম নাম মাত্র মূল্যে হিমাদ্রি কিনে নিল। মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন বেরোয়। নির্যাতিত দেশকর্মী হিসাবে নামটাও প্রচারিত হয়—খদ্দরমণ্ডিত হয়ে গান্ধী টুপি মাথায় পথে বেরোলে ছোটখাটো নেতা বলে পথিকের মনে সম্ভ্রম জাগে। এখন সে ইচ্ছা করলে কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউনসিলারও হয়ে যেতে পারে। বর্ধমান অর্থের সঙ্গে তাল রাখতে গেলে খাটতে হবে, তাও অনেক পরিশ্রম করে হিমাদ্রি, যত যার সম্পদ তার বিশ্রামের অবসর কই? লাভের টাকা সুবিধা মত খাটাতে হবে, কোথায় কি ভাবে তা খাটালে বেশি লাভ, সেই চিন্তাটাও কম নয়। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একটি কথাই বারবার মনে জাগে—সবই ত হল—কিন্তু তত কিম্?

সৌভাগ্যের এই শিখর-চূড়ায় বসে কিন্তু অতীতের দায়িত্বহীন জীবনের কথা যখন স্মরণে আসে, তখন তার সকল উৎসাহ কেমন ঝিমিয়ে যায়, তখন উজ্জ্বল সূর্যালোক, রেসের মাঠ, সেই সাংহাই রেস্তরাঁ

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, ম্যুজিয়ম, মাঠ-ঘাট, এসপ্লানেড প্রভৃতি যে সব জায়গায় ব্যোমকেশের সঙ্গে একত্রে বেড়িয়ে বেড়াত, সেই সব স্মরণে আসে—আর ব্যোমকেশের কথা একবার মনে এলে সহস্র চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না। সকল কিছু ছাপিয়ে মনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে বসে ব্যোমকেশের কথা।

যত দিন যায় অবস্থা ততই যেন জটিল হয়ে ওঠে, প্রথমটা ব্যোমকেশের গ্রেপ্তার ও বিচারের পর ভয় ও ভাবনায় হিমাদ্রি দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়েছিল! তারপর এমন এক সময় এল, ভাবাবেগের ঘোর কাটিয়ে উঠল সে। ব্যোমকেশ ও তার জীবনের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে হিমাদ্রি নতুন জীবন শুরু করেছিল, সে জীবনে ব্যোমকেশের কোনও স্থান নেই। হিমাদ্রি মুক্ত, ব্যোমকেশ বন্দী, কিন্তু হিমাদ্রির সেই মুক্ত জীবন বড় সুখের ছিল না, সে জীবন ছিল কঠিন ও কঠোর। কিন্তু এখন সহসা সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ভাগ্য-বিধাতা প্রসন্নদৃষ্টিতে ওর দিকে দেখছেন। পরিশ্রমের বিনিময়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পুরস্কার আসছে প্রচুর, ওদিকে নির্জন কারাবাসে ব্যোমকেশের হয়ত অনাহারে অনিদ্রায় সময় কাটছে।

হিমাদ্রি ব্যোমকেশের কথা না ভেবে পারে না। জীবনের সকল সুখের আস্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে,—যে সব স্বাভাবিক সুখ ও শান্তি মানুষের জীবনে আসে। অতি তুচ্ছতম আনন্দেরও আস্বাদ ব্যোমকেশ পায় না। বন্দী জীবন—কারা-প্রাচীরের অন্তরালে টবের গাছের মত অস্বচ্ছন্দ গতিতে কাটছে—দুঃস্বপ্নের অন্ধকার পার হয়ে একদিন যে আলোর দিকে এগিয়ে আসবে এমন সম্ভাবনাও নেই। অপরাধ করেছে, তাই ব্যোমকেশ শাস্তি পেয়েছে। সে অপরাধে হিমাদ্রিরও অংশ ছিল, কিন্তু শাস্তির অংশ সে পায়নি—সে আজ মুক্ত, স্বাধীন মানুষ। হিমাদ্রির সাফল্য ও সম্পদ এখন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিজের ঐশ্বর্যে আজ হিমাদ্রি বিভ্রান্ত, তার এত সম্পদ—আর ব্যোমকেশ রিক্ত। এমন 'কি মানুষ হিসাবে সে মুক্ত, স্বচ্ছন্দবিহারী—আর ব্যোমকেশ পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত হৃতবীর্য।

এই সব চিন্তার জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করে হিমাদ্রি, ব্যোমকেশ মানুষ খুন করেছে, তার সাজা পেয়ে জেল খাটছে, একদিন প্রায়শ্চিত্তের অবসান হলে সে আবার সবার মাঝে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু সেই দিনের কথা মনে হওয়ায় ওর উদ্বেগের অবসান ঘটেনা। এতদ্দ্বারা আর একটা ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা মনে পড়ে, সে বিষয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করার প্রয়োজন,—হিমাদ্রি স্থির করল কিছু টাকা ব্যোমকেশের জন্য আলাদা জমিয়ে রাখবে, মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দীদের সঙ্গে ব্যোমকেশ যদি মুক্তি পায়, তাহলে এখন সেই টাকা দিয়ে তাকে যা হয় একটা কাজে বসিয়ে দিলেই হবে। এদিকে আর ওকে ভিড়তে দেওয়া হবে না।

তবু এই সমাধান ঠিক মনঃপূত হয় না, মনে হয় পুষ্পময়ী, বকুল আর হিমাদ্রি তিনজনের সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক অতিকায় মানব—সে ব্যোমকেশ! একদিন তার সঙ্গে হিসাব-নিকাশের পালা শেষ করতেই হবে।

ইতিমধ্যে হিমাদ্রির ব্যবসা-সংক্রান্ত সর্ববিধ প্ল্যান বেশ মসৃণ গতিতে চলল। তার কল্পনা সুদূরপ্রসারী, সম্ভাবনা বিরাট, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক। এখন সে সলিসিটর থেকে শুরু করে কনট্রাক্টরকেও উপদেশ দেয়। সকল বাধা দূরে সরিয়ে দিয়ে সে আজ পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটোখাটো বিপর্যয়ে সে আজ আর অভিভূত হয়ে পড়েনা, বিনা উদ্বেগে পার হয়ে যায় বাধার পারাবার।

কারাজীবনের প্রথম কয়েক মাস ব্যোমকেশের মন বিষাদাকুল ছিল, তা ছাড়া কেমন একটা আতঙ্ক মিশ্রিত ভয় প্রাণে জেগেছিল। সে ভয় সাময়িক নয়। দীর্ঘস্থায়ী ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা।

এই কঠোর শাস্তি যে ওর সইবে, তা ভাবতে পারেনি ব্যোমকেশ। তবু জেলের কর্তৃপক্ষদের আচরণে ও চারিদিকের থমথমে আবহাওয়ায় ওর সন্দেহ বেড়ে গেল যে, সারাজীবনটাই এভাবে কাটাতে হবে। অবশেষে একদিন জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, লোকটি আইরিশ, ব্যবহার ভদ্র, কথাবার্তা মোলায়েম।

ব্যোমকেশ বলে—'সবই আমার সইতে পারে, কিন্তু এই সময়টা, যে রকম শুনছি কুড়ি বছরও আমাকে থাকতে হতে পারে—এইটাই কেমন মেনে নিতে পারছিনা যে, সারাজীবনটাই এইভাবে কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেইটাই আমার যে সবচেয়ে বড শাস্তি তা নয়, জীবনটা যে এ ভাবে নষ্ট হবে, এইটাই বড় কথা। এইভাবে যদি জেলে থেকেই মরি, তা হলে আমার যা কিছু করার ছিল সবই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

জেলর সাহেব গম্ভীর ভাবে জবাব দিয়েছিলেন—'It was all implied in the sentence.'

ব্যোমকেশের কেমন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। সে তবু গজ গজ করে বলে—'বুড়ো হয়ে গেলে আর আমি কি করব?'

জেলার সাহেব শান্ত গলায় বলেছিলেন—'তবে ভালভাবে থাকলে দু পাঁচ বছর রেমিশন মিলতে পারে।'

ব্যোমকেশের প্রয়োজনের অনুপাতে সে সময় অতি কম। এতই কম যে, তার কোনও মূল্যও নেই, অর্থও নেই। তার ক্ষুব্ধ চিত্তে এই কথা এতটুকু শান্তির বাণী এনে দিতে পারল না।

এই আতঙ্কে প্রায় ছয় মাস কাটল। ভয়, ভাবনা ও হতাশায় ওর অন্তরাত্মা উদ্বেল হয়ে উঠল।

সেই গোড়ার দিকে ওর মনে এ ছাড়া আর কোনও চিন্তাই জাগে নি। তারপর যখন এই ভয় সে কাটিয়ে উঠল, তখন দেখা গেল যে, ওর সেই শক্তিমান চরিত্রের ধারাল অংশ ভোঁতা হয়ে গেছে। অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়েছে বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে নয়, কারণ সেই আত্মিক শক্তিকে আতঙ্ক গ্রাস করে দিয়েছে। তাই আজ আর আত্মার কোনও অভিব্যক্তি নেই। এখন আর সে আগেকার মত কলরবশীল নয়, এখন সে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কারণ তার অন্তরাত্মাও স্তব্ধ। মাঝে মাঝে দীর্ঘ বিরতির পর যখন দুঃখ কষ্টের কথা মনে হত, তখন তা পুরান ক্ষতের মত বুকে বাজে। ব্যোমকেশ হাই তোলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে—সেলের দরজায় ধাক্কা খেয়ে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়। রাত্তের পাহারার চৌকিদার মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে দেখে—লোকটা ঠিক আছে ত।

ছমাস পরে, যে ব্যবধান ঘুম, স্বপ্ন ও জীবনের চেতন মুহূর্তগুলির মধ্যে সীমান্ত রেখা নির্দেশ করে, তা যেন সহসা অবলুপ্ত হল। তাই আজ ঘুমের ভেতর থেকেও স্বপ্ন তীব্র হয়ে উঠে। তাই সেই স্বপ্নের ভেতরই ব্যোমকেশ ঘুরে বেড়ায়। জীবনের ধ্বংসাবশেষের দু'একটা অংশ যেন ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। ঘুম যখন ভাঙে তখন বিষাদ-গম্ভীর মুখে প্রতিদিনের কাজে লাগে।

কিন্তু রাতে আবার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নে অতি পরিচিত মুক্ত জীবনের আনন্দময় ছবি ভেসে ওঠে। জনতার মধ্যে সে যেন আকর্ষণ কেন্দ্র। ব্যোমকেশ লক্ষ্য করে সকলের মন যেন তার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে ভরপুর। সকলের চোখে যেন করুণাভরা হাসি। যেন বলছে—ওরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন আর শুধু সে একা খাঁচায় আটকে রয়েছে।

ঘুমের ঘোরে ব্যোমকেশ চীৎকার করে। ওদের করুণায় উত্যক্ত

হয়ে যেন গর্জন করে। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নও ভাঙে। তখন শুধু স্বপ্নের রেশটুকু মনে জেগে থাকে। আরও অনেক স্বপ্ন অবশ্য দেখে। সে স্বপ্ন অবশ্য লজ্জার নয়। কিন্তু এমনি আশ্চর্য যে, তার কিছু মাত্র মনে থাকে না। ব্যোমকেশ বোঝে যে মৃত্যুমুখী স্মৃতির এই ধ্বংসাবশেষ। অতীতের সম্পর্কে এখন শুধু অনুতাপ ছাড়া আর কি কবার আছে?

কিন্তু ভবিষ্যতের কথাও ভাবে ব্যোমকেশ। বকুলের কাছ থেকে পাওয়া দু চারখানি পুরানো চিঠি নিয়ে আবার পড়ে। প্রতিটি লাইন তাব মুখস্থই আছে, বহুবার পঠিত চিঠি—তবু পড়ে—ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আছে ঐ চিঠিব ভিতর।

বকুলকে বিশ্বাস কবে ব্যোমকেশ, তাই বিশ্বাস ভবিষ্যতে একদিন হয়ত তার শ্রান্ত জীবন-তরণী ঐ তীবেতেই ভিড়বে।—ব্যোমকেশ চিঠিগুলির উপযুক্ত জবাং দিতে পারেনি। মনে ভাবাবেগ থাকলেও লিখতে বসে ভাষা জোগায়নি, চিঠিপত্র সে গুছিযে লিখতে পাবে না, তাই বকুলেব চাব পাতা চিঠির জবাবে পাঠিয়েছে চার লাইনেব পোস্টকার্ড। এখন আবাব চিঠিগুলির জবাব দেওযার প্রেবণা জাগে, পুবাতন ভঙ্গীতে দু চার কথা লেখার চেষ্টা কবে, কিন্তু মন বসে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যোমকেশ হাল ছেড়ে দেয়। বিশ্বাস বাখে আগামীকালে।

এই ভয়ঙ্কর স্থানেও পৃথিবীব আব সব অঞ্চলেব মত সমযেব প্রতাপ অসীম। এই কালের গতিতেই ব্যোমকেশেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তবু সে বিশ্বাস বেখেছে আগামীকালে, তার সকল কষ্ট, সকল দুঃখের অবসান হবে সেই অনাগত দিনে।

প্রহরীরা ওকে সুনজরে দেখে, প্রথম যখন এসেছিল তখন ওব বিরাট আকৃতিতে সবাই ওকে ভয়ঙ্কর মনে করত, আর একটু কিছুতেই ঝগডা করাই ছিল ওর স্বভাব, সহজে কিছু মেনে নিতে পারত না। আর সব

রাজবন্দীরা ওকে দলপতি হিসাবে গ্রহণ করল। কিন্তু ক্রমে ব্যোমকেশ পিছিয়ে পড়ল—বুঝলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে কিছুই মিলবে না।

তার পরিবর্তন হল, প্রকৃতি নরম হল। মনে হল তার বিরাট বাহু দুটিতে যেন আর শক্তি নেই—সে দুটি এমনই কাঁধ থেকে ঝুলছে। এদিকে অপর রাজবন্দীরা তখন তাকে স্পাই বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, তাদের ধারণা ওর এই নির্জীবতার কারণ সরকারী প্রভাব। ব্যোমকেশেব কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না, সকল তেজ, সকল শক্তি তার শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

নতুন যারা আসে, তারা নতুন খবব নিযে আসে, যারা ব্যোমকেশকে চিনত, তারা এসে বলে—'তোমার হিমু যে এখন মস্ত লোক, অনেক টাকা, দু চাবখানা বাড়ি তুলেছে—সে হিমু আর নেই।'

বকুলরাণীর কথাটা সবাই চেপে যায়, কেমন তাদের সাহস হয় না সে কথা উল্লেখ করতে।

ব্যোমকেশ শুধু ম্লান হাসে, জবাবে কিছু বলে না। লোকগুলি অবাক হয়ে ওব মুখের পানে তাকিযে থাকে, তাবা ত জানে না ওর কি হয়েছে। তাবা বলাবলি কবে—'একদিন ত সব শুনবেই, বকুলের কথাও শুনবে—তখন ?'

মুখে কিছু না বললেও হিমাদ্রির নাম তার অন্তরে প্রতিধ্বনি জাগায়, মনের সকল শূন্যতা ছাপিযে একটা কলরব জাগে—ব্যোমকেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যাই হোক ওর ভিতর একটা নূতন ভাব জেগেছে, ব্যোমকেশ একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে জীবনের,—ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, এই ভাব ওর মনের মরুভূমিতে জেগে উঠল। আর তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে তিন-চার বছর কেটে গেল।

রীতিমত প্রচেষ্টা করে এই ভাব খুঁজতে হয় ব্যোমকেশকে, যেন

অন্ধকারের ভিতর সে যাত্রা শুরু করেছে, পথের শেষ নেই, ঠিকানা নেই, তবু সে চেষ্টা করে। ক্রমে সেই অন্ধকার কেটে গিয়ে কুয়াশা জাগে, স্তিমিত আলোয় মানুষের আকৃতি ভেসে ওঠে—সে মুখ বকুলের নয়—হিমাদ্রির!

কারাজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কেমন যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে ব্যোমকেশ, চুলগুলি সাদা হয়ে এসেছে, সকলে ভাবে হয়ত ভবিষ্যতের ভাবনাতেই সে এত অথর্ব হয়ে পড়ছে।

অপরাপর বন্দীরা বলে—লাটসাহেব এণ্ডারসনের সঙ্গে গান্ধিজির কথাবার্তা চলছে, শীগ্‌গীরই রাজবন্দীরা মুক্তি পাবে, সং-ফৌ আইনে (অর্থাৎ সংশোধিত ফৌজদারি আইন) ধৃত বন্দীরাও মুক্তি পাবে, আর ব্যোমকেশের মত বিপ্লবপন্থীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে।

হয়ত এই আসন্ন মুক্তির ভাবনা তাকে আকুল করে তুলেছে, তার ফলেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। বকুলের কথা ব্যোমকেশের মনে জাগে, কারাজীবনের গোড়ার দিকে এমনই মনে পড়ত বকুলকে, তার সুনিপুণ তর্কের কথা মনে হলে হাসি পেত, আর স্বপ্নে কতদিন যে তাকে বুকের ভিতর পেত,—ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারের ভিতর চোখ মেলে ভাবত—কি হল বকুলের কে জানে, কেন যে আর চিঠিপত্র লেখেনা—কোথায় আছে, কি করছে, কিছুই বোঝা যায় না। সে-ও কি ধরা পড়েছে?

শান্তি ও স্বস্তির পরিবর্তে ব্যোমকেশের মনে নিত্য নূতন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্ভব হতে লাগল। রাতে ঘুম হয় না, ক্ষুধার অভাব, কেমন যেন ভরাক্রান্ত মন, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। অবশেষে সত্যই ব্যোমকেশের শরীরে ভাঙন ধরল, যা প্রথমটায় অস্পষ্ট ছিল তা ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল—প্রথমটায় মনে হয়েছিল বহুমূত্র, কিন্তু একদিন জানা গেল রোগ আরও কঠিন—মূত্রাশয়ের ব্যাধি।

জেল হাসপাতালের ব্যবস্থা মন্দ নয়, সকলেই ওকে বেশ যত্ন করত, স্নেহনজরে দেখত। ব্যায়ামের অভাবেই নাকি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ব্যোমকেশ চীৎকার করে।

একটা ইনজেকসন দেওয়া হল, তারপর কিছুক্ষণ ঘুমালো।

ঘুম ভাঙার পর ডাক্তাররা প্রশ্ন করেন—'এখন কেমন আছেন ব্যোমকেশবাবু?'

—'যন্ত্রণাটা একটু কমেছে—কিন্তু কিছু খেলেই যে প্রাণ যায়।'

সেই ত সবচেয়ে বিপদ—হজমের যন্ত্রগুলি সব বিকল হয়ে গেছে। ক্রমশঃ ব্যোমকেশ কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে পড়ল, শরীরে শক্তি নেই, যেটুকু সামান্য খাদ্য শরীরে যেত তার ফলেই কোনমতে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে বেদনা কমে যেত, তখন ও বেশ ভাল থাকত, মনটা প্রফুল্ল থাকত, পডন্তবেলার রোদের মত ওব মুখে হাসি ফুটে উঠত। ডাক্তার ও পরিচাবকদেব সঙ্গে নিজের শরীব সম্বন্ধে কথা হত ব্যোমকেশের, বলত—'জানেন ডাক্তারবাবু, একদা আমার অনেক শক্তি ছিল, গলায় জোব ছিল, কত আইডিযায় মাথাটা বোঝাই ছিল, পৃথিবীটায় আগুন ধবিযে দেব ভেবেছিলাম. ভাবতাম আমি তা পারব। বিশ্বাস করতাম···নিজেব ক্ষমতায় সে কি অন্ধ বিশ্বাস! ভেবেছিলাম—একটা যুগের শেষ হয়েছে—নতুন যুগ এল—!'

পরদিন মনে হল, ব্যোমকেশ অনেক ভাল আছে, দু তিনদিন এই ভাবেই কাটল—দুর্বল হলেও স্বচ্ছন্দ শরীব, একটু বেশি খেতে পারে, বিছানা থেকে উঠে হাঁটতে পারে।

হাসপাতালের সবাই কিন্তু বোঝে এব অর্থ কি! ওর ক্ষীয়মান শরীরের দিকে লক্ষ্য কবে সবাই বলাবলি করে—'আর রক্ষা নেই।'

হলও তাই. সহসা আবাব রোগটা চেপে বসল, এমন ভাবে পড়ল যেন কে ওকে ঘুঁসি মেরে বসিয়ে দিয়েছে।

ব্যোমকেশ বলে—'যুগ শেষ হল—আর সেই সঙ্গে আমারও শেষ।'

স্বয়ং জেলর সাহেব একদিন ওকে দেখতে এলেন। খবর নিতে বললেন, ওর আত্মীয়-কুটুম্ব কে আছে। প্রথম দিকে যে সব চিঠি আসত তার ভিতর বকুলের চিঠি তাঁর স্মরণে আছে, কেন যে সেই প্রেম পত্রাবলীর জবাব দেয়নি ব্যোমকেশ, একথা তিনি তখনও ভাবতেন, আজ আবার নতুন করে সে কথা মনে পড়ল। ব্যোমকেশ কি সব বিসর্জন দিয়েছে? এখন ঠিক জায়গায় কৌশলে আঘাত দিতেই ব্যোমকেশ বলে ফেলল—'বকুল আমার বান্ধবী, আমার শুভাকাঙ্খী, যখন জেলে এসেছিলাম তখন ও আমাকে চিঠি দিত, বলত, আমার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকবে। যদি সে এখানে আসতে পারত, একবার দেখতাম,—জেল থেকে বেরোতে পারব, সে ভরসা আর নেই।'

জেলর সাহেব ওর কথার ভিতর আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে বিস্মিত হলেন, কি ভাবে সেই পুরাতন প্রেম আজও ব্যোমকেশেব মনে জেগে আছে, স্ত্রীলোকের সততায় তার কি অপরিসীম শ্রদ্ধা।

তিনি বললেন—'বেশ, আমি তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা কবছি, তাড়াতাড়ি যাতে আসেন, সেই চেষ্টাই করব।'

এরপর ক্রমেই ব্যোমকেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। দীর্ঘকাল অচৈতন্য থাকে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে, তার অর্থ ঠিকমত বোঝা যায় না।

ব্যোমকেশ মৃত্যুমুখে, ইদানীং কথাও বেশি বল্‌তে পারে না, বা বলে না। শুধু একটি প্রশ্নই বার বার করে—'বকুল এসেছে?'

কর্তৃপক্ষরা সদয় কণ্ঠে বলেন—'না ব্যোমকেশবাবু! চিঠি পাঠিযেছি, এই এলেন বলে।'

সকলেই বোঝে এই স্ত্রীলোকটিকে দেখার তীব্র বাসনার জন্যই সে

আজও বেঁচে আছে। ওকে সত্য কথা বলতে সাহস হয় না যে, তিন চারদিন হয়ে গিয়েছে এখনও চিঠির কোনও জবাব আসেনি, জেলর সাহেব ঐ অঞ্চলের পুলিসকেও খোঁজ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আরও ক'দিন কাটল, কোনও খবর নেই।

পরিশেষ

পাঠানোর প্রায় ছদিন পরে চিঠিখানি বকুলের হাতে এসে পৌছল, তার কুমারী-জীবনের নাম ও ঠিকানায় প্রেরিত, সবকারী চিঠি। বকুল তখন পাড়ায় মহিলা কল্যাণ সমিতিব মিটিং-এ যাবে বলে বেবিযে আসছিল, দুয়াবে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

চিঠিখানি দেখে সে সচকিত হয়ে উঠল—অতি পুরাতন ঠিকানায় প্রেরিত এই চিঠি কে পাঠাল ? অতীতের চিঠি ?

তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল, কত উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগল। নিশ্চয়ই এব ভিতর ব্যোমকেশের মুক্তি সংবাদ রয়েছে। ওর কাছে খবরটা পাঠাতে ব্যোমকেশই হয়ত বলে দিয়েছে।

কম্পিত হস্তে খামটি খুলে দেখল, ভিতরে লেখা আছে সরকারী ভাষায়, '...beg to inform you...Byomkesh Mozumdar...not expected to live longer...earnestly request you to come immediately in response to his wish to see you. Please bring the attached pass...'

চিঠিখানির তারিখ ছদিন আগেকার, হিজলী জেলের কমাণ্ড্যান্ট সই করেছেন আরও একদিন আগে। বকুল ভাবে এখন হিজলী দৌড়ান বৃথা—যা হবার তা হয়ে গেছে,—বকুল স্থির করেই ফেলে যাবে না,

চিঠিখানি ভ্যানিটি ব্যাগে মুড়ে রেখে দিয়ে ভাবে, কি প্রয়োজন নিরর্থক যাত্রার? কিন্তু আবার মনে হয়, এখনও সময় আছে—হয়ত দেখা হতেও পারে,—টাইম-টেব্‌ল্ ঘেঁটে দেখা গেল আর একটু পরেই সাড়ে দশটায় নাগপুর প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে ছাড়বে, খড়্গপুর পৌছতে প্রায় একটা বেজে যাবে, তাহলে বিকাল নাগাৎ হিজলী জেলে পৌছতে পারবে। এখনও গেলে হয়ত ব্যোমকেশের সঙ্গে দু একটা কথা হতে পারে।

স্যুটকেসে দু চারটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ভর্তি করে বকুল ড্রাইভারকে বলল—'হাওড়া স্টেশন! জলদি!'

গাড়ি ছাড়তে মাত্র দু মিনিট সময় ছিল,—বকুল এক রকম দৌড়ে গিয়ে একখানি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনল। এই সব ট্রেনে ওপরের শ্রেণীতে তেমন ভিড় হয় না,—তাই বকুল একখানি খালি কামরা পেয়ে গেল। খালি না হয়ে ভর্তি কামরা হলেই ভাল ছিল, তবু দু চারটে লোকজনের সঙ্গে কথা বলা যেত, এ যেন নিদারুণ শূন্যতা।

আসার সময় তাড়াতাড়িতে হিমাদ্রিকে খবরটা জানিয়ে আসা হয়নি, চিঠিখানি খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল পাসখানি খামের ভিতর রয়েছে, চিঠিটাই নেই। সারা পথ জানলার ধারে বসে কাটল।

খড়্গপুরে পৌছানর কিছু আগে হঠাৎ মনে হল মাথায় সিঁদুর রয়েছে,—একটু ইতঃস্তত করে বাথরুমে ঢুকে বকুল সিঁদুর মুছে নিল। কি দরকার অসুস্থ মানুষকে কষ্ট দিয়ে।

খড়্গপুর থেকে হিজলীতে বাস চলাচল করে—ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। অনেক ভাড়ার লোভ দেখিয়ে বকুল একটি ট্যাক্সি গ্রহণ করল।

হিজলী বন্দীশালায় যখন বকুলের গাড়ি এসে থামল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে।

পাসটা দেখাতেই প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল। একজন কর্মচারী বকুলের মুখের পানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলল—'আপনি বকুলরাণী সেন? আজ কদিন ধরেই আমরা আপনাকে এক্সপেক্ট করছি—।'

ডাক্তার সাহেবও যেন বকুলকে দেখে স্বস্তি পেলেন। বকুল বলল—'পুরানো ঠিকানায় চিঠি পাঠান হয়েছিল, তাই এত দেরি হয়েছে। কেমন আছেন ব্যোমকেশবাবু?'

গম্ভীর গলায় জবাব এল—'এই ত, দেখুন না।'

এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে, কেউ কিছু বলেনা। এই ভয়ঙ্কর জায়গা—যেখানে সূক্ষ্ম কোনও কিছুরই মূল্য নেই, সেখানে প্রেমের অপরূপ মাধুরী কি ভাবে মৃত্যুকে জয় করে এখনও একটা জীবন অম্লান রেখেছে, হয়ত তাঁরা সেই কথাই ভাবছেন। এই নিদারুণ বিচ্ছেদেও প্রেমের নির্বাণ নেই। সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের ফলেই রাজনৈতিক বন্দীটির জীবন শিখা নিবু-নিবু করেও নেভেনি, এই মনোরমার জন্যই সে কোনোমতেই টিঁকে আছে।—কর্তৃপক্ষবা নীরব ভাষায় যেন এই সব কথাই আলোচনা করছেন,—তাঁরা তো মুছে দেওয়া সিঁথির সিঁদুরের কথা জানেন না—বকুলের হাতে যে পাসখানি বযেছে তাতে মিস্ বকুলরাণী সেনের নামই লেখা আছে।

প্রকাণ্ড হল ঘরের শেষ প্রান্তে বকুলকে নিয়ে যাওয়া হল। দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের পরিপূর্ণ আকৃতি বকুলের মনের মুকুরে ছায়াপাত করে—কিন্তু লোহার খাটে ঐ যে শীর্ণাকৃতি প্রাণীটি শুয়ে আছে—ঐ ব্যোমকেশ? যে এতদিন স্বপ্ন দেখেছে আগুন জ্বালাবার,—অগ্নিরথের ওপরে উঠে যার সারথির আসন গ্রহণ করার উচ্চ আশা—সে আজ ধুলিমলিন শুকনো পাতার মত এভাবে পড়ে আছে,—কখনই নয়,

নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। এ ব্যোমকেশ নয়! বকুল মনে প্রাণে চায় সত্যই এটা ভুল হোক, কাছে দাঁড়িয়ে আর সনাক্ত করতে হয় না—কিন্তু কর্তৃপক্ষরা যে ওর কাছেই নিয়ে চলেছেন, নিশ্চয়ই ভুল নয়,—বকুলকে ভাল করে দেখতে হবে।

যতই বিছানার দিকে অগ্রসর হয় বকুল ততই একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে দেখে, বকুল সত্যই চিনতে পারে না,—এ কখনই ব্যোমকেশ নয়। এ কি নিদারুণ পরিহাস! জলভরা চোখে একাগ্রচিত্তে সেই কঙ্কালবৎ প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে বকুল প্রাণপণে চেষ্টা করে কণা পরিমাণ তেজ, বিক্রম, উৎসাহ, বা উদ্দীপনার কিছু রেশ যদি থাকে। কোথায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা একদা ব্যোমকেশ নামে পরিচিত ছিল? অনেকক্ষণ পরে বকুল শুনল লোকটি ওর নাম উচ্চারণ করছে, কণ্ঠস্বরও পরিবর্তিত হয়েছে—চোখদুটি তার মুদিত। অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—'বকুল—হয়ত এলনা।'

বকুল বিছানার পাশে বসে পড়ে আবেগ ভরে বলে—'এই যে, আমি এসেছি।'

তাড়াতাড়ি উত্তর দিল বটে, কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস হয় না বকুলের, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কর্তৃপক্ষরা এবং ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

ব্যোমকেশ চোখ মেলে তাকাল, তার সেই লম্বা হাত বাড়িয়ে বকুলের ডান হাতখানি টেনে নিয়ে বুকের ওপব চেপে ধবল। বিপ্লবীর আবার সেন্টিমেণ্ট, বকুল মনে মনে ভাবে।

কিন্তু ব্যোমকেশ যেন সুদীর্ঘ ব্যবধানের ওপর সেতু রচনা করেছে—কালের নিয়মে যা বহুদূরে সরে গিছল, আজ তাকে নিকটে টেনে নিয়েছে ব্যোমকেশ,—আর এই স্পর্শের ভিতর, এই মৃদু চাপের অন্তরালে অতীতের ব্যোমকেশের অতি পরিচিত ছোঁয়া এসে বকুলের মনে লাগে।

স্মৃতির অসহ্য জ্বালা তার অন্তরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এইবার নিরুদ্দেশ ব্যোমকেশকে পাওয়া গেছে, কঠিন তপশ্চর্যার পর যেন ব্যোমকেশ এত ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিন্তু কেন এই কৃচ্ছ্রসাধন!

বকুল কথা বলতে পারে না, কারণ অনেক কিছুইত বলার আছে, তার নীরবতার পিছনে রয়েছে অতীতের ঘটনা প্রবাহ,—বকুলের কথা বলার সাহস নেই। তাই বকুল ব্যোমকেশের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে অবিন্যস্ত শুকনো চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দেয়। তার সুন্দর আঙুল তার সেই সর্পিল চুলের ভিতর খেলা করে।

এই নীরব সংলাপই যেন ব্যোমকেশের কাম্য ছিল। দীর্ঘদিনের হতাশাভরা বেদনার যেন উপশম হয়। বকুলের উপস্থিতি, স্পর্শ ও অন্তরঙ্গতা যেন তার বহুকালের আনন্দ বিরহিত মনে শিহরণ এনে দেয়, মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যোমকেশের চোখ আনন্দ-বেদনায় সজল হয়ে ওঠে। উপরকার রুক্ষ আবরণ ভেঙে চুরমার হয়ে ভিতর থেকে শিশু ব্যোমকেশের সেই পুরাতন মন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ন'বছর পরে ব্যোমকেশ এই সর্বপ্রথম সুখ ভোগ করল—তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, রক্ত আবার উষ্ণ হয়ে উঠেছে—মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যেন ব্যোমকেশ আবার নতুন করে বাঁচল—মরণোন্মুখ মনে অতীতের যে স্মৃতি কুয়াশার মত অস্পষ্ট হয়েছিল, তা যেন সহসা চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে এল। ন'বছরের কুজ্ঝটিকার দৃঢ় আবরণ ছিন্ন হয়েছে,—হাঁফাতে হাঁফাতে ম্লান হাসে ব্যোমকেশ। সেই জ্যোতির্লেখায় যেন হিমাদ্রি সুস্পষ্ট মূর্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

পাংশু মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।—সেই মুখাকৃতিতে অতীতের বিপ্লবীর রূঢ় রুক্ষ রূপ প্রকাশ পায়,—রাগে বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করে ব্যোমকেশ, বকুল বাধা দেয়, ব্যোমকেশ প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে—'হিমু কেন পান্নালাল—ও ত বলেছিল থাকবে, ও পান্নালাল,—ওর

জন্যই ত আমি বুড়োটাকে মারলাম—মিছিমিছি মারতে হল—না না হিমুকে দোষ দিচ্ছি না—কিন্তু কেন কথা দিয়েছিল—কেন?'

ব্যোমকেশ ও হিমাদ্রির মধ্যে যে এই রকম কিছু একটা হয়েছে বকুলেরও তাই অনুমান ছিল, মনের ভিতর তীব্র জ্বালা অনুভব করে বকুল, ব্যোমকেশকে শান্ত করার জন্য বলে—'যা হয়ে গেছে ভুলে যাও, চুপ কর, ভুলে যাও, ওকে মাফ কর—'

—'মাফ! কে কাকে মাফ করে, আমি ত ভুলেই গেছি, কিন্তু আমি যা করলাম ও তাই করুক, ভাগ নিক আমার কষ্টের, জ্বালার। সব ব্যাপারেই যে আমরা অংশীদার—লাভের ও লোকসানের—'

বকুল থামাতে পারে না ব্যোমকেশকে। বলে—'চুপ কর, হিমাদ্রির কথা ভুলে যাও—'

ব্যোমকেশ ছাডবার পাত্র নয়, এই সর্বপ্রথম শ্রোতা পেয়েছে যাকে সব কথা বলা যায়, তাই ধীরে ধীরে সকল কথা বলে হাঁপাতে থাকে, উত্তেজিত ব্যোমকেশ ঝিমিয়ে পড়ে—আবার বলে—'আমাদের যে ভাগের বন্দোবস্ত, সব ব্যাপারেই ভাগ চাই—'

বকুল বুঝিয়ে বলে—'বেশ ত, ভাগ নেবে'খন, তুমি সেরে ওঠ!'

দুরন্ত সন্তানকে জননী যেমন চুমা দিয়ে শান্ত করেন, তেমনই ব্যোমকেশের জ্বরতপ্ত কপালে চুম্বন রেখা এঁকে দেয় বকুল।

ব্যোমকেশ শুধু বলে—'তুমি শুধু ঠিক আছ বকুল, এতটুকু বদলাওনি—'

বকুল নিরুত্তর!

ব্যোমকেশ চুপ করে পড়ে রইল, এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বকুল তাকিয়ে দেখে ব্যোমকেশের চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে—জোরে নিশ্বাস বইছিল—কিন্তু হঠাৎ যেন সে শান্ত হয়ে পড়েছে—ভয় ও

উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে ওঠে বকুল,—তবে কি! তার তীব্র চীৎকার মৃদু গুঞ্জন হয়ে ওঠে—'ব্যোমকেশ! ব্যোমকেশ!'

বকুল বুঝল, এই শেষ! সব শেষ! তার বন্দীজীবনের অবসান হল। সকল সমস্যার সমাধান করে বকুলকে মুক্তি দিয়ে ব্যোমকেশ চলে গেল, তার বিপ্লবের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল! রক্ত যুগান্তরের নূতন দিনের অবসান হল। শুধু বকুলের ভিতরই ব্যোমকেশের জীবনের নিদারুণ ট্রাজেডির ছায়াটুকু পড়ে রইল।

বকুল কলকাতায় ফিরছে, বাইরে আকাশে চাঁদের আলোর জোয়ার এসেছে, চারিদিক আলোয় ভরে আছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই—সহসা বকুলের মনে হল, তাইত সিঁথিতে ত সিঁদুর নেই, তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বকুলরাণী লিপস্টিকটা সিঁথিতে বুলিয়ে নেয়। বিনা সিঁদুরে কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছিল এতক্ষণ!
